দুর্ধর্ষ স্পাই
স্তানিস্লাভ লেভচেঙ্কোর
রোমহর্ষক
আত্মজীবনী

আমি ছিলাম কেজিবির লোক

রূপান্তর ঃ
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

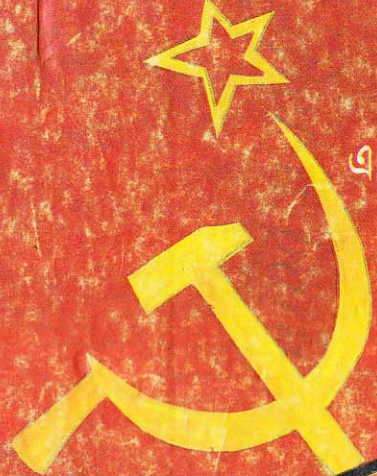

Scanned by NiloyCh
for banglapdf.net

আমি ছিলাম কেজিবির লোক

স্তানিস্লাভ লেভচেঙ্কো

রূপান্তর

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 - 16 - 3136 - 9

প্রকাশক ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

মুদ্রাকর ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক ঃ
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম ঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

AMI CHHILAM KGB'R LOK
Trans : A. T. M. Shamsuddin

সাত্তাশ টাকা

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের কালে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র নাম দুনিয়ার মানুষের কাছে অতি পরিচিত হয়ে ওঠে। সিআইএ'র খ্যাতির পিছনে রয়েছে দুনিয়ার দেশে দেশে গোয়েন্দা সংস্থাটির চমকপ্রদ, আগ্রাসী ও ভীতিকর কার্যকলাপ। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও এ সংস্থাটি এতই প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যে অনেক আমেরিকানই এটাকে বলতে থাকেন 'দি ইনভিজিবল গভর্নমেন্ট'।

সিআইএ-র বিপরীতে, প্রায় সমান্তরালে সক্রিয় ছিল আরেকটি গোয়েন্দা সংস্থা—কেজিবি। অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বত্রাস এ গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র সাথে পাল্লা দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, অন্তর্ঘাত ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালিয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ, তাকে প্রভাবিতকরণ এবং তার বাস্তবায়নে সিআইএ যেমন অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে তেমনি কেজিবিও করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে। তাই দুনিয়ার মানুষের মনে সিআইএ আতঙ্কের মত কেজিবি আতঙ্কও ছিল প্রবল।

আমেরিকার সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বর্তমান থাকায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এবং বই-পত্রের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের মানুষ সিআইএ সংক্রান্ত অনেক খবর ও তথ্য জানতে পেরেছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। কঠোর গোপনীয়তার জন্য কেজিবির কার্যকলাপ সম্পর্কে বাইরের লোক দূরে থাক—সোভিয়েত নাগরিকরাও ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। বাইরের মানুষ কেজিবি সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জেনেছে একমাত্র তখনই যখন কোন কেজিবি'র লোক গুপ্তচরবৃত্তিতে ধরা পড়েছে কিংবা কেজিবির কোন রুই-কাতলা জাতীয় অফিসার দলত্যাগ করে মুখ খুলেছেন। তেমনি একজন মি. স্তানিস্লাভ লেভচেঙ্কো—জাপানে অবস্থিত সোভিয়েত গোয়েন্দা চক্রের সহ-অধ্যক্ষ। রহস্য উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর তাঁর কাহিনী এখানে বর্ণিত হলো।

Scanned by NiloyCh
for banglapdf.net

বিষাদময় প্রথম জীবন
মস্কো ১৯৪১-১৯৬৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর আমার একসাথেই আগমন ঘটে এ পৃথিবীতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর জার্মানির আক্রমণের এক মাস ছ'দিন পরে রাজধানী মস্কো শহরে আমার জন্ম হয়। আজ আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় শহরে বসবাস আর কাজ করি। জন্মেছি সোভিয়েত নাগরিক হিসাবে। এখন আমি আমেরিকান। সেখান থেকে এখানে কিভাবে এলাম সে কাহিনী বলাই এ বইয়ের উদ্দেশ্য।

শুনেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক দিনগুলো ছিল অরাজকতায় মোড়া বিভ্রান্তি। পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে আসা উদ্বাস্তুতে ভরে গিয়েছিল সমস্ত নগরী। ওদেরকে সরিয়ে নেয়া হয় আরও পুবের অন্যান্য শহরে। সে কি বিভ্রান্তিকর ও অরাজক অবস্থা। শৈশবের সেই অরাজক ও বিভ্রান্তি ভরা দিনগুলোই যেন স্থির করে দেয় আমার জীবনের ধরন। মনে হয়, যুদ্ধ আর আমার একসাথে আগমন যেন ঠিকই হয়েছিল।

মস্কোতেই ছিলাম সব সময়। বাবা ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওই সময়টায় রাজধানীতে মোতায়েন সেনাদলের একজন অফিসার। এজন্য মা আর আমিও মস্কোতেই থেকে যাই। বেশি কিছু অবশ্য মনে নেই। আসলে, মাকেও আমার তেমন মনে নেই। তিন বছর বয়সে আমার এক মৃত ভাইয়ের জন্ম হয়। প্রসবকালে মা মারা যান। মাকে কবর দেয়ার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই বাবা পশ্চিম ফ্রন্টে যোগদানের আদেশ পান। কিছু আত্মীয়ের সাথে আমি রয়ে গেলাম মস্কোতে। আমার জন্য বাবার আর কিছু করার উপায় ছিল না।

ওই আত্মীয়দের কথা মনে নেই। ওদের সাথে আমাদের কি রকম আত্মীয়তা ছিল তাও বলতে পারব না। কেবল এটুকু আবছা মনে পড়ে যে, একদল বয়স্ক লোকের মধ্যে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের সাথে প্রচণ্ড হৈ-হল্লার ভিতরে ছিলাম। ওই একটি বাসায় কতগুলো পরিবার একসাথে থাকত তা-ও ঠিক মত বলতে পারব না। ছয় কি সাতটা পরিবার হতে পারে। সবাই মিলে

একটা রান্নাঘর আর একটা বাথরুম ব্যবহার করত। আমি রাস্তার বখাটে ছেলে হয়ে যাই। বাইরে খেলতাম সব সময়। বড় ছেলেরা যেসব খিস্তিখেউর করত সব গিলতাম। নিজের অজান্তে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম সব রকমের বদমাইশিতে।

সেই দুঃসময়ের প্রথম যে ঘটনাটা স্পষ্ট মনে পড়ে সেটা ঘটেছিল আমার চার বছর বয়সে। অন্যদিনের মত লুটোপুটি করছিলাম এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের সাথে। হঠাৎ একটা ডেলিভারি ট্রাক—একটা প্রকাণ্ড স্টুডিবেকার ভ্যান, এসে থামল আমাদের সামনে। আমেরিকান সাহায্য কর্মসূচীর মাধ্যমে পাঠানো ট্রাক। আমেরিকান গাড়ির এত কাছে আমরা আগে কোনদিন যাইনি। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘিরে ফেললাম গাড়িটাকে। স্পষ্ট মনে পড়ে, রানিং বোর্ডে চড়ে খোলা জানালার ধারটা আঁকড়ে ধরেছিলাম।

ড্রাইভার স্টার্ট দিতে ব্যস্ত ছিল বলে দেখতে পায়নি আমাকে। হুট করে গাড়ি চলতে লাগল সামনের দিকে। জানালার প্রান্ত আঁকড়ে ধরে ঝুলে রইলাম। পড়ে মরে যেতে পারি, তবু মনের ভিতরে উত্তেজনা, গর্ব, চলন্ত গাড়িতে আছি!

তারপরে ঠিক কি ঘটেছিল জানিনে। ড্রাইভার ব্রেক কষেছিল, নাকি কিছুতে ধাক্কা খেয়ে গাড়ি থেমে গিয়েছিল বলতে পারব না। তবে ঝাঁকুনিতে আমার হাতের মুঠি আলগা হয়ে যায়, আমি পড়ে যাই রানিং বোর্ড থেকে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কোন ব্যথা অনুভব করিনি। গড়িয়ে উঠেই হাঁটতে শুরু করি। আতঙ্কে নিঃশ্বাস বন্ধ করে সবাই দেখছিল ঘটনাটা। কেউ কেউ চেঁচিয়েও উঠেছিল। কয়েক পা চলার পরেই ব্যথাটা শুরু হয়, বসে পড়ি একটা বেঞ্চিতে।

'ব্যথা পাচ্ছি' বলতে গিয়েই দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসে। আমি জ্ঞান হারাই।

কয়েক মাস পরে বাবা আমাকে বলেন যে, প্রথম কয়েকদিন ডাক্তাররা নিশ্চিত ছিলেন না যে আমি বাঁচব। এক মেধাবী তরুণীর দক্ষতাই নাকি আমাকে বাঁচায়। ওই তরুণী সার্জনটির নাম ডাক্তার আনাস্তাসিয়া। নাছোড়বান্দার মত তিনি লেগে থাকেন আমাকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায়। সপ্তা কয়েক পরে চোখ মেলে আমি তাঁকে দেখি। আমার খাটের ওপর ঝুঁকে হাসিমুখে তিনি বলেন, 'কি খবর, স্তাস? ঘুম ভাঙল তাহলে?'

দীর্ঘ ছয়মাস একাকি পড়ে ছিলাম হাসপাতালে। বাবা আসতেন দেখতে, কিন্তু থাকতে পারতেন না বেশিক্ষণ। তাড়াহুড়ো করে ফিরে যেতে হত ফ্রন্টে। কোন কোন সময় আনাস্তাসিয়া মিনিট কয়েক থাকতেন আমার কাছে। কিন্তু বেশিরভাগ একা পড়ে থাকতাম বিছানায়। হাঁটা ভুলে গিয়েছিলাম পুরোপুরি। দু'পায়ে উঠে দাঁড়াতে, হাঁটা শিখতে আমার কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। শিশু

ছিলাম, তবু মনে পড়ে সেই বেদনাময় একাকিত্ব, হাসপাতাল জীবনের সেই বিবর্ণ একঘেয়েমি।

হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পেলাম তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। যুদ্ধ শেষ হলো ১৯৪৫ সালে। বাবা আবার বদলি হলেন মস্কোতে। আমার ছাড়া পাবার আগ থেকেই তিনি আনাস্তাসিয়াকে ডেট করতে শুরু করেন। খুব আকর্ষণীয় মহিলা ছিলেন তিনি। দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী। তালাকপ্রাপ্তা মহিলা। কিরা নামের একটি মেয়ে ছিল তাঁর। আমার চাইতে একটু বড়। হাসপাতালে কাজ করা এবং সম্পূর্ণ একা মেয়েটিকে লালন-পালন করা নিশ্চয়ই কঠিন ব্যাপার ছিল আনাস্তাসিয়ার জন্য। পিছনের দিকে তাকিয়ে আমার পাঁচ থেকে আট বছর বয়সের মাঝামাঝি সময়টার কথা স্মরণ করতে গেলে বুঝি যে তখন হয়তো অনেক কিছুই আমি টের পাইনি, কিংবা ভুল বুঝেছি। একটা বিষয়ে নিশ্চিত, বাবার জন্য পাগল ছিলেন আনাস্তাসিয়া। তাই তাঁদের যখন বিয়ে হয়, আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি। আমার বয়স তখন প্রায় ছয় বছর।

বিয়ের পর বেশিদিন না যেতেই বাবাকে সামরিক উপদেষ্টার পদ দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় যুগোস্লাভিয়া। আমরা চার জন—বাবা, আনাস্তাসিয়া, কিরা আর আমি চলে গেলাম বেলগ্রেডে। আমাদের নতুন বাড়িটা ছিল বেশ আরামপ্রদ, ফলের গাছ আর ফুলগাছে ঘেরা। আমাদের ছোট এক কামরার বাসা, বারোয়ারি রান্নাঘর আর বাথরুমের সাথে এর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পরে বুঝতে পেরেছিলাম সেই এক কামরার পুরানো বাসায় বিয়ের পরে চার জন নিয়ে সংসার পাততে বাবা আর আনাস্তাসিয়ার কি কষ্ট হয়েছিল। যে সময়ে মানুষের নির্জনতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সেই সময়টা তাঁদেরকে কাটাতে হয়েছিল একটি কামরায় কিরা আর আমাকে নিয়ে গাদাগাদি করে। বেলগ্রেডের ছোট্ট বাড়িটাকে যে আমাদের অত ভাল লাগত এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

যুগোস্লাভিয়ায় থাকতে আমার ভাল লাগত। বাবা ছুটি পেলেই আমরা বেড়াতে যেতাম। যুগোস্লাভিয়ার বনভূমি, পাহাড়-পর্বত, সাগরতীরের ছবির মত সুন্দর বিশ্রাম নিবাসগুলো, আর হাসিখুশি মানুষ আমার মন কেড়ে নিত। ওদের ভাষা, পোশাক, এমনকি রেডিওর গান-বাজনা আমাদের দেশের চাইতে আলাদা রকমের দেখে চমৎকৃত হতাম। তারপর ১৯৪৮ সালের একদিন বাবা ফিরে এলেন ঘরে। মুখটা তাঁর বিবর্ণ।

সৎমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

'মস্কো ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। গুছিয়ে নাও সবকিছু'—জবাব দিলেন বাবা।

'কেন? ঘটনা কি?'

'পরে বলব,' বারা জবাব দিলেন সংক্ষিপ্তভাবে।

সঙ্কটটা কি নিয়ে তা আমি কখনও জানতে পারিনি। তবে আমাদের মস্কোতে ফিরে আসার প্রায় মাস দু'য়েক পরে যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো আকস্মিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক ছেদ করেন এবং সকল সোভিয়েত সামরিক-বেসামরিক উপদেষ্টাকে বহিষ্কার করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষ বিমান পাঠিয়ে বেলগ্রেড থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সকল সোভিয়েত নাগরিককে অপসারন করে। মস্কো ফেরার পর বাবা নতুন বাসা পান। অক্টোবর বিপ্লবের আগে তৈরি এক বাড়ির একটি বড় অ্যাপার্টমেন্ট। ঘরটা ছিল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। এ অ্যাপার্টমেন্টে আরও আটটি পরিবার থাকত। বারোয়ারি বাথরুম আর কিচেন। এ রকম খাঁচার মধ্যে বাস করাটা কেমন তা আগে সঠিকভাবে টের পাইনি, খুব ছোট ছিলাম বলে। কিন্তু এখন বয়স বেড়েছে। তাই বুঝতে পারি যে এ জীবন ভাল লাগে না।

একা বাড়িতে প্রায় দু'বছর কাটিয়ে এসেছি। নির্জনতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা সবাই। এখন একটি কামরার বাসায় ফিরে আসাটা আমাদের কারও ভাল লাগেনি।

বাসার ব্যাপারে নালিশ করলে বাবা ধমক দিয়ে বলতেন, 'আমাদের ভাগ্য যে এরকম বাসা পেয়েছি। এত ভাল অবস্থায় থাকা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব।'

ঠিকই বলতেন তিনি। ভাগ্যগুণেই ওই বাসাটা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। রুমগুলো বড় বড়। অ্যাপার্টমেন্টগুলো একেকটা ছোট হোটেলের মত করে সাজানো। মাঝখানে একটা বড় হলঘর। দু'পাশে নম্বর দেয়া রুমের সারি। কয়েকটা রুম ভেঙে করা হয়েছে একটা বড় কিচেন। প্রত্যেক পরিবারের আলাদা কাবার্ড, চুলো ইত্যাদি। ভাল বৈকি। কিন্তু কিচেনে প্রায়ই ভয়ঙ্কর ঝগড়া বেধে যেত। প্রতিবেশী কি রান্না করছে তা নিয়ে কেউ বেশি শোরগোল তুললে কিংবা বিনা অনুমতিতে কারও হাঁড়ি থেকে কিছু তুলে নিয়ে কেউ মুখে দিলে বেধে যেত নারকীয় হট্টগোল।

আমাদের কামরা বেশ প্রশস্ত ছিল। পর্দা দিয়ে ঘিরে বিছানাগুলো আলাদা করে দেয়া যেত। বসার জন্য একটা ছোট্ট জায়গা করা হয়েছিল। একটা ডাইনিং টেবিলও বসানো হয়েছিল। আমাদের আসবাবপত্র ছিল কিছু আমার মায়ের আমলের এবং কিছু যোগাড় করেছিলেন আনাস্তাসিয়া। ভারি ভারি সব জিনিস। যুগোস্লাভিয়া যাবার আগে অদরকারী সবকিছু বেচে দেয়া হয়েছিল। সেই টাকায়

বেলগ্রেডে গিয়ে কেনা হয়েছিল কার্পেট, কিছু সুন্দর অলঙ্কার, এমনকি গোটা কয়েক পেইন্টিং।

সত্য কথা হচ্ছে এই যে, সব কিছুতেই লোকে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং এ ধরনের যূথবদ্ধ জীবন প্রয়োজনীয় ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিমাংশ প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। গৃহহারা লোকদের যে কোনভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধ থেকে বেঁচে যাওয়া লোকদের বাড়িঘরের চাহিদা মিটানো নতুন বাড়িঘর নির্মাণ করে সম্ভব হচ্ছিল না। স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদার কথা নাইবা বললাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন গৃহের এই চাহিদা কখনও মিটাতে পারেনি। আবাসিক সমস্যা এখনও সঙ্গীন, বিশেষত বড় বড় শহরে।

যৌথ অ্যাপার্টমেন্টে বাস করার সবচেয়ে বড় অসুবিধা—এক বাথরুম, এক টেলিফোন আর প্রাইভেসীর অভাব। প্রায় তিরিশ জন ছিল আমাদেরটায়। তবু অন্য অ্যাপার্টমেন্টগুলোর সাথে তুলনায় ওটাকে বলা যেত প্রাসাদ। তবে সকালে কি গ্যাঞ্জামই না বেধে যেত। টয়লেটের সামনে লম্বা লাইন। বিড়বিড় করে বকাবকি, অভিযোগ, 'ভিতরে বসে বসে কাগজ পড়ছে। না হয় ঘুমিয়ে নিচ্ছে আরও কিছুক্ষণ!' ইত্যাদি।

মারামারি, ঝগড়া প্রায়ই হত। চারপাশের নয় ঘরের গোলমালের শব্দে ডুবে যেতাম আমরা। সবার সম্বন্ধে সবকিছুই জানা ছিল আমাদের—কে বৌ কিলায়, কারা বাচ্চাদের মারে, কে কার সাথে কখন শোয়, কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, কে নোংরা খাটাশ, ইত্যাদি। কিন্তু এসব ঝগড়া-মারামারি সত্ত্বেও এক অদ্ভুত ধরনের ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রায় পারিবারিক অনুভূতি গড়ে উঠেছিল আমাদের গ্রুপটির মধ্যে। নিজেদের মধ্যে যত মারামারি করি না কেন, বাইরের কেউ আমাদের কারও সাথে লাগতে এলে তার কপালে দুর্ভোগ জুটতই।

এক রবিবার বিকালে বাবা আমাকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরুলেন। আমার বয়স তখন নয় বছর। বাপের জন্য দারুণ গর্বিত। তাঁর পাশে হাঁটতে বড় ভাল লাগছিল।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে তিনি বললেন, 'বাবা, তোমাকে হুঁশিয়ার করে দেয়া দরকার।' তাঁর স্বর গুরুগম্ভীর। কিছুটা চিন্তাযুক্তও মনে হলো। 'কাউকে বোলো না যে আমি যুগোস্লাভিয়ায় ছিলাম। আমাকে কথা দাও, তুমি যে সেখানে ছিলে তা তোমার কোন বন্ধু বা আর কাউকে কখনও বলবে না।'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার বাবা একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার। বাপকে নিয়ে বন্ধুদের কাছে বড়াই করার. তিনি যে বিদেশে দায়িত্ব পালন করে

এসেছেন তা বলার ক্ষমতা আমার আছে ভেবে গর্ববোধ করতাম।

প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় প্রশ্ন করলাম, 'কেন, বাবা, কেন?'

'তুমি খুবই ছোট, তাই বুঝবে না,' বললেন তিনি মৃদুকণ্ঠে। 'একদিন হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব তোমাকে। এখন তুমি আমাকে কথা দাও যে ওই বিষয়ে একটি কথাও বলবে না। বুঝতে পারলে?'

বললাম বুঝেছি, কিন্তু বুঝিনি কিছুই। 'স্তানিস্লাভ আলেকজান্দ্রোভিচ,' বলে গেলেন তিনি (এবং আমি জানলাম যে, খুব গুরুত্ব দিয়ে কথা বলছেন বলে আমার পুরো নামটা তিনি উচ্চারণ করলেন)। 'আরও কিছু কথা আছে। যুগোস্লাভিয়া থেকে যে বইগুলো তুমি এনেছ ওগুলো কোথাও লুকিয়ে রাখো।'

ওই বইগুলো আমাকে দিয়েছিলেন বাবার বন্ধু—যুগোস্লাভ সেনাবাহিনীর জনৈক মেজর। তখন খুবই ছোট ছিলাম। জানতাম না যে, একমুহূর্তে কেউ কারও প্রিয়পাত্র হতে পারে, আবার পরমুহূর্তে বিরাগভাজন হয়ে যেতে পারে। পরিণত বয়সে ওই ঘটনা বারে বারে আমার মনে পড়েছে, প্রতিবারেই নতুনতর তাৎপর্যসহ।

১৯৪৯ সালে বাবা আমাকে মস্কোর সকোলনিকি জেলার এক নম্বর স্কুলে ভর্তি করাতে সক্ষম হন। অর্ধেকের মত বিষয় পড়ানো হত ইংরেজীতে। টিচাররা ছিলেন মস্কোর সেরা। বাবা খুব গর্বিত ছিলেন আমাকে নিয়ে। বলতেন যে খেটেখুটে পড়লে এবং ভাল আচরণ করলে আমি বৈদেশিক সার্ভিসে অফিসার হতে আর বিদেশ ভ্রমণ করতে পারব। আমার বুঝতে বেশিদিন লাগেনি যে, স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্রই ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের সুবিধাভোগী লোকদের ছেলে। এটা ছিল অভিজাত স্কুল। ছাত্রদের পোশাকও ছিল আমার পুরানো স্কুলের ছাত্রদের চাইতে উন্নত। পুরানো স্কুলে আমরা সবাই নিম্ন মানের মলিন কাপড়চোপড় পড়তাম। আমার কোন কোন সহপাঠীকে দেখে মনে হত ঠিকমত খাবার পায় না।

বাবা যতই গর্ব করুন, অসাধারণ ভাল ছাত্র আমি ছিলাম না। যেসব বিষয় ভাল লাগত সেগুলোই পড়তাম মন দিয়ে, বাকিগুলোকে যতটা সম্ভব উপেক্ষা করতাম। রুশ ভাষা আর সাহিত্যে খুব ভাল করলাম। ইংরেজী, ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজ জাতির ইতিহাসেও ভাল ছিলাম আমি। লঙফেলোর কবিতা, সমারসেট মম-এর উপন্যাস এবং পরবর্তীকালে এডগার এলানপোর গল্প নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম। তবে গণিত, পদার্থবিদ্যা আর রসায়ন শাস্ত্রে ছিলাম কাঁচা।

ওই বিশেষ স্কুলে পড়ার সময় সৎমা আর আমার সম্পর্কে ফাটল ধরল।

অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, তাঁর সাথে কথা বলাও কঠিন হয়ে উঠল আমার পক্ষে। মন খুলে কিছু বলা তো দূরের কথা। তাঁর উপস্থিতিতে ক্রমেই বেশি বেশি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তখনও আমরা একই ঘরে থাকি। তাই যতক্ষণ সম্ভব বাইরে কাটাতে শুরু করলাম, কখনও বাড়ির সামনে খেলাধুলায় কিংবা পাবলিক লাইব্রেরিতে বই পড়ে।

আমার সৎমা স্বভাবগতভাবে একটু নার্ভাস এবং রুগচটা ছিলেন। সব কিছু নিখুঁতভাবে হোক এটাই তিনি চাইতেন। কোন কিছুতে খুঁত দেখতে চাইতেন না। 'আমি মস্কোর সবচেয়ে নামী স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েও তাঁর মতে সুযোগটা নষ্ট করে ফেলছি। বাবার কোন উদ্বেগ ছিল না। তিনি জানতেন ছেলেদের মেধা অনেক সময় দেরিতে প্রকাশ পায়। আরেকটু বয়স বাড়লে আমার বেলায়ও তাই ঘটবে। কিন্তু আমার মনে হয়, আনাস্তাসিয়া ভাবছিলেন যে, আমাকে ওই স্কুলে পড়িয়ে পয়সা অপচয় করা হচ্ছে। তাছাড়া তিনি ভাবতেন আমার মালিকানা তাঁর। সে যাই বলুক, আমার জীবনটা তিনিই তো রক্ষা করেছিলেন। আনাস্তাসিয়া দাবি করে বসলেন যে আমাকে ক্লাসে ফার্স্ট বয় হতে হবে। খাতায় পাঁচের বদলে দুই বা তিন পেলেই রেগে আগুন হয়ে মারধর করতেন। একেক সময় বেদম মার। তিনি জানতেন যে, এসব মারধরের ব্যাপার জানলে বাবা রাগ করবেন। তাই প্রত্যেকবার পিটুনির পর হুমকি দিতেন বাবার কাছে টুঁ-শব্দটি করলে আরও বেশি মারবেন। বিশ্বাস করতাম তাঁর কথা।

বাবা সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। গোটা সপ্তাহের মধ্যে তাঁর সান্নিধ্য পাবার তেমন সুযোগ পেতাম না। কিন্তু রবিবার, তাঁর ছুটির দিনে, আমার সাথে যতটা সম্ভব সময় কাটাতেন। বই কেনা ছিল তাঁর শখ। আমাকে নিয়ে চলে যেতেন সেসব বইয়ের দোকানে যেখানে প্রখ্যাত রুশ লেখকদের বই এবং ইউরোপীয় ক্লাসিক্স-এর রুশ অনুবাদ পাওয়া যায়। তিনি বার বার জোর দিয়ে বলতেন যে, একমাত্র নিষ্ঠাবান পাঠক হলেই আমি একজন সত্যিকারের সুশিক্ষিত লোক হতে পারব। বলতেন, পড়তে পড়তে জীবন সম্পর্কে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। চিন্তাশীল লোক ছিলেন বাবা। সৎ ও মর্যাদাবান মানুষ। শিক্ষা গ্রহণে কখনও বিরত হননি। পার্টি বা কোন সরকারী কর্তার সমালোচনা তাঁর মুখে কখনও শুনিনি। তিনি ছিলেন সমর-বিজ্ঞানী। জীবনের শেষ দিকে এক সামরিক ইনস্টিটিউটের রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। মাদার রাশিয়া আর তার ইতিহাসকে ভালবাসতেন। তবে আইন ভঙ্গ করে প্রাক-বিপ্লব যুগের লেখকদের কিছু নিষিদ্ধ বই রেখে দিয়েছিলেন। আমাকে প্রায়ই হুঁশিয়ার করতেন বইগুলোর কথা কাউকে না বলতে। 'একেক সময় সত্যকে লুকিয়ে রাখতে হয়, কিন্তু

নিজের কাছ থেকে সত্যকে কখনও লুকিয়ে রেখো না।'

কোন কোন সময় ঘুমের মধ্যে বাবার ওই কথাগুলো এখনও শুনি। ওগুলো হয়ে দাঁড়ায় আমার জীবনের দিক নির্দেশনা। ওগুলো ছাড়া আমি যে কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা নেয়া সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। বিশালদেহী, অকপট, সংবেদনশীল, কঠোর পরিশ্রমী বাবার কথা আমার মনে থাকবে আজীবন।

স্মৃতি অতীতের কিসব ঘটনাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে ভাবতে আশ্চর্য লাগে। খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ঘটনা নয়। যেমন, ১৯৫৩ সালের ৬ মার্চের ঘটনা। আমার বয়স তখন বারো। রেডিও মস্কো ঘোষণা করল যে, সোভিয়েত জনগণের নেতা জোশেফ ভিসারিওনোভিচ স্তালিন মারা গেছেন। ঘোষণাটা শুনে অবাস্তবতার কি অনুভূতি জেগেছিল তা এখনও মনে পড়ে। এক অস্বাভাবিক নীরবতা গ্রাস করল গোটা স্কুলকে। শিক্ষক-ছাত্র সবাইকে দেখাল হতভম্বের মত। স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফেরত লোক। যুদ্ধে একটা চোখ হারান। এক দীর্ঘ ভাষণে তিনি বোঝাতে লাগলেন স্তালিনের মৃত্যু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার জনগণের জন্য কত বড় বিয়োগান্ত ঘটনা। বক্তৃতার মাঝখানে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর ভাল চোখটা থেকে দরদর ধারায় অশ্রু নামল, কাঁচের চোখটি শুকনো রয়ে গেল। কয়েকটি ছেলে হেসে উঠল খিক্‌খিক্ করে। ক্লাস সব ছুটি হয়ে গেল। বাড়ি চললাম সক্রিফাসোভস্কি হাসপাতালের কাছ দিয়ে। ওই হাসপাতালের জরুরী বিভাগটি মস্কোর সবচেয়ে বড়।

সেদিন শেষ বিকালে কয়েকজন প্রতিবেশী আমাদের বলল যে, অ্যাম্বুলেন্স, মিলিটারি ট্রাক থেকে শুরু করে যে কোন ধরনের যানবাহনে করে শত শত লোককে আনা হয়েছে হাসপাতালে। স্তালিনের মরদেহ দর্শনের জন্য সমবেত জনতার চাপে ওরা আহত হয়েছে। আহতদের অনেকের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই। মস্কোতে যে ব্যাপক বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। শোক বিহ্বল জনতাকে সরানোর জন্য সেনাবাহিনী নামাতে হয়েছিল। স্তালিনের মৃত্যুতে জনগণ আন্তরিক ভাবে শোক প্রকাশ করেছিল। মনে হয়েছিল, গোটা জাতি যেন দিশা হারিয়ে ফেলেছে।

শোক অচিরেই পরিণত হয় ভয়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমার বাবার ওপর সমন জারি করা হয় স্তালিনের জনৈক ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর বিচারে সাক্ষী দেয়ার জন্য। ট্রাইব্যুনালটি গঠিত হয় স্তালিনের মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পরে। 'রুশ জনগণের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের অভিযোগে কেজিবি নিরাপত্তা প্রধান ল্যাভ্রেন্তি বেরিয়ার

গোপন বিচার অনুষ্ঠানের জন্য। অভিযোগগুলো ছিল পাইকারী হত্যা ও নৃশংস নির্যাতনের। নিঃসন্দেহে তিনি দোষী ছিলেন। অন্তত ট্রাইব্যুনাল তাঁকে দোষী সাব্যস্ত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের বিচারকালে এ অরুচিকর সত্যও উদ্‌ঘাটিত হয় যে, খোদ স্তালিনের সরাসরি নির্দেশেই বেরিয়া ওই অপরাধগুলো করেছিলেন। পশ্চিমীরা স্তালিনকে ডাকত 'আঙ্কল জো'। এ সত্য উদ্‌ঘাটনের পর প্রমাণ হয়ে গেল যে, আর সব একনায়কের মত তিনিও ছিলেন দু'মুখো, নির্মম নিষ্ঠুর। অপরাধগুলো ছিল স্তালিনের। বেরিয়া হন বলির পাঁঠা। ওই বিচার চলাকালে প্রতিদিন আমার বাবা ঘরে ফিরতেন আচ্ছন্নের মত। নির্বাক বসে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর একসময় বলে উঠতেন, 'বেরিয়ার মত উচ্চপদস্থ লোক নিজের জনগণের বিরুদ্ধে অমন সব নৃশংস ঘটনা ঘটাতে পারে তা বিশ্বাস করতে পারছি না, বিশ্বাস করতে পারছি না।'

একরাতে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা শুনতে শুনতে জীবনে প্রথমবার একটা কথা আমার মনে জাগে—যা পরে বহুবার মনে হয়েছে। কথাটা হচ্ছে, 'বাবা যে প্রকৃত রাশিয়াকে ভালবাসেন সেটা, আর এই নতুন সোভিয়েত ইউনিয়ন, এক জিনিস নয়।'

সেই বছরের শেষ দিকে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারের কাছে গিয়ে একদিন দুপুরে ফিরে এলেন। এমনটি তিনি কখনও করেন না। গভীর স্নেহভরে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। যেন আমার চেহারাটা গেঁথে রাখার চেষ্টা করছেন মনের পাতে। 'স্তাস,' বললেন নরম সুরে। কেশে গলা পরিষ্কার করে আবার বললেন, 'স্তাস, আমার ক্যান্সার হয়েছে। আমি বোধহয় মারা যাচ্ছি।'

স্তম্ভিত হয়ে শেষে বললাম, 'তুমি জানলে কেমন করে? ডাক্তাররা বলেছে?'

'কেউ বলেনি, হয়তো বলতে ভয় করছে। তবে ক্যান্সারই হয়েছে আমার,' বললেন তিনি। হঠাৎ কাঁদতে লাগলেন। কি করুণ দৃশ্য। শেষ পর্যন্ত অশ্রু সংবরণ করে বললেন, 'তোকে গড়ে তোলার জন্য আমি এ দুনিয়ায় আর থাকব না, বাপ। আমাকে কথা দে স্তাস, তুই ভাল মানুষ হবি। সব সময় মনে রাখবি যে তুই ভদ্রলোক। ইজ্জত বজায় রেখে চলবি।'

সেই আলাপের দিন কয়েক পরেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। ওরা 'অপারেশন' করে। কিন্তু ক্যান্সার আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল নানা জায়গায়। ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছিলেন তিনি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। মৃত্যুর স্বল্পকাল আগে তাঁর পদোন্নতি হয় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল হিসাবে। কিন্তু সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলে আমি নিশ্চিত নই। শেষ দিনগুলোতে

বেশিরভাগ সময় তিনি অচেতন ছিলেন। হাসপাতালে ভর্তির ছয় মাস পরে মৃত্যু হয় তাঁর। বাপকে হারিয়ে মনের দিক থেকে বিধ্বস্ত হয়ে যাই। নিজেকে এতিম ভাবতে শুরু করি। সৎ-মার সাথে ভাব হয়নি। সৎ-বোনের সাথেও তেমন ঘনিষ্ঠ ছিলাম না। বুদ্ধি-উপদেশ চাওয়ার মত কেউ ছিল না আমার। আমি একা হয়ে গেলাম।

আমার মৃত মায়ের প্রতি সৎমা'র এক বদ্ধমূল ও অশোভন ঈর্ষা অনেক আগেই প্রকাশ পেয়েছিল। মায়ের সব ছবি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন তিনি। বাবার সাথে বিয়ের কিছুদিন পরেই গোঁ ধরেছিলেন আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দত্তকপুত্র বলে গ্রহণ করবেন। সে সময় দত্তকপুত্র হিসাবে গৃহীত হওয়াটাকে ভালই লেগেছিল আমার। কারণ, একটা আসল মা পাবার জন্য পাগল ছিলাম তখন। কিন্তু কালে কালে বুঝলাম যে, তাঁর সেই গোঁ-টা ছিল আমার মালিক হবার সঙ্কল্পেরই অংশ। আনাস্তাসিয়া আমাকে দত্তক গ্রহণের ফলে আমার একটা উপকার হয়। আমার মা যে ইহুদী বংশের ছিলেন সে তথ্যটা সরকারী রেকর্ডে আর থাকেনি। সবচেয়ে দুঃখ লেগেছিল মার ছবিগুলো পুড়িয়ে ফেলায়। ছবিতে মা'র চেহারা এমনিতেই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবু এখনও ঘুমের মধ্যে মনে পড়ে মাকে। দেখতে পাই আমার ছোট্ট মাকে। জন্ম ও জীবনদাত্রী মাকে আমরা কেউ কখনও বোধ হয় ভুলতে পারি না।

ষোলো বছর বয়সে সৎমার কঠোর কর্কশ ব্যবহারের কারণে কয়েকবার পালিয়ে যাই বাড়ি থেকে। কয়েকটা কোপেক পকেটে নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। সামান্য রুটি কিনে খেয়ে শুয়ে থাকতাম কোন নির্মাণাধীন বাড়িঘরের কোণে। ফিরে এলে তিনি সব সময় বলতেন যে, আর কখনও কঠোর ব্যবহার করবেন না। কিন্তু কথা তিনি রাখতেন না।

আমার সতেরো বছর বয়সে সৎ-মা'র সাথে চূড়ান্ত লড়াইটা বাধল। কারণটা ঠিক মনে পড়ছে না। আসলে, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাঁর কোন অজুহাতের দরকার হত না। একটা তোয়ালে রোদে না দেয়া, ফ্লোরে রুটির টুকরো পড়া, কাপ থেকে ছলকে চা পড়ে যাওয়া, এসব একটা কিছু পেলেই হলো—তিনি ফেটে পড়তেন। আমি জানতাম তাঁর প্যাটার্নটা। প্রথমে চেঁচামেচি-গর্জন, তারপর মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেলে ঝাড়ু, লাঠি বা যে কোন একটা কিছু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। তারপর মারপিট। একেক সময় শরীরে কালসিটে দাগ পড়ে যেত। অবশ্য সতেরো বছর বয়সে আমি আকারে ও উচ্চতায় প্রায় পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হয়ে গিয়েছি। সিদ্ধান্ত নিলাম যে, রুখে দাঁড়াব।

'আবার যদি মারো,' বললাম তাঁকে, 'তোমাকে পুলিশে দেব। স্কুলে নালিশ

জানাব তোমার বিরুদ্ধে। এসব মারপিট আর সইব না।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তিনি বললেন, 'যা যা, নালিশ করগে না, কেউ বিশ্বাস করবে না তোর কথা। তুই হচ্ছিস গোলমালের ওস্তাদ। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাস। আমার কথা বিশ্বাস না করে তোর কথায় কান দেবে কে? আমি একজন সম্মানিত ডাক্তার। হাসপাতালে কাজ করি। তোর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না!'

আমার দিকে এগোলেন তিনি। আমি নড়লাম না। দু'হাতে মুঠো পাকিয়ে সামনে পা বাড়ালাম। 'আর মারপিট হজম করব না। এবার আমি লড়ব। এবার মার খাবে তুমি!'

মুহূর্তে সব রাগ উবে গেল তাঁর। মুখটা সাদা হয়ে গেল। হঠাৎ ঘুরে চলে গেলেন। প্রথমে দারুণ খুশি লাগল—পরক্ষণেই প্রচণ্ড এক অপরাধবোধে ভরে গেল মনটা। কোথায় যেন পড়েছিলাম তরুণরা কখনও মুরব্বিদের হারিয়ে দিয়ে মনে মনে নিজেদের অপরাধী না ভেবে পারে না। এটা সত্য। জানতাম আমার রুখে দাঁড়ানোটা ঠিকই হয়েছে, কিন্তু তবুও মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল! তাছাড়া, এতে আমাদের সম্পর্কের কোন উন্নতি হলো না। সম্পর্কটা অত্যন্ত নিরুত্তাপ, আনুষ্ঠানিক ও বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াল। আঠারো বছর বয়সে আমি তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেলাম। আমাদের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হলো।

দশ বছর বয়সে সৎ-মা'র পিটুনি সহ্য করতাম। কারণ ভাবতাম যে, আমিই দোষী। মনে পড়ে, একবার ছুটে বাইরে চলে গিয়েছিলাম যাতে কেউ আমার কান্না না দেখে, না ভাবে যে আমি এক ভয়ঙ্কর দুষ্টু ছেলে—নইলে অমন মার খেতাম না। এখন বয়স হয়েছে। পড়াশুনা করেছি। শিশু মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করেছি। পরিস্থিতিটা এখন অনেক পরিষ্কারভাবে বিচার করতে পারি। অত্যাচারিত শিশুরা সব সময় নিজেদেরকেই দোষী ভাবে। আমি ছিলাম অত্যাচারিত শিশু। ওসব ভাবতে এখন গভীর দুঃখ পাই মনে।

সৎ-মা'র বিরূপতা সত্ত্বেও লেখা-পড়া আমার চলতে লাগল। বিশেষ মনোযোগ দিলাম সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ওপর। আমার ইতিহাসের টিচারটি ছিলেন অসাধারণ। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। এক মুখ দাড়িওয়ালা লোকটিকে দেখায় উনিশ শতকের পেইন্টিং-এর মত। অনেকটা যেন পুরানো রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী। বিশুদ্ধ রুশ ভাষায় কথা বলতেন তিনি। আমাদের সংস্কৃতির একটা উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরতেন। আধুনিক ইতিহাস পড়াতে গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়লাভের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার মহিমা কীর্তন না করে সাধারণ মানুষের ত্যাগ আর বীরত্বের ওপর বেশি জোর দিতেন।

একজন জীবন্ত বীর দর্শনের প্রথম অভিজ্ঞতা কখনও ভোলার নয়। কি হতাশাজনক অভিজ্ঞতা! আমার বয়স তখন প্রায় ১৪ বছর। একদিন আমাদের জড়ো করা হয় বিপ্লবের অন্যতম 'মহান বীর' মার্শাল বুদিওন্নির ভাষণ শোনার জন্য। স্কুল ছুটির পরে আটকে রাখা হয়। ছুটির পরে এক থুথুরে বুড়ো বলশেভিকের বক্তৃতা শুনে সময় নষ্ট করার কোন ইচ্ছাই ছিল না আমাদের। আমরা যখন ফাঁকফুঁকে কেটে পড়ার চেষ্টা করছি এবং টিচাররা আমাদের ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন ঠিক তখনই এক সরকারী লিমোজিনে চড়ে 'মহান বীর' এলেন। বুড়ো তিনি বটেই, তবে থুথুরে ছিলেন না। সত্তর বছরের বুড়োটি অডিটোরিয়ামে ঢুকে বিশৃংখলার জন্য আমাদের এবং টিচারদের এমন অশ্লীল ভাষায় বকুনি দিলেন যা আগে কোনদিন শুনিনি।

রাগ সামলাতে পারেননি বুড়ো। ফলে তাঁর বক্তৃতা একজন অশিক্ষিত লোকের বকবকানির মতই শোনাল। বাড়ি ফেরার সময় এক বন্ধু আমার কাছ ঘেঁষে ফিসফিস করে বলল, 'সব মহান বীরই এ বুড়োর মত নাকি?' আমিও নিজেকে ওই একই প্রশ্ন করেছিলাম।

১৯৫৮ সালে হাই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করি। আমি চেয়েছিলাম কূটনীতিবিদ হতে। ভেবেছিলাম মস্কোর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে না পারলে আকাশ ভেঙে পড়বে। ভর্তি হতে পারিনি, যেহেতু ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় মার্ক আমার ছিল না। অগত্যা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ইনস্টিটিউটে দরখাস্ত করি। জানতাম যে, আমার দরখাস্ত গৃহীত হবে। ভর্তি পরীক্ষায় পাস করলাম ভাল নম্বর পেয়ে। ক্লাস শুরু করি ১৯৫৮ সালে। এখান থেকে জাপান বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমার যাত্রা শুরু হয়। সূচনা থেকেই যা কিছু শিখলাম তাই ভাল লাগল আমার। হাই স্কুলে থাকতে জাপানী লেখকদের কিছু বই হাতে এসেছিল। এখন সবার নাম মনে নেই। কিন্তু আকুতাগাওয়া রিউনোসুকের বই পড়ে যে চমক অনুভব করেছিলাম তা মনে আছে। রশোমন-এর প্রথম কয়েক পাতা পড়েই বুঝেছিলাম যে লেখক একজন জিনিয়াস এবং তিনি রাশিয়ার মানুষদের মত মানুষ নিয়েই লিখে যাচ্ছেন। তাঁর লেখা আমাকে আইভান তুর্গেনেভের রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়।

আমি পরবর্তী জীবনে যা হয়েছি তার গোড়াপত্তন হয় কলেজের শিক্ষায়। আমার দু'জন প্রফেসরের সাহায্যে জাপানী ভাষায় কথা বলতে শেখার সুবিধা না পেলে জাপানী যেমন অনর্গল বলতে পারি তেমন হয়তো পারতাম না। চারজন

শিক্ষকের কাছে আমি অনেক ঋণী। তাঁরা হলেন, জাপানী ভাষার অধ্যাপক মিসেস ইভানেনকো এবং কাতায়ামা, জাপানী সাহিত্যের শিক্ষক অধ্যাপিকা ইরিনা লিভোভা এবং প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক গ্যালপেরিন। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষিত লোকমাত্রই এঁদের নাম জানেন। এঁদের কারও কাছে শিক্ষা লাভের দাবি করা 'আমি আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে শিক্ষা পেয়েছি' কিংবা 'সাহিত্যের পাঠ নিয়েছি উইলিয়াম ফকনারের কাছ থেকে' বলার মত। পরিহাসের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ওই চারজন চমৎকার শিক্ষকের তিন জনই সোভিয়েত ব্যবস্থার কাছ থেকে পাওয়া মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের গভীর ক্ষতচিহ্ন বহন করেছেন।

মিসেস ইভানেনকো জাপানী যুদ্ধবন্দী শিবিরে দোভাষীর কাজ করতে করতে কিছুটা মিলিটারী ঢং-এ অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কাতামায়া মস্কো এসেছিলেন তাঁর বাবার সাথে। তাঁর বাবা ছিলেন নামজাদা জাপানী কমিউনিস্ট। জাপান থেকে পালিয়ে আসেন ১৯৩০-এর দশকে। বছর কয়েক পরে তিনি মারা যান। তাঁর চিতাভস্ম সমাহিত হয় ক্রেমলিন প্রাচীরের অভ্যন্তরে—অন্য কমিউনিস্ট নেতাদের একই সারিতে। একজন বিদেশীর জন্য একটা খুব বড় সম্মান। আমার সাথে প্রথম পরিচয়ের সময় মিসেস কাতায়ামার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। বেশির ভাগ সময় তাঁকে দেখা যেত বিষণ্ন ও অবদমিত। একেক সময় নার্ভাস এবং আবেগতাড়িত। রুশ ভাষা বলতে কষ্ট হত তাঁর। আদর্শগতভাবে কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে চলা কঠিন ছিল তাঁর পক্ষে। জীবনটা কঠিন ছিল তাঁর জন্য, কারণ সোভিয়েতরা বিদেশীদের বন্ধু হতে জানে না।

আমার জাপানী সাহিত্যের অধ্যাপিকা ছিলেন ইরিনা লিভোভা। এই রুশ মহিলাটি ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের জাপানী সাহিত্য বিষয়ে সেরা বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। তরুণী অবস্থায় তিনি নিক্ষিপ্ত হন স্তালিনীয় কারাগারে। সেখানেই মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে কাটাতে হয় দশটি বছর। শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। জাপানী ভাষার যে কোন বই হাতে নিয়ে তিনি পড়তেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে যেতেন। আমার থিসিস তৈরির সময় ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তিনি উপদেশ দিতেন। কৃতজ্ঞতার সাথে আমি তাঁকে স্মরণ করি।

অধ্যাপক গ্যালপেরিন ছিলেন জাপানী ইতিহাস বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞ। আমার ভাগ্য যে, তাঁর কাছে শিক্ষালাভের

সুযোগ পেয়েছিলাম। বুদ্ধিদীপ্ত ও নম্রভাষী এ মানুষটি জানতেন ছাত্রদেরকে কিভাবে মুগ্ধ করতে হয়।

আমি যখন কলেজে সে সময় 'অ-স্তালিনীকরণ' প্রক্রিয়া চলছিল, তবে খোলাখুলি কথা বলা বা আলোচনার সুযোগ আমরা পাইনি, বিশেষ করে সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে। এমনকি কলেজেও কেজিবি আমাদের ওপর কড়া নজর রাখত। ছাত্রদের মধ্যে কেজিবি'র গোপন ইনফর্মাররা ছিল। এ রকম এক ইনফর্মার আমার এক ক্লাসমেটকে ধরিয়ে দেয়। ওকে গ্রেফতার করে 'ইহুদীবাদী প্রচারণার' অভিযোগে আট বছরের জন্য জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। যদিও একুশ বছর বয়সী একটা ছেলে কি ধরনের প্রচারণা চালাতে পারে তা বলা কঠিন। কেজিবি অফিসাররা কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে ক্যাম্পাসে এক বৈঠক করে। ওরা সাংস্কৃতিক ব্যাপারে ক্রুশ্চভের নীতির সমালোচনা করেছিল। ওদেরকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে ওদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে কেজিবি সম্ভবত ইনফর্মার হিসাবে রিক্রুট করতে পেরেছিল। কোলাবোরেটরদের চেনা খুব সহজ ছিল। আমি ওদেরকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতাম।

ভিয়াচেশ্লাভ পিরোগোভ ছিল এ রকম একজন কোলাবোরেটর। আমার চাইতে দু'বছরের বড় ছিল সে। কিন্তু তার গ্র্যাজুয়েশন পার্টিতে আমি ছিলাম। সেখানে যে যথারীতি মাতাল হয়ে যায়। টলমল পায়ে হাঁটতে থাকে চারদিকে। ভাব দেখাতে থাকে একজন পুরাদস্তুর কেজিবি অফিসারের মত। সবাইকে হুকুম দেয় আরেকটি রুমে গিয়ে কেজিবি'র কাজ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে তার সাথে আলোচনায় বসার জন্য। এতে কয়েকজন অতিথি প্রথমে রেগে আগুন হয়ে যায়। পরে কে যেন বলে দেয় যে, সে যা বলছে তাই করো, একটু রগড় করো মাতাল বুদ্ধুটার সাথে। এরপর সবাই উঠে বিনীতভাবে অনুসরণ করল পিগোরোভকে। সে এক এক করে সবাইকে জেরা করল। বেশ মজাই হলো। তার বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ করল না ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের কাছে। বহু বছর পরে টোকিও'র দূতাবাসে গিয়ে আমি যখন কাজে যোগদানের রিপোর্ট করলাম তখন দেখি দামড়া পিগোরোভটা বসে আছে সেখানে—তখন একেবারে খাঁটি কেজিবি'র লোক।

কলেজে যাবার আগে মেয়েদের দিকে কোনদিন নজরই পড়েনি। আর যখন পড়ল, আহ! স্বীকার করছি যে নব আবিষ্কৃত এ বিস্ময়গুলোর দরুন আমার পড়াশোনা একটু বিঘ্নিত হতে লাগল। ক্লাসের পর আমি আর আমার বন্ধুরা চলে যেতাম মোখোভায়া স্কোয়ারের মস্কভা ক্যাফেতে। ওখানে বসে কথা বলতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমরা সবে প্রবেশ করেছি চিন্তা বা আইডিয়ার জগতে এবং

সেটা উত্তেজক ব্যাপার বৈ-কি। ওই ক্যাফের ভিড়ের মধ্যেই বহু রোমান্সের জন্ম হয়। আমি নিজে যে কতবার প্রেমে পড়েছি এবং কতবার প্রেমে ভঙ্গ দিয়েছি তার হিসাব নেই—সপ্তায় অন্তত দু'বার তো বটেই। একটা টেবিল ঘিরে বসতাম। আলাপ জুড়ে দিতাম কোন মেয়ের সাথে। মেয়েটিকে হয়তো বছর বছর ধরে জানি, তবু হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, বড় সুন্দরী সে। তাৎক্ষণিক রোমান্স। এক মেয়ের সাথে প্রায় বছরখানেক চললাম। মেয়েটি প্রায় সাত ফুট লম্বা। আমার উচ্চতা মাত্র পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। মিষ্টি, বুদ্ধিমতি, নারীসুলভ কমনীয়তায় মণ্ডিত মেয়ে। কিন্তু আমাদের মেলামেশা থেকে কিছুই ঘটল না। হ্যাঁ, আমরা জানতাম যে, লোকে জুলজুল করে চেয়ে থাকে আমাদের দিকে, আমাদের দু'জনকে পাশাপাশি একটু বেমানান দেখায়। একেক সময় লোকে কেমন বিস্ময়ভরা চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তা দেখে লজ্জা পেয়ে দু'এক গ্লাস মদ গিলে আমরা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো বিল্ডিং-এর প্রবেশপথের তোরণের নিচে নাচ জুড়ে দিতাম। তবে আগেই বলেছি, এর বেশি আমরা এগোতে পারিনি। এমন কোন উঁচু জায়গা কখনও পাইনি যার ওপর দাঁড়িয়ে ওকে চুমু দিতে পারি। পরস্পরের ভাল বন্ধু হিসাবেই থেকে যাই আমরা। আমার প্রথম বিয়ের অনুষ্ঠানে ও উপস্থিত ছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'প্রিয় স্তাস, তোমার ইয়েলেনা কি সুন্দর! তোমার বিয়ের অনুষ্ঠানও অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে।'

সুন্দরী ইয়েলেনার সাথে আমার দেখা হয় ১৯৫৯ সালে। আমার বয়স তখন আঠারো। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলোলজি বিভাগের ছাত্রী ছিল ইয়েলেনা। দেখা হওয়া মাত্রই শুধু মেলামেশা নয়, ওকে জয় করার চেষ্টায় লেগে গেলাম। এ কাজটা প্রথমটার চাইতে একটু কঠিন। সাধারণ মেলামেশার ক্ষেত্রে একজন তরুণ মস্কোবাসীর কোন প্রকাশ্য স্থানে কিংবা গ্রুপে অংশ নিয়ে মেয়েটির সাথে দেখা-সাক্ষাৎ রীতিসম্মত। কিন্তু বিয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে মেলামেশাটা আরও গুরুতর ব্যাপার। সেক্ষেত্রে ওরা নির্জনতা চায়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, ওদের হাতে পয়সা থাকে না। থাকলেও যাবার মত জায়গা কোথায়? মাঝে মধ্যে সিনেমায় যাওয়া, সস্তার কোন রেস্তরাঁয় বসে খাওয়া—বড়জোর এ পর্যন্ত। এছাড়া যাবার মত জায়গা বলতে আছে পাবলিক পার্ক। সেখানে শীতকালে বেজায় ঠাণ্ডা। কিংবা কোন মিউজিয়াম, আর্টগ্যালারি বা অন্য কোথাও যাওয়া। ইয়েলেনার সাথে কথা বলা সহজ। কয়েকদিন পর থেকেই আমরা আমাদের অবসর সময়ের পুরোটা একসাথে কাটাতে লাগলাম। ১৯৬০ সালের প্রথমদিকে আমাদের দু'জনেরই বয়স ছিল খুব কম। তখনও জানতাম না যে, সাহচর্য আর

প্রেম এক জিনিস নয়। সে সময়ে আমাদের মনে হলো বিয়ে করে ফেলাটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ। ইয়েলেনার মা আর দাদু রাজি ছিলেন। কাজেই আর সব তরুণ সোভিয়েতরা যা করে আমরাও তাই করলাম—বিয়ে করে ফেললাম রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে। ইয়েলেনা একটা চমৎকার সাদা গাউন আর ওড়না পরেছিল। বিয়ের পার্টি, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব দল বেঁধে গেল রিজিস্ট্রি অফিসে। লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম একটা কুঠুরির সামনে। রাক্ষসীমুখো এক মহিলার কাছ থেকে ফরম নিলাম পূরণ করার জন্য। আমাদের সামনে-পিছনে আরও অনেক বিয়ের পার্টি। একটা বিয়ে শেষ হতেই শুরু হচ্ছে আরেকটা। আমাদের পালা এলে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো আরেকটা কামরায়। ঘরটা অভ্যর্থনা কক্ষের মত। একটা ফনোগ্রাফে ঘড়ঘড়ে আওয়াজে বাজছিল মেণ্ডেলসনের 'ওয়েডিং মার্চ'। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা শপথ নিলাম। তিন মিনিটে হয়ে গেল বিয়ে। ইয়েলেনার পরিবার ওদের বাড়িতে একটা পার্টি দিল। পার্টিটা চলল পরদিন ভোর পর্যন্ত।

আমাদের দু'জনের সম্বল কেবল উভয়ের স্টাইপেণ্ড। কোন অ্যাপার্টমেন্টে একটা রুম ভাড়া নেয়ার ক্ষমতাও আমার ছিল না। কাজেই আমরা বাস করতে লাগলাম কুস্তশেভো এলাকায় ওর দাদুর পুরানো কাঠের বাড়িতে। ওর মা আর দাদুর সাথে। পারিবারিক জীবন—যেখানে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই এবং সবাই মিলেমিশে কাজ করে সেটা কি জিনিস এই প্রথম আমি সত্যিকার ভাবে বুঝলাম। প্রথম পেলাম বাপের মত শ্রদ্ধাভাজন ও অনুকরণযোগ্য একজন মানুষ। নিজের বাবা পরম প্রিয় হলেও মারা গেছেন প্রায় আমার কৈশোরে। আমাদের সম্পর্কটা ছিল মুরুব্বি আর বাচ্চার সম্পর্ক। ইয়েলেনার দাদু আর আমার সম্পর্কটা গড়ে ওঠে সমকক্ষতার ভিত্তিতে।

দাদু ছিলেন ইতিহাসের খনি বিশেষ। ইতিহাসের কোন বই পড়ে অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি তার চাইতে অনেক বেশি জেনেছিলাম দাদুর কাছ থেকে। বিপ্লবের মধ্য দিয়েই তাঁর জীবন কেটেছে। ১৯০০ সালের শুরুতে আইনের ছাত্র থাকাকালে তিনি হন বলশেভিক। বিপ্লবে তিনি শুধু অংশগ্রহণ করেননি, প্রাক-বিপ্লবকালে বহু বলশেভিকের পক্ষে আইনজীবী হিসাবেও কাজ করেন। সফলও হন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু বলশেভিক জারের কারাগার থেকে মুক্তি পায়।

বিপ্লবের পরে দাদু জীববিজ্ঞানী হবার জন্য পড়াশোনা করেন এবং ক্রমে 'জেনিটিক্স' সংক্রান্ত গবেষণার জন্য স্বীকৃতি লাভ করেন। স্তালিনের অন্যতম প্রিয়পাত্র অধ্যাপক লাইসেঙ্কোর বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আক্রমণাত্মক নিবন্ধ লিখেন।

নিজের অবস্থানে প্রায় দৃঢ় থাকার কারণে ত্রিশের দশকে তিনি কারারুদ্ধ হন। কুখ্যাত লিউবিয়াঙ্কা কারাগারে বন্দী করে রাখা হয় তাঁকে। ওই আশ্চর্যজনক মানুষটির কাছ থেকে যে তথ্য আমি জেনেছি, আমার কাছে তার মূল্য অপরিসীম। তাঁর কাছ থেকে আমি স্তালিন আমলের সূচনাপর্বের এক সঠিক চিত্র পেয়েছি—যা সোভিয়েত বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্য সম্পূর্ণ বানোয়াট ইতিহাস বইতে নেই।

দাদুর কাছ থেকে পাওয়া আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে, সোভিয়েত কৃষির তথাকথিত যৌথকরণ সংক্রান্ত। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'লাখ লাখ মেধাবী সুদক্ষ কৃষককে কুলাক (পরজীবী) আখ্যা দেয়া হয়, জেলে ভরা হয় কিংবা পাঠানো হয় নির্বাসনে। 'আরও লাখ লাখ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়। কারণ জমিতে খাদ্যশস্য ফলাবার লোক ছিল না।' আমি বিশ্বাস করি যে, একমাত্র এ কাজটির ফলে সোভিয়েত কৃষির ভিত চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। দাদুর সাথে আলোচনার ফলে আমি সন্দেহ করতে শুরু করি যে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল মি. ক্রুশ্চভ অস্তালিনীকরণ আমলে আমাদের জনগণকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। ক্রুশ্চভ বলেছিলেন যে, ১৯৩০-১৯৪০-এর দশক ও ১৯৫০-এর দশকের প্রথম পর্বে যত অঘটন-অত্যাচার হয়েছে সেসবের জন্য দায়ী কেবল স্তালিন, আর তাঁকে ঘিরে থাকা দুষ্ট ব্যক্তিদের একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রুপ। স্তালিন সরকারের সকলের সক্রিয় সমর্থন আর অংশগ্রহণ ব্যাতিরেকে একটি ক্ষুদ্র গ্রুপের পক্ষে এসব ভয়াবহ কাণ্ড ঘটানো সম্ভব হত না। দাদু আরও বলেন যে, তিরিশের দশকের শেষ দিকে জেলে থাকা অবস্থায় তিনি ভাল মতই বুঝতে পারেন যে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সরকার জনগণের পক্ষে নয়—বিপক্ষেই কাজ করছে। তিনিই ছিলেন আমার দেখা প্রথম সোভিয়েত নাগরিক যিনি সাহস করে বলেছিলেন যে, খোলামেলা আর সত্যপরায়ণ না হলে, গোপনীয়তার রীতি আঁকড়ে থাকলে সোভিয়েত ব্যবস্থার পতন ঘটবে। তাঁর মতে, ব্যবস্থাটা টিকে আছে মিথ্যা, আধাসত্য এবং নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে।

ইয়েলেনার সাথে আমার বিবাহিত জীবনের দিকে ফিরে তাকালে দু'টি পর্যায় দেখতে পাই—ছাত্রজীবনের পর্যায় এবং দাম্পত্য পর্যায়। আমাদের রুচি-আগ্রহও এক রকম ছিল না। তার পছন্দের বিষয় ছিল ভাষার গঠন প্রকৃতি, লাইব্রেরি ইত্যাদি। আমার পছন্দ ছিল জাপানকেন্দ্রিক। তবু সঙ্গী হিসাবে আমরা ভালই ছিলাম। ইয়েলেনা ছিল শান্ত, চুপচাপ, মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু কি কারণে যেন আমাদের প্রেমটা কখনও গভীর হয়নি। কমেনি, তবে

বৃদ্ধিও পায়নি।

১৯৬০ সালের বসন্তে মৎস্য মন্ত্রণালয় প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিটিউটকে একটা চিঠি পাঠায়। চিঠিতে ইনস্টিটিউটের জাপানী ভাষার ছাত্রদেরকে গ্রীষ্মকালীন চাকরিদানের প্রস্তাব দেয়া হয়। জাপান সাগরে টহলদানরত সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় মৎস্য বিভাগের পরিদর্শকদের দোভাষী হিসাবে কাজ করার জন্য ওদের লোক দরকার। রাষ্ট্রীয় পরিদর্শকরা সোভিয়েত-জাপানী মৎস্য আহরণ চুক্তি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে, নিষিদ্ধ এলাকায় জাপানী জেলে নৌকা দেখলে তল্লাশি চালায়। মাসে ২ শ' রুবল করে ওরা দেয় এ গ্রীষ্মকালীন দোভাষীর কাজের জন্য। কাজটা তিন মাসের। আমার স্টাইপেণ্ড অনেক কম। ২ শ' রুবল আমার জন্য অঢেল টাকা। দূরপ্রাচ্যে যাবার সুযোগ পাব বলে লাফিয়ে উঠলাম। আবার সমুদ্র দেখার প্রলোভন উপেক্ষা করা অসম্ভব মনে হলো। সই করে ফেললাম চুক্তিপত্রে।

বৌকে ওর পরিবারের সাথে মস্কোতে রেখে বিমানযোগে চলে গেলাম খাবারোভস্ক-এ। সেখান থেকে প্লেন বদল করে দুঝ্নো-শাখালিনস্ক-এ। তারপরে ট্রেনযোগে কোর্সাকভ-এ। ওখানে পৌঁছে চড়ে বসলাম একটা বেসামরিক পরিদর্শন জাহাজে। তখন সবে উনিশে পা দিয়েছি এবং ওটা ছিল আমার প্রথম প্রকৃত কাজ।

প্রথম ক'দিন সমুদ্রপীড়ায় এত কাহিল হয়ে পড়ি যে, ভেবেছিলাম মরে যাব। কিছুই খেতে পারতাম না। খাবারের গন্ধেই বমি আসত। কিন্তু সামলে উঠলাম দ্রুত। সাগর ভ্রমণ ভাল লেগে উঠল। মোহনীয় ব্যাপার। শৈশবে কৃষ্ণসাগরের তীরে স্বাস্থ্য নিবাসগুলোতে ভ্রমণের কথা পড়েছিলাম, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর সম্পূর্ণ আলাদা। বারে বারে, কোন কোন সময় দিনের মধ্যে কয়েকবার রং বদলায়, হালকা নীল থেকে হয়ে যায় প্রায় কালো। আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে হয় এ পরিবর্তন। কোন কোন দিন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাই আমরা। সে কুয়াশা এত ঘন যে মনে হত যেন ঘন দুধের মধ্য দিয়ে চলেছি। অন্য সময় পড়ে যেতাম প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে। বিশাল, ভয়ঙ্কর, সুন্দর ঢেউগুলো একের পর এক আছড়ে পড়ত জাহাজের ওপর।

ওরকম এক ঝড়ে আমি প্রায় মরেই গিয়েছিলাম। যে জাহাজে ছিলাম ওটা ছিল পুরানো নিরেট লোহার তৈরি সামরিক জাহাজ। বেসামরিক পরিদর্শনের কাজে নতুন করে নিয়োজিত। সুযোগ-সুবিধা কম। ডেকে কোন লোহার বেষ্টনী নেই। কেবল দড়ি দিয়ে ঘেরা। টয়লেটটা ছিল ডেকের পিছন দিকে একটা ছিদ্র মাত্র। ওখানে যাওয়া একটা চ্যালেঞ্জের মত, বিশেষ করে সমুদ্র যখন তরঙ্গ-

বিক্ষুব্ধ।

এক রাতে পুরানো জাহাজটি লড়ছিল ঝড়ের সাথে। আছড়ে পড়া ঢেউয়ের পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছিল ডেকের ওপর দিয়ে। সমুদ্র আর ঝড়ের গর্জনে কান বধির। ওটা নিশ্চয়ই বিপদসঙ্কুল ডেকের ওপর হেঁটে টয়লেটে যাবার সময় ছিল না। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই বুঝলাম যে, যেতে আমাকে হবেই। প্রাণ হাতে করে কেবিন ছেড়ে উঠলাম ডেকে। খোলা ডেকে পা রাখতেই একটা বিশাল ঢেউ আঘাত করল জাহাজটিকে। জাহাজ কাত হয়ে গেল। ডেকের ওপর দিয়ে পানির স্রোত বয়ে গেল। আমি পিছলে চলে গেলাম ডেকের কিনারায়। আঙুলের মাথা দিয়ে আঁকড়ে ধরলাম ইঞ্চি দুয়েক উঁচু ধারালো লোহার পাত। পড়ে গেলে কেউ টের পেত না পরদিন ভোর হবার আগে। পড়ে যেতে কেউ দেখলেও অন্ধকার সমুদ্রে খুঁজে পেত না আমাকে।

কিন্তু দৈবক্রমে জাহাজের জনৈক অফিসার সেখানে আসেন। আমাকে ওখানে ঝুলে থাকতে দেখে প্রশ্ন করেন, 'স্তানিস্লাভ, কি করছ ওখানে?'

'টয়লেট কোথায় খুঁজছি।'

'সেটা ওখানে নয়।'

প্রকাণ্ড একটা হাত বাড়িয়ে তিনি আমার কব্জি আঁকড়ে ধরে হেঁচকা টানে তুলে ফেললেন ডেকের ওপর। একগাল হেসে বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে। টয়লেট কোথায় দেখিয়ে দেব।'

সেই মুহূর্তে জেনে গেলাম নাবিকরা কোন জাতের মানুষ। আমরা যাদের জানি তাদের থেকে নাবিকরা নিশ্চয়ই আলাদা ধরনের মানুষ। ওরা কঠোর পরিশ্রমী, দিলখোলা ভাল মানুষ। ওরা সবসময়ে হাসি-খুশি, কৌতুকপ্রিয়, দুঃসাহসী। কঠিন পেশার দরুন তাদের কেউ কেউ বদমাশ হয়ে যায় বটে, তবে আমি দেখেছি ওদের বেশিরভাগ পালিশ না করা হীরা। যেসব নাবিকের সাথে আমার পরিচয় হয় ওরা প্রশান্ত মহাসাগরের বিপদ-আপদের সাথে নিত্য লড়াই করে এবং সাহস আর শৌর্যের পরিচয় দেয়। বিপন্ন সাথীকে রক্ষার জন্য যে কোন বিপদের মুখে ঝাঁপ দেয়।

দারুণ আনন্দ পেয়েছি ওদের মধ্যে থেকে। তবে ওদের কোন কোন অভ্যাস যে আয়ত্ত করিনি তাতে আমি খুশি। আমার নতুন বন্ধুরা অতিমাত্রায় মদ গিলত। মদ রয়েছে এমন যে কোন জিনিস, চুলের লোশন থেকে কফ সিরাপ পর্যন্ত বাদ দিত না। তবে পুরোপুরি মদাসক্ত ছিল মাত্র কয়েকজন। জাহাজে মদের বোতল রাখা এবং যেসব ছোট ছোট বন্দরে পরিদর্শন জাহাজ ভিড়ত সেখানে মদ বিক্রি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের বন্দরগুলোতে মাতাল

নাবিকদের রক্তাক্ত সংঘর্ষকে বড় ভয় করত সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ। কোন ভাল ক্যাফে, সিনেমা হল কিংবা হোটেল ছিল না ওই এলাকায়। আমার বিশ্বাস, এখনও নেই।

শিকোতান হচ্ছে কিউরাইলের একটি ছোট্ট জনবিরল দ্বীপ। বছরের বেশিরভাগ সময় খারাপ আবহাওয়াজনিত কারণে উপদ্রুত। এর একমাত্র গুরুত্ব হচ্ছে, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের তিনটি কারখানা। গ্রীষ্মের মাসগুলোতে এগুলো দিনরাত চালু থাকে। এখানকার সমুদ্রে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। কাছাকাছি প্রক্রিয়াজাতকরণের কারখানাগুলো থাকায় খুব সুবিধা হয় সোভিয়েত জেলে নৌকাবহরের।

বেশিরভাগ সময় কুয়াশায় ঢাকা থাকে দ্বীপটি। এর অগভীর বন্দরে যেসব জাহাজ নোঙর করে তার নাবিকরা দ্বীপটাকে বলে 'পৃথিবীর শেষ সীমা'। তবু নারীসঙ্গ পাগল নাবিকদের জন্য শিকোতান একটা স্বর্গ। কারণ কি? কারণ হচ্ছে, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলো চালাবার জন্য প্রতি গ্রীষ্মে মূল ভূখণ্ড থেকে মেয়ে শ্রমিক আনা হয়। শিকোতান দ্বীপে মেয়ে-পুরুষের অনুপাত ৭ঃ১।

ওই দ্বীপের জন্য মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত বিজ্ঞতার পরিচায়ক। অতগুলো মেয়ের উপস্থিতিতে উত্তেজিত নাবিকরা যদি ইচ্ছামত মদ গেলার সুযোগ পেত তাহলে কি ঘটতে পারত তা বুঝতে বেশি কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। কেবল শ্যাম্পেনের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু তা-ও কেবল জাতীয় ছুটির দিনগুলোর জন্য।

মাঝে একবার একটা বড় জাহাজ শিকোতানে আসত। ওটাতে মদের বার ছিল। বেশি বড় হওয়ায় জাহাজটা ছোট্ট পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করতে পারত না। একটু দূরে নোঙর করে বার্জে মালপত্র নামিয়ে দিত। জাহাজটা এলে এক আশ্চর্য মজার দৃশ্য দেখা যেত। দ্বীপের সব লোক ছোট্ট নৌকা, কাঠের ভেলা কিংবা ভেসে থাকে এমন যে কোন জিনিসে চেপে ঘিরে ফেলত জাহাজটিকে। ঠিক পুরানো আমলের জলদস্যুদের মত। বারের মদের শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত নিঃশেষ না করে তারা ফিরত না।

একজন ঘোড়সওয়ার পুলিশই ছিল শিকোতানের একমাত্র কর্তৃপক্ষ। তার ঘোড়াটাই ছিল ওই দ্বীপের একমাত্র ঘোড়া। সে ওটার খুব যত্ন নিত। সে আর তার ঘোড়া ছিল সর্বক্ষণের সাথী। একটার কিছু ঘটলে অন্যটা বোধহয় নিঃসঙ্গতার কারণেই মরে যেত।

বার বার আসা-যাওয়ার ফলে এই কর্তৃপক্ষীয় লোকটার সাথে আমার

পরিচয় ঘটে। একবার সে আসে আমাদের জাহাজে। মিনিট কয়েকের জন্য একা পেয়ে আমাকে বলে, 'স্তাস, তুমি তো জানো এ হতচ্ছাড়া দ্বীপটা কেমন। শুধু কুয়াশা আর পাথর! মদ-টদ নেই! তুমি এখন যাচ্ছ শাখালিন। সেখান থেকে একমাস পরে ফিরবে এখানে। একটা উপকার করো না স্তাস! কয়েক বোতল মদ নিয়ে এসো না আমার জন্য! আনবে?'

সে আমাকে অনুরোধ করছে যেমনতেমন মদ আনতে নয়, খাঁটি মদ আনতে। বেআইনী অনুরোধ। কিন্তু বেচারা এত কাকুতি-মিনতি শুরু করল যে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম।

একমাস পরে ফিরে এসে আমরা নোঙর গাড়লাম মাখনের মত ঘন কুয়াশার মধ্যে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পা বাড়ালাম কাঠের জেটির ওপর। বেড়ালের মত বড় বড় ইঁদুর ছোটাছুটি করছে জেটির ওপর। আমার পা মাড়িয়েও গেল কয়েকটা। চারদিকে কিছু নজরে পড়ছে না। শেষ পর্যন্ত কাঠের ওপর ঘোড়ার পায়ের খট্ খট্ আওয়াজ কানে এল। কিন্তু কুয়াশা ভেদ করে যা বের হলো তা দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। ঘোড়ার পিঠে কিছু একটা আছে ঠিকই, কিন্তু ওটার মাথা নেই। মুণ্ডহীন ভূতের গল্প যত পড়েছিলাম সবই মনে পড়তে লাগল। আতঙ্কে জমে গেলাম। তারপর আওয়াজটা পেলামঃ 'স্তানিস্লাভ?' পুলিশটার গলা।

'হ্যাঁ, আমি।'

'ওরে ঘোড়া, ঘুরে দাঁড়া তো একটু।'

ঘোড়াটা ঘুরল। অবশেষে দেখতে পেলাম ঘোড়ার পিঠটা। পুলিশটা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে জিনের ওপর। মাথা ঝুলছে আমার দিকে। পা দুটো ঝুলছে অন্য পাশে।

'আমরা যে মালের কথা আলোচনা করেছিলাম তা মনে আছে তো?' জিজ্ঞেস করল সে পুলিশী স্বরে, যদিও ঘোড়ার পিঠে ওই অদ্ভুতভাবে থাকার দরুন তা হাস্যকরই শোনা গেল।

'ইয়েস, স্যার।'

'এনেছ?'

'ইয়েস স্যার।'

'দাও এক্ষুণি! আমি বেপরোয়া হয়ে উঠেছি।'

তার দুই হাতে দুটো বোতল তুলে দিতেই সে আর তার ঘোড়া ফিরে চলল।

'থামো, থামো,' বলতে বলতে ছুটলাম ওদের পিছু পিছু। প্রশ্ন করলাম,

'ওরকম অদ্ভুতভাবে শুয়ে আছ কেন ঘোড়ার পিঠে?'

'কারণ আমার গোটা পাছায় ফোস্কা পড়ে গেছে!'

অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা ঘন কুয়াশার মধ্যে। বেচারার পশ্চাদ্দেশে সত্যি ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। সারাক্ষণ ঘোড়ার পিঠে থাকায় সংক্রমণও ঘটেছিল। ফোস্কার কারণ ভিটামিন-এর অভাব। শিকোতানে তাজা ফলমূল আর শাক-সবজির বড় অভাব। আশা করলাম আমার দেয়া মদ খেয়ে ব্যথাটা সে ভুলবে এবং অন্তত এক রাত শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।

আমার নাবিক বন্ধুদের ব্যবহার অমার্জিত বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সারল্য আছে। সেটা বড় প্রীতিকর। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলি, জাহাজের বাবুর্চি থাকে সাধারণত নারী। এসব মহিলা বাবুর্চিদের কেউ কেউ বড় 'দয়ালু' হয় ওদের পুরুষ সাথীদের প্রতি। আমাদের বাবুর্চিটা ছিল প্রায় দু'ডজন পুরুষের মধ্যে একমাত্র নারী। বোধহয় একমাত্র ক্যাপ্টেন ছাড়া আর প্রায় সবার সঙ্গে সে শুত। ওর সাথে কার কোন্ দিন শোবার পালা তা নিয়ে সম্ভাব্য গোলমাল এড়াবার জন্য একটা ক্যালেণ্ডার রাখত। ক্যালেণ্ডারে প্রত্যেক তারিখের নিচে এক একটা নাম লিখে রাখত। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এতগুলো রোমিওর মধ্যে কখনও মারামারি হয়নি।

প্রায়দিন সন্ধ্যায় নাবিকরা একটা বড় রুমে জড়ো হয়ে পুরানো ছবি দেখত। অন্যদিন কার শিশ্ন সবচেয়ে বড় তা নির্ধারণের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। প্রতিবারই বেধে যেত তর্ক। প্রত্যেক বারই মেয়ে বাবুর্চিকে ডেকে আনা হত বিচারক হিসাবে। বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রদত্ত তার রায় সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিত সবাই। খুশি মনে প্রতিযোগীরা চলে যেত যার যার কাজে, যদিও বিজয়ী সব সময় একজন হত না। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হত বিভিন্ন জন।

আমাদের জাহাজটি টহল দিত কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাংশের কাছাকাছি—কুনাশিরি, ইতুরুপ আর শিকোতান এলাকায়। বহুবার গভীর রাতে আমাকে রাষ্ট্রীয় ফিসারি ইনস্পেক্টরের সাথে খোলা সমুদ্রে জাপানী জেলে নৌকায় উঠতে হয়েছে। জাপানী জেলেদেরকে আমার মনে হয়েছে অত্যন্ত সাহসী। অসীম সাহসী না হলে ছোট ছোট নৌকায় চড়ে স্বদেশী বন্দর ছেড়ে দু'শ মাইলের বেশি দূরে গভীর সমুদ্রে কেউ যেতে পারে? নৌকায় ওদের থাকার ব্যবস্থা দেখেছি অত্যন্ত শোচনীয়। এসব ছোট নৌকা চুক্তিভঙ্গ করেছে বলে প্রমাণ পেলে ফিসারি ইনস্পেক্টর প্রায়ই কাগজপত্রে তা উল্লেখ করতেন না। কারণ তাঁর মতে, 'এসব জেলে সত্যি বড় গরিব এবং ধনী হবার জন্য ওরা মাছ ধরতে আসেনি।'

এ ট্রিপে হোক্কাইডোর তীরভূমি দেখার সুযোগ হয় আমার। বহুদূরে নজরে পড়ে সাগর থেকে মাথা উঁচু করে ওঠা পর্বতশ্রেণী পান্না-সবুজ গাছপালায় ছাওয়া। আশা জাগে মনে, একদিন জাপান সফরের সুযোগ আমার হবে। কত কাছে, তবু কত দূরে। জাপান যেন এক পরিচিত স্বপ্নের মত আমার কাছে।

মস্কো ফেরার পর সকোলনিকি পার্কে অনুষ্ঠিত প্রথম জাপানী বাণিজ্যিক প্রদর্শনীতে ছয় সপ্তাহ কাজ করি দোষাভী হিসাবে। পার্টটাইমের কাজ হলেও সোভিয়েত চেম্বার অব কমার্সের পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট প্রার্থীদেরকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বেছে নেয়। আমি দরখাস্ত নিয়ে পার্সোনেল অফিসারের কাছে গেলে তিনি ওটা পড়েন এবং পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখান যে তিনি কেজিবির মেজর। তাঁর নামটাও মনে আছে–খোলোপভ। তিনি বলেন যে, আমার পার্টটাইম কাজটি দায়িত্বপূর্ণ। যেহেতু প্রদর্শনীতে কর্মরত কয়েকজন জাপানী ইঞ্জিনিয়ার আর ব্যবসায়ী আসলে গুপ্তচর। তিনি দাবি করলেন বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়লেই যেন তাঁকে জানাই।

আমাকে নেয়া হলো এক জাপানী স্টীল ক্যাবল কোম্পানির হয়ে দোভাষীর কাজ করার জন্য। বেশ কয়েকজন জাপানী ইঞ্জিনিয়ার আর ব্যবসায়ীর সাথে পরিচয় হলো। নিশ্চিত ছিলাম যে ওদের কেউই গুপ্তচর নয়। আমার মনে হয় মেজর খোলোপভ দোভাষীদের মাধ্যমে জাপানী কর্মীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন পরবর্তীকালে ওদেরকে টার্গেট করার মতলবে। আমি প্রায়ই আমার জাপানী ওপরওয়ালাদের সাথে আলোচনা করতাম টোকিও, ওসাকা এবং অন্যান্য জাপানী শহরের বিষয়ে। তাঁরা খুশির সঙ্গে জবাব দিতেন আমার সকল প্রশ্নের। ততদিনে জাপানী ভাষাও বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছি। সহজে আলাপ চালিয়ে যেতে পারি জাপানীদের সাথে।

প্রদর্শনীটা বিস্মিত করে আমাকে। মুগ্ধ হই জাপানী ইঞ্জিনিয়ার আর শ্রমিকদের কৃতিত্ব দেখে। ওদের তৈরি অনেক জিনিসই সোভিয়েতের অনুরূপ জিনিসের চাইতে উন্নত। অনেকদিন রাতের বেলায় প্রদর্শনীর জিনিস চুরি হয়ে যেত। বিশেষ করে সিগারেট লাইটার এবং অন্যান্য ভোগ্য পণ্য। কেজিবি'র লোকেরা বলতে লাগল জাপানী গুপ্তচররা উস্কানি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এসব চুরির ঘটনা সাজাচ্ছে। কিন্তু আমি জানতাম, ওসব চুরি প্রদর্শনীতে কর্মরত কিছু শ্রমিকের কাজ এবং সম্ভবত খোদ কেজিবি অফিসারদেরই কাজ।

১৯৬৪ সালে ২৩ বছর বয়সে আমি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করি। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিনা ব্যয়ে শিক্ষার বিনিময়ে সরকার লোকের ভবিষ্যৎ কর্মস্থল নির্ধারণ করে দেয়। আমাকে

বলা হয় যে আমি নিখিল ইউনিয়ন সমুদ্র বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং সামুদ্রিক ফিসারিতে জুনিয়র গবেষক হিসাবে কাজ করব। খুবই হতাশ হলাম। আমার ভবিষ্যৎ কেমন হবে কিংবা কোনদিন জাপান যেতে পারব কি না বুঝলাম না। ফিসারিতেই যদি বাকি জীবন কাটাতে হয় তাহলে জাপান বিষয়ক বিশেষজ্ঞরূপে আমাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে কেন?

ডিগ্রী লাভের সাথে সাথে শেষ হলো ছাত্রজীবন। মস্কোর রাস্তার নিঃসঙ্গ খুদে ছেলেটি এখন পরিণত বয়স্ক। জীবনের সব ক্ষুদ্র খণ্ড অংশ মিলে আমাকে একটা অবয়ব, একটা আকার ও রূপ দিয়েছে। সকল প্রভাব কাজ করেছে। সব স্মৃতি, দুঃখ, বিষাদ, শিক্ষা মিলিত হয়েছে। সবকিছু মিলে স্থির করে দিয়েছে আমি কি হব। একজন জাপান বিশেষজ্ঞ। কেজিবি অফিসার। গুপ্তচর। একজন আমেরিকান।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি কালে পেশাগত জীবনের মত আমার ব্যক্তিগত জীবনেও বহু পরিবর্তন ঘটে যায়। ১৯৬৪ সালের শুরুর দিকে আমি সবে ইনস্টিটিউট অব ওশানোগ্রাফি অ্যাণ্ড ফিশ্যারিজ-এ জমিয়ে বসছি এমন সময় ইয়েলেনার (প্রথমা স্ত্রী) সাথে আমার বিচ্ছেদ ঘটে। ইয়েলেনাদের বাড়িতে আমাদের মিলিত জীবন ছিল সংঘাতমুক্ত, এমনকি শান্তিময়। আমরা কখনও ঝগড়া করতাম না। আমাদের মধ্যে মতান্তরও ঘটত কদাচিৎ। আমাদের পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসাটা অনেকটা এক পরিবারে বসবাসরত ভাই-বোনের মত। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মত নয়। পরস্পরের প্রতি আমাদের প্রেম গভীরতা অর্জন করেনি কখনও। বয়সের দিক থেকে আমরা কাঁচা ছিলাম না। দু'জনেই বুঝতে পারছিলাম যে সত্যিকারের সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য অপরিহার্য এমন একটা কিছু আমাদের সম্পর্কের মধ্যে নেই।

ডিভোর্স নিয়ে তাড়াহুড়োর দরকার ছিল না। তাই তাড়াহুড়ো আমরা করিনি। স্বল্পকালের জন্য জীবনের স্রোত বয়ে যেতে থাকে ধীরগতিতে, একঘেয়েভাবে। তারপর একদিন এক বন্ধু বলল, 'এই স্তাস, শনিবার আমার পার্টিতে আয় না, একজনের সাথে তোর পরিচয় করিয়ে দেব।' যাব না বলে প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম। শেষ মুহূর্তে গিয়ে হাজির হলাম সেই কাফেটায়, যেখানে জড়ো হচ্ছিল নিকোলাইর বন্ধুরা।

আমাকে দেখে খুশি হলো নিকোলাই। হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, 'এদিকে আয়।' পাঁচ-ছয় জন মিলে ওখানে ওরা কি নিয়ে যেন আলোচনা করছে উচ্ছ্বসিত হয়ে। আমি যেতেই কৃষ্ণকেশী একটি মেয়ের কাঁধ ছুঁয়ে সে বলল, 'নাতালিয়া, স্তানিস্লাভের সাথে আলাপ করো।'

মেয়েটি ফিরল আমার দিকে। জীবনে এমন সুন্দরী মেয়ে আর দেখিনি। দীর্ঘাঙ্গী, লাবণ্যময়ী, মাথায় চকচকে কালো চুলের রাশি। বাদামী কোমল চোখ। আর মুখ? দেখেই মনে হলো চুমু খেতে হলে এমন মুখই চাই। ওই রাতটি শেষ হবার আগেই বুঝলাম যে পাগলের মত প্রেমে পড়ে গেছি মেয়েটার। ওকে কি বলেছি জানিনে। তবে পরে সেসব নিয়ে সে আমাকে খোঁচাত। বলত, 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি তোতলা। আশ্চর্য হচ্ছিলাম ভেবে যে তোমার মত একটা সুশ্রী চেহারার লোক তোতলা হয় কেমন করে।'

'কেন, কেন, কেমন করে কথা বলছিলাম আমি?'

'জানিনে, ডার্লিং। তবে শুধু ব···ব···ব···ব···করছিলে,' বলে সে হাসত মিটিমিটি।

নাতালিয়া ছিল স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্রী। তার বাবা ছিলেন বিজ্ঞান একাডেমিতে বন বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। ওর একটি ছোট্ট বোন ছিল। মা ছিলেন একজন প্রকৃত বুদ্ধিজীবী। ওর মা-বাবা দু'জনই ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির একান্ত বিশ্বস্ত সদস্য।

নাতালিয়া থাকত মা-বাবার সাথে, ছোট্ট দুই বেডরুমের একটি অ্যাপার্টমেন্টে। অ্যাপার্টমেন্টটির মালিকও ছিলেন ওর মা-বাবা। তাঁরা যে উঁচু দরের লোক এটাও তার প্রমাণ।

সে রাতে আমিই নাতালিয়াকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিই এবং স্থির করি যে পরদিন ওর সাথে দেখা করব। ভোর পর্যন্ত চোখ দুটো একবারও বুজতে পারিনি। অফিস-আদালত খুলতেই শুরু করি বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তুতি। বিকেলে ওর সাথে দেখা হওয়া মাত্রই বলি, 'আমি তোমাকে ভালবাসি! তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?' সে যখন বলল, 'আমিও ভালবাসি তোমাকে! বিয়েতে রাজি!' তখন মনে হলো হৃৎপিণ্ড আমার বুঝি লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে বুকের খাঁচা থেকে।

সপ্তাটা শেষ হবার আগেই দু'জনের জানা হয়ে গেল যে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঝামেলাটা চুকে মিটবে সেজন্য অপেক্ষা করে থাকাটা অসম্ভব আমাদের পক্ষে। ডার্লিং নাতাশা ব্যবস্থা করল কিভাবে আমরা একত্রে রাত কাটাব।

সে ওর ছোটবোনকে খুলে বলল সমস্যাটা। ছোটবোন আমাদেরকে সুযোগ করে দিল। ফলে প্রায় মাস খানেকের ওপর প্রতি রাতেই আমি নাতালিয়ার ঘরে রাত কাটাবার সুযোগ পাই।

ওর বাবা জানতে পারলে আমাকে যে খুন করে ফেলতেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা তখন যে ঝুঁকি নিয়েছিলাম সে কথা ভাবলে এখনও কেঁপে

উঠি। তবে এটা ঠিক যে ওরকম ঝুঁকি নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমাদের। আমরা বিবাহ বিচ্ছেদের ঝামেলাটা মিটে যাবার পর ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে নাতালিয়ার সাথে আমার বিয়ে হয়ে যায়। ওর মা-বাবার অ্যাপার্টমেন্টে যে ঘরে আমরা প্রথম একত্রে রাত কাটাই সেখানেই সংসার পাতি দু'জনে।

বছর খানেক পরে একটি ছেলে হয় আমাদের। ভবিষ্যৎটা মনে হয় সকল সুখ আর আনন্দে ভরা। সুন্দরী বৌ পেয়ে গর্বের আমার সীমা ছিল না। কোন গোলমাল হওয়া ছিল অচিন্তনীয়। আমাদের ছেলে, নাদুশ-নুদুশ স্বর্ণপ্রভ আলেকজাণ্ডার ছিল দু'জনের নয়নমণি। নাতালিয়া গুনগুন করে ওকে বলত, 'কোথা থেকে এলি, সোনামানিক? তোর বাবার চুল তামাটে রঙের, মায়ের চুল কালো। তুই কোথায় পেলি সোনালী চুল?' সাত বছর বয়স পর্যন্ত আমার চুলও যে সোনালী ছিল তা বোধ হয় বলিনি ওকে।

বিয়ের পর সাত বছর আমরা নাতালিয়াদের পারিবারিক বাড়িতেই ছিলাম। ওর মা-বাবা সব সময় থাকতেন না সেখানে। ওর বোনটার বিয়ে হয়ে যাবার পর তাঁরা প্রায়ই ওকে দেখতে যেতেন। তাছাড়া, চাকরি সূত্রে নাতালিয়ার বাবাকে ঘুরে বেড়াতে হত নানা জায়গায়। ওর মা-ও যেতে পারতেন তাঁর সঙ্গে। ১৯৭১ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যু ঘটে নাতালিয়ার বাবার। মা চলে যান ওর ছোট বোনটির কাছে। অ্যাপার্টমেন্টটি ছেড়েই দেয়া হয় আমাদের হাতে।

প্রায় বছর দুই কাজ করলাম 'ইন্সটিটিউট অব ওশানোগ্র্যাফি অ্যাণ্ড ফিসারিজ'-এ। গবেষণা করলাম সোভিয়েত উপকূলীয় সমুদ্রে জাপানীদের মাছ ধরা সম্পর্কে। ফিসারিজ সংক্রান্ত জাপানী এবং ইংরেজী রচনা ও প্রবন্ধাদি অনুবাদ করলাম। এ ছিল কাজের এক নিরাপদ স্বর্গ। 'কাজ করো, ভেবো না, বাড়ি যাও, ফিরে এসো কাজে।' তারপরে, ১৯৬৬ সালের এক মন্থর দিনে আমার ওপরওয়ালা এলেন একটি বার্তা নিয়ে যা থেকে শুরু হলো আমাকে কেজিবি-তে টানার প্রক্রিয়া।

উদ্বিগ্ন মুখে তিনি বললেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটি (কমিউনিস্ট পার্টির) থেকে এই মাত্র তোমার ডাক পড়ল। এখনি যাও, রোমানভ নামের একজনের সাথে কথা বলতে বলেছে।'

'জানতাম তিনি কেন উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন আমিও। ইনস্টিটিউটে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে 'কল' আসে নেহায়েত কালেভদ্রে। আসলে কেউ না কেউ বিপদে পড়ে।

'আমাকে ডেকেছে? আমাকে ওদের কি দরকার?'

'জানিনে। যাও, ফোন করে কথা বলে এসো, এখনি।'

আমি ছুটে যাইনি টেলিফোনের কাছে, তবে দেরিও করিনি। মি. রোমানভ বললেন যত শীঘ্র সম্ভব আমার সাথে দেখা করতে চান তিনি। 'আমরা তোমাকে আন্তর্জাতিক বিভাগে একটা কাজ দিতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমার নাম সুপারিশ করা হয়েছে। কাজেই তোমার এখনি আমার সাথে দেখা করা জরুরী।

সুপারিশ করা হয়েছে? কিসের জন্য? আন্তর্জাতিক বিভাগ সম্পর্কে আমি তো প্রায় কিছুই জানি না। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় তখনকার দিনে বিভাগটির উল্লেখই থাকত না। পরদিন সকালে গিয়ে একখানা পাস সংগ্রহ করলাম। কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগে প্রবেশের পাস। আন্তর্জাতিক বিভাগের দফতরগুলো যে বিল্ডিং-এ সেটা খুঁজে নিয়ে সশস্ত্র সেন্ট্রিকে পাসটা দেখালাম। লিফ্‌টে চড়ে পাঁচতলায় উঠতে উঠতে ছমছম করে উঠল গা। দালানটি এত নীরব!

অনেক খোঁজাখুঁজির পর রোমানভের দফতরটি পাওয়া গেল। যথেষ্ট সাদরে তিনি আমাকে সম্ভাষণ জানালেন। আমার আসন গ্রহণের পর কিছুক্ষণ নীরব রইলেন তিনি। উদ্দেশ্য, স্পষ্টত, আমাকে একটু বেকায়দায় রাখা।

অবশেষে শুরু করলেন, 'লেভচেঙ্কো, তোমার মত শিক্ষা আর জ্ঞান নিয়ে কারও পক্ষে "ওশানোগ্রাফি অ্যাণ্ড ফিশারিজ ইনস্টিটিউটের" মত একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে পচে মরা উচিত নয়।'

আমি কিছু বললাম না। গত দু'বছরে আমাকে বারকয়েক আন্তর্জাতিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে দোভাষী হিসেবে কাজ করার জন্য। কিন্তু তখন ওপরতলার গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলোর কেউ কোনদিন আমার সাথে কথাও বলেনি। রোমানভের কথাগুলোর অর্থ কি বুঝলাম না। তাই চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে অপেক্ষা করে রইলাম।

'তোমাকে আরও ভাল চাকরির প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।'

আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'আমরা চাই তুমি আকাহাতার (জাপানী কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র) মস্কোস্থ সংবাদদাতার সেক্রেটারি/দোভাষী হও।'

আমি জবাব দিলাম না।

'বাহ্যত তোমার কাজ হবে আকাহাতা প্রতিনিধির সহকারী হওয়া, অনুবাদে ও অন্যান্য টুকটাক কর্মে তাঁকে সাহায্য করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার কাজ অতটা সহজ-সরল হবে না।'

চমকে উঠলাম তাঁর শেষ কথাগুলো শুনে।

আমার চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাবটি লক্ষ্য করে একটুখানি হেসে রোমানভ

বললেন, 'আকাহাতার লোকটি কখন কোন্ বিদেশী বা সোভিয়েত নাগরিকের সাথে যোগাযোগ করে তার প্রতিটি বিবরণ তোমাকে আন্তর্জাতিক বিভাগের জাপান বিষয়ক শাখায় অবশ্যই পেশ করতে হবে। একই রিপোর্ট ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও দেবে।'

এতক্ষণে আমার বিস্ময় আতঙ্কে রূপান্তরিত হলো। প্রত্যেক শিক্ষিত সোভিয়েত নাগরিকের মত আমিও জানতাম যে, আন্তর্জাতিক বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব হলো অকমিউনিস্ট বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা। কিন্তু এ লোকটি আমাকে বলছেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটি এসব পার্টির ওপর গোয়েন্দাগিরি চালায়। বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম। বন্ধুদের এতটা অবিশ্বাস করা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন মনে হলো আমার। জগৎ সম্পর্কে আমার আনাড়িসুলভ ও আদর্শবাদী মনোভাব পরবর্তীকালে ভেঙে পড়ে বাস্তবের সুকঠোর আঘাতে। কালক্রমে আমি ধরা পড়ে যাই লুকানো ফাঁদে। অংশগ্রহণ করি আন্তর্জাতিক বিভাগের আরেকটি প্রাথমিক দায়িত্ব—বিদেশে প্রভাব বিস্তারমূলক তৎপরতার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনার কাজে।

সাক্ষাৎকারটি শেষ হবার আগে আরও অনেক কিছু আমি জানতে পারি। রোমানভ বললেন, এসব তৎপরতার কায়দা-কৌশল সম্পর্কে অনেক কিছু আমি পরে জানতে পারব। বললেন যে, বিদেশী কমিউনিস্ট পত্রিকার প্রতিনিধিদের অনেকেরই বেতন জোগায় সোভিয়েত সরকার, ওদের দেশ বা পত্র-পত্রিকা নয়। এসব বেতনের অর্থ আসে সোভিয়েত রেডক্রস থেকে। গোটা অপারেশনটার 'কভার' হলো সোভিয়েত রেডক্রস।

'রেডক্রসকে আমরা ব্যবহার করি,' বললেন রোমানভ, 'কারণ কেউ যাতে জানতে না পারে যে তোমরা আন্তর্জাতিক বিভাগের হয়ে কাজ করছ। সংশ্লিষ্ট আর সবার মত তুমিও রেডক্রসের অধীনে কাজ করবে।'

পরবর্তী বছরগুলোতে আমি জানতে পারি কি অসৎ ও কপটতাপূর্ণ ছিল এই 'কভারটি'। রাশিয়ান রেডক্রস এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রেডক্রিসেন্ট সমিতির মিলিত সংস্থাটি ছিল আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সদস্য। এটা নিয়মিত তার দেয় চাঁদা পরিশোধ করত এবং রেডক্রসের সাতটি মূলনীতির প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করত। রেডক্রসের মূলনীতিগুলো হচ্ছে ঃ (১) মানবতার সেবা, (২) স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা, (৩) সর্বজনীনভাবে সেবা প্রদান, (৪) রেডক্রসের সদস্য অন্যান্য জাতির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেবা প্রদান, (৫) নিরপেক্ষ এবং (৬) বৈষম্যবর্জিতভাবে সেবা প্রদান। সপ্তম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিতে বলা হয়েছে যে, মানবতার প্রতি এসব সেবা প্রদান করতে হবে সরকারসমূহ,

সরকারী তৎপরতা এবং সরকারী ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মুক্ত থেকে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপন্ন মানুষের সাহায্যের জন্য সাধারণ নাগরিকদের প্রদত্ত অর্থ ব্যয় করত বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের ভরণপোষণে। শুধু তাই নয়, ওদের ওপর গোয়েন্দাগিরির কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বেতন দেয়ার জন্যেও সোভিয়েত ইউনিয়ন হাত বাড়াত রেডক্রসের তহবিলের দিকে। মি. রোমানভ আমাকে বললেন, তাঁর প্রস্তাবটি ভেবে দেখতে। ভেবে আমি দেখলাম। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারকালে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হলো।

আমি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন।

'তোমার ভাল চাকরি পাবার একমাত্র পথ যে পার্টি সংগঠনগুলোতে কাজ করা এটা বোঝো? এ সুযোগ গ্রহণ না করলে সম্ভবত বাকি জীবন "ওশানোগ্র্যাফি অ্যাণ্ড ফিশারিজ ইনস্টিটিউটে" কলম পিষে কাটাবে।'

আশ্বস্ত করার জন্য বললাম যে, তাঁর মনে দুঃখ দেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটা পোস্ট-গ্রাজুয়েট পদের জন্য দরখাস্ত করব বলে ভেবেছি। সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর এ শাখাটি সযত্নে বাছাই করা সীমিতসংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করত। ওরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে ডিগ্রী লাভ করতে পারত এবং ওদের প্রাথমিক কাজ ছিল 'দূর-প্রাচ্যের রাজনীতি, অর্থনীতি আর সমাজ সম্পর্কে অগ্রসর গবেষণা চালানো।'

'গবেষণাকর্মে জীবন ও সকল সাধনা নিয়োজিত করাই আমার দৃঢ়সংকল্প,' বললাম তাঁকে।

'আন্তর্জাতিক বিভাগের জাপান বিষয়ক শাখায় সফলভাবে কিছুদিন কাজ করার পর ওখানে স্থান লাভের সুযোগ তোমার বেড়ে যাবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, তুমি তোমার মন বদলাবে,' বললেন তিনি গম্ভীরভাবে। 'না বদলালে তোমার ভবিষ্যৎ বরবাদ হয়ে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বিভাগের ক্ষমতা আছে, জানো তো? আমাদের থেকে বিরূপ মন্তব্য গেলে যা করতে চাও তা করার সুযোগ জীবনে আর পাবে না।'

পরিষ্কার বুঝলাম যে রোমানভের রাগ পড়েনি। তাঁর হুমকির মধ্যে কোন রাখ-ঢাক নেই। আমি হার মানলাম, অন্তত আংশিকভাবে। তিন মাসের কিছু বেশি সময় ধরে প্রতিদিন জাপানী ডেস্ক-এর দফতরে হাজিরা দিলাম। আকাহাতা ও অন্যান্য জাপানী পত্রিকা থেকে অনুবাদ করে বিভিন্ন ফাইলে রাখার কাজই করলাম মূলত। রোমানভের হুমকি সত্ত্বেও আকাহাতা প্রতিনিধির সাহায্যকারী পদটা নিতে রাজি হইনি তখনও। এ সময়টার বেশিরভাগ জাপানী ডেস্ক-এর প্রধান ইভান কোভালেঙ্কো ছিলেন দেশের বাইরে। ফিরে এসেই

আমাকে ডাকলেন দেখা করার জন্য।

'আকাহাতা প্রতিনিধির সাথে কাজ করার ব্যাপারে মত পরিবর্তন করেছ?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

ঝুঁকি নিচ্ছি জেনেও না বলে দিলাম।

বিশ্রী দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, বোকামি করতে চাইলে করোগে, জানাজাটা তোমার। প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিটিউটে যাও।'

এই সাক্ষাৎকারের অনতিকাল পরে নোটিস পেলাম যে প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিটিউটের ভর্তি পরীক্ষায় পাস করেছি। আমাকে বলা হলো যে, বছর চল্লিশেক বয়সী বিজ্ঞানের ডক্টর ইগোর ল্যাটিশেভ হবেন আমার উপদেষ্টা। জাপান বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তাঁকে একজন উদীয়মান তারকা মনে করা হত। ১৯৫০-এর দিকে মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে প্রাভদা-র প্রতিনিধিরূপে বছর কয়েক কাটিয়ে এসেছেন টোকিওতে। ওই সময় থেকে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে এসেছেন আন্তর্জাতিক বিভাগের জন্য।

প্রথম সাক্ষাতে ড. ল্যাটিশেভ বললেন যে, জাপান বিষয়ক সোভিয়েত এক্সপার্ট হিসাবে কর্মজীবনের উন্নতি চাইলে আমার অধ্যয়নের বিষয় হতে হবে একই সঙ্গে সমসাময়িক ও রাজনৈতিক। অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপানের শান্তি আন্দোলনের ইতিহাসকে বেছে নিলাম আমার বিষয় হিসাবে। ড. ল্যাটিশেভ প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়ে বললেন, 'ওই বিষয়ে ভাল রকম অধ্যয়ন করতে চাইলে তোমার থিসিসটা লিখবে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য। বাইরে প্রকাশ করা চলবে না।'

শুধু অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্যে কেন?

ভাবলাম বিস্মিত হয়ে। তিনি কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে মুচকি হেসে সংক্ষেপে বললেন, 'কেন তা পরে দেখবে।'

দেখলাম ঠিকই। ওই বিষয়ের ওপর গবেষণার ফলাফল একটি অভ্যন্তরীণ বা ঘরোয়া দলিল হিসাবে থেকে যাবার একাধিক কারণ ছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালে জাপানী শান্তি আন্দোলন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে; একটির নাম গেনসুইকিন। এটা জাপানী সোস্যালিস্ট পার্টি (জেএসপি) সমর্থিত। আরেকটি ছিল জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি (জেসিপি) পরিচালিত গেবসুইকিও। ওই সময় জেসিপি মস্কো থেকে ভিন্ন একটি স্বাধীন নীতি গ্রহণ করে। তাছাড়া, প্রবীণ জাপানী কমিউনিস্ট ইওসিও শিগার নেতৃত্বে ভয়েস অব জাপান নামে জেসিপি'র একটি বিচ্ছিন্ন গ্রুপ আত্মপ্রকাশ করে।

জাপানী শান্তি আন্দোলনের এই ত্রিমুখী ধারার রহস্য উদ্‌ঘাটনে বেশি সময় আমার লাগেনি। কিন্তু থিসিস লিখতে গিয়ে আমি এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিভাগের অবস্থানটা কি তা আবিষ্কার করতে পারলাম না। যা বুঝেছি তাতে অবস্থানটা মনে হয়েছে গোলমেলে। আন্তর্জাতিক বিভাগ সমর্থন করতে চেয়েছে গেবসুইকিনকে (জেএসপি), যেহেতু ওটা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি অপেক্ষাকৃতভাবে সহানুভূতিশীল। অপরদিকে গেবসুইকিও কম্যুনিজমের প্রতি নামমাত্র আনুগত্য সত্ত্বেও সোভিয়েত থেকে স্বতন্ত্র নীতি ঘোষণা করেছিল এবং প্রায়ই সোভিয়েত নীতির সমালোচনা করত। আবার দুটো সংগঠনই জাপানে আমেরিকান উপস্থিতির সমালোচনা করত উচ্চকণ্ঠে।

জাপানী কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন লাইন বেছে নিলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা আন্তর্জাতিক বিভাগ কারও পক্ষেই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও অত্যন্ত সক্রিয় কমিউনিস্ট পার্টিটাকে হারানোর ঝুঁকি নেয়া সম্ভব ছিল না। জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছার জন্য অবিরাম ব্যর্থ চেষ্টা চালানো ছাড়া আন্তর্জাতিক বিভাগের গত্যন্তর ছিল না।

আমার উপদেষ্টা ড. ল্যাটিশেভ হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে আমার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট থিসিসের কাজটা সহজ হবে না। 'পরিস্থিতি মোকাবিলার পন্থা যদি দেখাতে পারো আন্তর্জাতিক বিভাগকে তবেই কেবল সফল হতে পারে তোমার থিসিস। জাপানী শান্তি আন্দোলনের ব্যাপারে নীতি নির্ধারণের জটিলতা সম্পর্কে তারা জানে। যে সমাধান নিজেরা খুঁজে পায়নি তা তুমি খুঁজে পাবে এমন প্রত্যাশা তাদের নেই বলেই আমি আশা করি।'

আমরা দু'জনেই জানতাম যে, কথাটা ঠিক।

'এটাও ভুলে যেয়ো না যে একমাত্র আন্তর্জাতিক বিভাগের জাপানী সেক্টরের প্রধান কোভালেঙ্কো ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করলেই তোমার থিসিস অভ্যন্তরীণ দলিল হিসাবে অনুমোদিত হবে।'

আমি সত্যি একটা বিরাট কাজে হাত দিয়ে বসেছি। জাপানী শান্তি আন্দোলনের বাস্তবতা সম্পর্কে, আরও ভালভাবে অবহিত হবার জন্য আমি সোভিয়েত শান্তি কমিটির পার্টটাইম উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করতে থাকি।

শান্তি কমিটি আর আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির অফিস ছিল ক্রপোটকিনস্কায়া স্ট্রীটের ২শ' বছর পুরানো এক সুন্দর বাড়িতে। এক রুশ অভিজাত ছিলেন এক সময় বাড়িটির মালিক। সোভিয়েত নেতারা বাড়িটিকে ব্যবহার করতেন প্রতারণার এক কেন্দ্র হিসাবে। প্রতারিত হতেন মুক্ত বিশ্বের অত্যন্ত আন্তরিক ও নিবেদিত শান্তিকর্মীরা। এ রকম এবং অনুরূপ অন্যান্য

গ্রুপের মধ্য থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এজেন্ট খুঁজে নিত। এসব এজেন্ট যে মতাদর্শগতভাবে সোস্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট হতেন তা নয়। কিন্তু বিশ্বশান্তি ও বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্র থেকে মুক্ত করার আগ্রহাতিশয্যের দরুন তাঁরা নিজেদের অজান্তে প্রায়ই সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রীড়নকে পরিণত হতেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যা চাইত তাই সমর্থন করে বসতেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন চাইত পশ্চিমকে বিভক্ত ও দুর্বল করে ফেলতে। তবে শান্তি কিংবা পারমাণবিক অস্ত্র বিলুপ্তির মাধ্যমে নয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের বছরগুলোতে আমি সোভিয়েত শান্তি কমিটির হয়ে কাজ করি। ওই যুদ্ধের বিরোধী প্রচারণার সাথেই মূলত সংশ্লিষ্ট ছিল আমার কাজ। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার একটা বিবরণ দেয়া গেল ঃ প্রচারণা কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অন্যান্য দেশের সোভিয়েত ফ্রন্টগুলোর জন্য আদেশ তৈরিতে প্রার্থীকে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে। ভিয়েতনামে আমেরিকান উপস্থিতি যে বিশ্বব্যাপী নিন্দিত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে যাওয়া ছাড়া শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে উপায়ান্তর নেই সেই বিষয়ে আমেরিকার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য প্রার্থীকে সকল প্রয়াস চালাতে হবে।

সারা দিনের কাজের শেষে প্রায়ই গিয়ে মিলতাম কয়েকজনের সাথে বাড়িটার পাতালকক্ষে। সেখানে সোভিয়েত শান্তি কমিটির জনৈক ফটোগ্রাফারের একটি ডার্করুম ছিল। লোকটা ছিল খুব যোগাড়ে। একটা তারে বাসি রুটি আটকে সে কবুতরদের প্রলুব্ধ করে নিচে নামিয়ে আনত, তারপর খপ করে ধরে ঘাড় মটকে দিত। এমনি কয়েকটি ধরা পড়লে পালক ফেলে দিয়ে কাবাব বানাত। তারপর শুরু হত ভদ্‌কা সহযোগে আমাদের প্রায় বিনি পয়সার ভোজ।

আমাদের সেই পার্টিগুলো ছিল নির্ভেজাল আনন্দের। হাসি, গান, খাবার আর হই-হুল্লোড়ে ভরা।

১৯৬৬ সালের এই সময়টাতে জাপানী শান্তি আন্দোলনে সক্রিয় কয়েকজন লোকের সাথে আমার পরিচয় হয়ে যায় ভাগ্যক্রমে। এদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর ইচিরো মোরিতাকি। হিরোসিমার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাওয়া লোকদের সংগঠনের সভাপতি। তাঁর কাছ থেকে প্রথম জানতে পারি বিশ্বশান্তির জন্য কর্মরত জাপানী নাগরিকদের আন্তরিকতার কথা। জানতে পারি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পরে জাপানে এক উল্লেখযোগ্য ও নাটকীয় মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব ঘটে গেছে। গোটা জাপানী জাতি প্রভাবিত হয়েছে সেই বিপ্লব দ্বারা। ফলে

জাপানী জনগণ সমগ্রভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শে আত্মনিবেদিত এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্বের সন্ধানে রত।

সোভিয়েত সফরে আগত জাপানী প্রতিনিধি দলগুলোর সাথে ঘুরে বেড়ানো সোভিয়েত শান্তি কমিটির সাথে আমার কাজের অংশ ছিল। স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সাহায্যে কমিটি এ সফরগুলোর ব্যবস্থা এমনভাবে করত যাতে অতিথিরা কেবল আকর্ষণীয় দৃশ্যগুলোই দেখতে পান। সেরা ও সাজানো গ্রাম, সেরা যৌথ ও রাষ্ট্রীয় কৃষিখামার ইত্যাদি দেখানো হত সফরকারী প্রতিনিধি দলগুলোকে।

থিসিসের দুই-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিলাম বিরক্তিভরে। ড. ল্যাটিশেভ ঠিকই বলেছিলেন। কাজটা বড় কঠিন। আন্তর্জাতিক বিভাগের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য যথেষ্ট মিথ্যা বলা এবং একই সাথে ওটাকে প্রয়োজনীয় করে তোলার জন্য প্রচুর সত্যের সমাবেশ ঘটানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। সোভিয়েত ব্যবস্থার মতবাদগত গোঁড়ামির মধ্যে জাপানের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন অর্থবহ সুপারিশ তৈরি করার উপায়ই ছিল না। এর মানে দাঁড়াল এই যে বাঞ্ছিত ডিগ্রীটি আমি পাব না। কিন্তু সরকার আমাকে নিয়ে কি করবে সেই পরিকল্পনা আগেই করে ফেলেছে।

আবারও, দৈবক্রমে আমি পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেলাম। যে দেশটি সম্পর্কে এত বছর পড়াশুনা করেছি তাকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগটি পেয়ে গেলাম অবশেষে! সুযোগটা সহজে আসেনি। কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেজিবির কাছে আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস সংক্রান্ত অসংখ্য কাগজপত্র দাখিল করতে হয়েছে পর্যালোচনার জন্য। বহির্গমন ভিসা ডিপার্টমেন্টে ডাক পাবার অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়েছে ছ'মাসের বেশি। ভিসা ডিপার্টমেন্টে ডেকে নিয়ে ২ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আমাকে। যে লোকটি জেরা করলেন তাঁর সামনে মেহগনী কাঠের এক বিশাল টেবিল। টেবিলের ওপর প্রকাণ্ড এক ফাইল। ফাইলের ওপর 'স্তানিস্লাভ আলেক্সান্দ্রোভিচ লেভচেঙ্কো সংক্রান্ত তথ্যাবলী' লেখাটা দেখে চমকে উঠি আমি। ওটার মধ্যে আমার আনুগত্য ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কেজিবি'র তৈরি অন্তত আড়াই শ' পৃষ্ঠার রিপোর্ট রয়েছে। স্পষ্টত, ওদের এজেন্ট আর টিকটিকিরা কাজে গাফিলতি করেনি।

সাক্ষাৎকার শেষে অফিসারটি বিদেশে একজন সোভিয়েত নাগরিকের আচার-ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লেন। তিনি আমাকে সাবধান করে দিলেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের ফন্দিফিকির সম্পর্কে। বললেন যে, সোভিয়েত নাগরিকদের ওরা দুনিয়াময় পিছু নিচ্ছে, দলে

টানার কিংবা বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে। আমাকে বার কিংবা পানশালা থেকে দূরে থাকতে হবে। একা একা টোকিওর রাস্তায় হাঁটাহাঁটি চলবে না। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি হুঁশিয়ারি দিলেন যে জাপানী গোয়েন্দা বিভাগ আমার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করবে এবং আমাকে দলে টানার সুযোগ পেলে ছাড়বে না।

আন্তর্জাতিক বিভাগেও যেতে হলো। সেখানে আমার পুরানো 'বন্ধু' জাপানী ডেস্কের প্রধান কোভালেঙ্কোর সাথে একই রকম দীর্ঘ আলাপ হলো। বছর কয়েক আগে এই লোকটিই আমাকে বলেছিলেন, 'এটা তোমার জানাজা। যাও প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিটিউটে।'

খুব দিলখোলা ভাব দেখিয়ে তিনি শুরু করলেন, 'শোনো স্তানিস্লাভ, তোমার মিশনটা হচ্ছে ডেলিগেশনের দোভাষী হিসাবে কাজ করা। জাপানী শান্তি আন্দোলনের সদস্যদের সাথেও দেখা করবে। প্রথমত—গেনসুইকিনের লোকদের সাথে। ওদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আর রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মগুলোর ব্যাপারে ওদের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্যাদি বের করে নেবে।'

এসব নির্দেশ আমার প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু এর পরে তিনি যা বললেন, তা শোনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মস্কো কাউন্সিলের সভাপতি সম্পর্কে খোলাখুলি বিরূপ মন্তব্য করলেন। বুঝলাম যে এ রকম খোলামেলা আলাপের মাধ্যমে আমাকে তিনি জাপানী ডেস্কের ঘরের লোক করে তুলছেন।

'ওই বোকা সভাপতিটার প্রতি কোন মনোযোগই দেবে না,' বললেন কোভালেঙ্কো। 'সে একটা বোকা। শুধু জাপানী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার সময় সে যা বলে শুনবে, অন্য সময় ওকে উপেক্ষা করবে। তুমি কাজ করবে আন্তর্জাতিক বিভাগের জন্য।'

১৯৬৭ সালের এপ্রিলে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের মস্কো কাউন্সিলের প্রতিনিধি দল বিমানযোগে খাবারোভস্ক-এ উপনীত হয়। সেখান থেকে ট্রেনযোগে যায় বন্দর নগরী নাখোদকায়। সেখানে যাত্রীবাহী জাহাজ ঝারঝিনস্কিতে চড়ে সমুদ্র পথে যাত্রা করে জাপানের উদ্দেশ্যে। জাপানে প্রথমে আমার নজরে পড়ে এর পোতাশ্রয়টি। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম অতিকায় সুপার ট্যাঙ্কার, মালবাহী জাহাজ, সাদা রঙ লাগানো বিশাল বিশাল তৈলাধার এবং কারখানার চিমনি। বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে আমি জাপানে প্রবেশ করছি। একটু নার্ভাস বোধ করলাম।

মোটরগাড়ি যোগে আমাদের ডেলিগেশনকে টোকিওর তাকানাওয়া প্রিন্স

হোটেলে নিয়ে যাওয়া হলো। দু'চোখ ভরে দেখলাম সব দৃশ্য। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম সুরম্য আধুনিক দালান কোঠা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে পুরনো ঐতিহ্যের বাড়িঘরের সাথে। প্রথম যে বৌদ্ধমন্দির ও শিন্টোমন্দির দেখলাম ওগুলোর মধ্যে যেন অপার্থিব কিছু একটা রয়েছে মনে হলো। আর সতেজ সবুজ জাপানী বাগানগুলো তো পুরোপুরি বিস্ময়। জনসাধারণের, রাস্তাঘাট আর দোকানপাটের পরিচ্ছন্নতা দেখে মুগ্ধ হলাম। কিন্তু টোকিওতে মানুষের ভিড় মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত। বিশেষ করে, অফিস-আদালত খোলার সময়ে। এত লোক কেমন করে এক জায়গার গাদাগাদি করে থাকে? ভাবলাম আমি। তবু যেদিকে তাকিয়েছি নজরে পড়েছে মানুষগুলো আত্মবিশ্বাসী, উদ্বেগমুক্ত। ওদের মুখগুলো হাসিমাখা। মস্কোবাসীদের মত বিষণ্ন বিরক্ত উদ্বিগ্ন মুখে ওরা ছুটে যাচ্ছে না। যানবাহনের স্রোত দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। অমন সঙ্কীর্ণ রাস্তায় অত গাড়িকে অতটা দ্রুতবেগে চলতে আমি দেখিনি কখনও। তবু সবকিছুই চলছে খুব দক্ষতার সাথে। জাপানে আমার প্রথম করণীয়গুলোর তালিকায় সবার আগে ছিল জাপানী খাবার খাওয়া। মনে পড়ে ওরা কাঁচা মাছ খায় জেনে কেমন বমি বমি লেগেছিল। পরে ঠিক করি যে যেমন লাগুক, খেয়ে দেখবই। চলে গেলাম এক ছোট্ট সুশি ও সাশিমি রেস্তরাঁয়। দারুণ! অমৃতের স্বাদ! সেই থেকে ভক্ত হয়ে গেলাম সব ধরনের জাপানী খাবারের। কিন্তু প্রথমবারের মত স্বাদ আর পাইনি।

গেনসুইকিন আর গেবসুইকিয়ো'র প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করার জন্য প্রতিদিন ঘণ্টা দুই-তিন চুরি করতে লাগলাম। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল শান্তি আন্দোলনের বিভিন্ন উপদলগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। দুই উপদলের সংঘাত তীব্রতর হচ্ছিল। প্রিয়পাত্র হবার জন্য ওদের প্রতিনিধিরা ঘন ঘন মস্কোতে যাওয়া-আসা করছিল। টোকিওতে আমার অন্যতম কাজ ছিল দুই গ্রুপের কোন্‌টাকে কোন্ ইস্যুতে মস্কোর সমর্থন দেয়া উচিত তা স্থির করা।

মি. মোরিতাকির নেতৃত্বাধীন হিরোশিমার উত্তরজীবী সংস্থার কয়েকজন সদস্য অতদূর থেকে টোকিও চলে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। তাঁদের সঙ্গে একটি ভাল রেস্তরাঁয় চমৎকার একটা সন্ধ্যা কাটল। তাঁদের সংস্থা আর শান্তি আন্দোলনের অন্যান্য গ্রুপের সম্পর্ক নিয়ে আলাপ-আলোচনায়। কাজের আলাপ করতে এলেও মনে হলো তাঁরা এতদূরে এসেছেন আসলে আমাকে দেখতে।

মাত্র দশ দিন ছিলাম জাপানে। তবু ফিরতে মন চায়নি। প্রচুর তথ্য পেয়েছিলাম। কোভালেঙ্কোর জন্য রিপোর্ট তৈরি করতে পুরো তিনটা দিন লেগে

যায়। রিপোর্টটা নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে।

'চমৎকার,' বললেন তিনি। 'তোমার জাপান সফর সফল হয়েছে বলে আমরা মনে করি। জুলাইতে কমসোমলের একটা প্রতিনিধি দল যাচ্ছে জাপানে। ওতে উপদেষ্টা হিসাবে তোমাকে পাঠাব ভাবছি।'

আমি অবশ্য খুশি হলাম। কমসোমলের সদস্যরা দুনিয়ার অন্যান্য দেশে গেলে ভাল সংবর্ধনা পায়। কমসোমল হলো সোভিয়েত যুবসংস্থা। সবচেয়ে চালাক চতুর যুব প্রতিনিধিদের বাছাই করে পাঠানো হয় বাইরে।

জাপানে দশটা দিন এত ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়েছি যে, ঘুরে ফিরে কিছুই দেখতে পারিনি। তবু জাপানকে ভালবেসে ফেলেছি। আরেকবার যাবার সুযোগটাকে মনে হলো দৈবের দান।

১৯৬৭ সালের জুলাইতে কমসোমলের বাছাই করা একদল নেতা ও কর্মকর্তার সাথে রওনা হলাম ইয়ামানাকা হ্রদের তীরে জাপানী যুব উৎসবে যোগ দেয়ার উদ্দেশে। প্রতিনিধি দলে ছিল জেলা ও আঞ্চলিক কমসোমল কমিটিগুলোর সম্পাদকরা, সাধারণ কর্মকর্তা, সযত্নে বাছাই করা কিছু শ্রমিক এবং বাড়তি আকর্ষণ হিসাবে কয়েকজন ক্রীড়াবিদ, গায়ক, নৃত্যশিল্পী ও কিছু বিখ্যাত লোক।

এই বিখ্যাত লোকদের একজন ছিলেন নামজাদা সোভিয়েত নভোচারী ভ্লাদিমির কোমারভ। সমুদ্রপথে যাত্রার একদিন কি দু'দিন পরে আমরা এক প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে যাই। জাহাজের সবাই কাহিল হয়ে পড়ে সমুদ্রপীড়ায়। নভোচারীটি তিন বছর ট্রেনিং নিয়েছেন, মহাশূন্যে ভ্রমণ করেছেন। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, 'সব সময় নড়াচড়া করুন, হাঁটুন, ব্যায়াম করুন, কোননা কোন কাজে ব্যস্ত থাকুন।' কিন্তু একজন যাত্রীকে সমুদ্রপীড়ায় কাহিল হয়ে পড়তে দেখার পর তিনিও আক্রান্ত হলেন।

সেরে ওঠার সময় বললেন, 'বোকা বনে গেছি। আমাকে কেউ বলেনি সমুদ্রপীড়া সংক্রামক।'

দুঃখের বিষয়, পরবর্তী মহাশূন্য অভিযানে কোমারভ নিহত হন। তাঁর সয়ুজ মহাশূন্য যানটিতে গোলমাল দেখা দেয়, তিনি চলে যান এক ভুল কক্ষপথে। গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল তাঁকে নিরাপদে নামিয়ে আনতে পারত। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে তাঁর পুনঃপ্রবেশের গতি হ্রাসের জন্য যে প্যারাসুটটি খুলে যাবার কথা ছিল ওটা খোলেনি। তিনি বুঝেছিলেন, ভূমি স্পর্শ করা মাত্রই প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর মৃত্যু হবে। তবু কোমারভ শান্তভাবে কথা বলেছেন শেষ পর্যন্ত, মূল্যবান তথ্য জানিয়েছেন নিচের লোকজনকে। এখনও একজন বীর হিসাবে তাঁকে স্মরণ করা

হয়। এখনও তাঁকে সম্মান করা হয় তাঁর সাহসের জন্য। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলে আমি আনন্দিত, কারণ তিনি ছিলেন একজন ভাল মানুষ।

অপ্রত্যাশিতভাবে জাপানীরা আমাদের রাখল অলিম্পিক পল্লীর ডরমিটরিতে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, গোটা অলিম্পিক পল্লীটা কাঁটাতারের বেস্টনীতে ঘেরা। গেটগুলো বন্ধ থাকে রাত ১১টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত। এই বন্দোবস্ত পছন্দ হলো সোভিয়েত প্রতিনিধিদের। কারণ, এর ফলে কেজিবি'র কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের পক্ষে যুবদলের সাথে মিশে গিয়ে ডেলিগেশনের আসল সদস্যদের ওপর নজর রাখা সহজতর হয়। বন্দীদশা আমাদের অনেকেরই ভাল লাগেনি।

অবশেষে ঠিক করলাম এর প্রতিকারের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। একদিন জাপানের জনজীবন সম্পর্কে ক'জন মিলে আলোচনাকালে আমি তসুকিজির বিশাল মাছের বাজারের কথা উল্লেখ করলাম। যেন সবই জানি এমন ভাব দেখিয়ে বললাম, 'জানো, এটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাছের বাজার।'

'অতই যদি জানো, তাহলে আমাদের দেখাবার ব্যবস্থা করছ না কেন?' বলল একজন। আমি বাজারটা দেখিনি। কিন্তু সেটা বললাম না কাউকে।

জানতাম যে পুরোদমে চালু অবস্থায় দেখতে হলে তসুকিজিতে পৌঁছতে হবে ভোর ৫টা ৩০ মিনিটের আগে। আমাদের ডেলিগেশনের শোফার ছিল মরোজভ নামের জনৈক প্রবাসী রুশের ১৯ বছর বয়সী ছেলে। সে জাপানী ও রুশ ভাষা বলে অনর্গল। তার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ঠিক হলো, সে পাঁচটার কিছু আগে গেটের বাইরে গাড়ি রাখবে। আমরা যথাসময়ে রুম ছেড়ে বেরিয়ে, বেড়া ডিঙ্গিয়ে তার গাড়িতে উঠে বসলাম। আসলে মরোজভই আমাদেরকে নিয়ে গেল মাছের বাজারে। কিন্তু সেই যে আসল গাইড তা কেউ লক্ষ্য করল না।

কয়েক হাজার মিটার বিস্তৃত ছাদের নিচে বিশাল এলাকা জুড়ে এই মাছের বাজার। সেখানে হাজার হাজার টন মাছ। ছোট হেরিং থেকে বিশাল আকারের টুনা পর্যন্ত। সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম, নিখুঁতভাবে সংগঠিত ও সাজানো। সবাই কর্মব্যস্ত। মুহূর্তের ঢিলেমি নেই কোথাও। আধ-ঘণ্টার মধ্যে বাজারের কর্মীরা গোটা রাতে ধৃত মাছ জাহাজ-নৌকা থেকে দোকানগুলোতে তুলে আনে। সেখানে ক্রেতাসাধারণের কাছে মাছগুলো বেচে দেয়া হয় কিংবা নিলামে মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এটাই হচ্ছে তুসুকিজি বাজার। ওই বাজার দেখে সেদিন ভোরে আমাদের কারও এক মুহূর্তের জন্যও

মনে হয়নি যে ওখানে যাবার ঝুঁকি নিয়ে আমরা ভুল করেছি।

একদিন কি দু'দিন পরে আমরা গেলাম ইয়ানাকা হ্রদের তীরে। এমন সুন্দর জায়গা দুনিয়াতে আর আছে কি না সন্দেহ। কয়েকশ' জাপানী তরুণ-তরুণীর সাথে বেশ ক'টি সিম্পোজিয়ামে যোগ দিলাম। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল আর জাপানী প্রতিনিধিদলগুলোর মধ্যে একটা লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। আমাকেসহ সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের প্রত্যেককে আন্তর্জাতিক বিভাগের কর্তারা শিখিয়ে দিয়েছিল এ রকম সুযোগগুলোকে কেমন করে প্রচারণামূলক ও রাজনৈতিক বক্তৃতা-বক্তব্য প্রদানের কাজে ব্যবহার করা যায়। আমাদের বক্তৃতাগুলো হলো সোভিয়েত সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রশংসায় ভরপুর। জাপানী তরুণ-তরুণীদের আমরা বোঝাতে চাইলাম যে ওসব নীতি সমগ্র সোভিয়েত জনগণের দ্বারা সমর্থিত। আমরা জাপানে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ও আমেরিকান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করি।

পক্ষান্তরে আন্তরিক জাপানী প্রতিনিধিরা হৃদয়ের অর্গল খুলে দিল আমাদের কাজে। ওদের নিত্যদিনের সমস্যা, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, পেশাগত গুপ্তকথা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা, আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন সবকিছু খুলে বলল আমাদেরকে। সবচেয়ে বড় কথা শান্তির পথ জানতে চাইল ওরা।

ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক বিভাগের জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশে আমি দেখা করে ফেললাম গেবসুইকিয়ো, গেনসুইকিন আর জাপান-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে। মস্কোতে আমার রিপোর্টগুলো প্রশংসিত হলো।

সম্প্রতি একজন আমাকে প্রশ্ন করেছে, স্তান, তোমার সাথে যাদের পরিচয় হয়েছে তারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়েছে যে মনে মনে তুমি একজন বিদ্রোহী। অতগুলো বছর টিকে রইলে কেমন করে?

কথাটা আমি নিজেও ভেবেছি অনেকবার। এর কোন একক বা সহজ উত্তর নেই। আমি যে সব সময় অন্তর্মুখী, কোন কিছুই বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করি না এবং প্রায়ই ব্যক্তিগতভাবে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছুই যা প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধী—এটা সত্য। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে, আমার বয়স ছিল কম, আমি ছিলাম উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এবং একটা সফল ক্যারিয়ার গড়ে তোলার জন্য আগ্রহী। তাছাড়া, সে সময় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতাম যে ঠিক কাজই করছি এবং তা আমার দেশের ভালর জন্য প্রয়োজন। বিশ্বাস নিয়ে আমি আমার পেশাগত দক্ষতা অর্জনে, অর্থাৎ বিদেশীরা যাতে সোভিয়েত মত গ্রহণ করে তজ্জন্য কঠোর পরিশ্রম করি। কালে কালে আমি হয়ে উঠি আরও পরিশীলিত, পরিণত, যোগ্য ও কার্যকর।

তারপরেই আমাকে 'টোপ' দেয়া হলো। আন্তর্জাতিক বিভাগ বলে দিল যে সোভিয়েত শান্তি কমিটি থেকে আমার সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটিতে বদলি হবার সময় এসেছে। পদোন্নতি বলে মনে হলেও এর পিছনে আসলে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির একটি সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ছিল। আমাকে এভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই সব ঘটনাবলীর মধ্যে যা আমাকে শেষ পর্যন্ত ঠেলে দেয় কেজিবি'র জালে।

আমি টোপ গিললাম

সোভিয়েত শান্তি কমিটি থেকে যখন সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটিতে বদলি হলাম সেই সময় দুটি সংস্থাই যুক্তরাষ্ট্রকে ইন্দোচীন পরিত্যাগে বাধ্য করা এবং দেশটা যাতে কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক সক্রিয় প্রয়াস ব্যাপৃত ছিল। এই সক্রিয় প্রয়াসে বলতে বুঝায় অন্যান্য দেশের পদক্ষেপকে প্রভাবিত করা, তাদের রাজনৈতিক মনোভাব ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা, সোভিয়েত লক্ষ্যসমূহের অনুকূল মত গ্রহণের দিকে তাদের জনগণকে পরিচালিত করা। এটাকে প্রচলিত গোয়েন্দাবৃত্তি বা কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্সের সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসৃত কূটনৈতিক কার্যক্রমের রীতিই হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির এক বিরাট অংশকে, কেজিবি ও রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে এর সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত করা এবং এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা।

ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ইন্দোচীন থেকে বের করে দেয়ার প্রচেষ্টার সাথে আমি পুরোপুরি যুক্ত ছিলাম। পরাশক্তি আমেরিকা তার উন্নততর অস্ত্রশক্তি নিয়ে হামলা করছে অসহায় ভিয়েতনামী কৃষকদের ওপর এটাই শুধু আমি দেখছিলাম। উপরোক্ত সোভিয়েত কমিটি দুটো কেবল শান্তি আর পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চায় বলে মনে করতাম আমি। এ কারণে আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল কমিটিদ্বয়ের লক্ষ্যের প্রতি। কিন্তু তাই বলে সোভিয়েত শান্তি কমিটি ও সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির ভণ্ডামির প্রতি আমি চোখ বন্ধ করে ছিলাম না। দুটোই চলত প্রধানত জনসাধারণের চাঁদায়। অনতিকাল পরেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেবল সোভিয়েত রেডক্রস থেকেই অর্থ আদায় করা হত না। 'শান্তির স্বার্থে' রুশ অর্থোডক্স চার্চকেও বিপুল অঙ্কের চাঁদাদানে বাধ্য করা হত। খ্যাতনামা লোকদেরকে, ক্রীড়াবিদ, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও গায়ক-গায়িকাদেরকে বাধ্য করা হত জনসাধারণের কাছে চাঁদা

চাইতে। দরিদ্রতম লোকেরাও তাদের সাধ্যের বাইরে দান করে দিত অতিযত্নে সংগৃহীত সামান্য অলঙ্কারপত্র কিংবা খাবার কেনার জন্য রক্ষিত টাকা-কড়ি।

আমি যখন সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটিতে যোগ দিলাম তখন এ কমিটি কৌশলে চেষ্টা চালাচ্ছিল আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদকে সোভিয়েতের নীতি প্রচারের বাহনে পরিণত করতে। 'আপসো'র সদর দফতর ছিল কায়রোতে। বান্দুং সম্মেলনের পরে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটি প্রথম দিকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত ছিল না। প্রথম দিকের সেই বছরগুলোতে মিসরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রভাবে এটা উগ্র হয়ে উঠতে পারেনি। পঞ্চম দশকের শেষ দিক থেকে ৬ষ্ঠ দশকের প্রথমার্ধের মধ্যে 'আন্তর্জাতিক বিভাগ'-এর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদ হয়ে ওঠে, 'আন্তর্জাতিক বিভাগের' এক জঙ্গী ফ্রন্ট। অ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া, ভিয়েতনামের তথাকথিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে নৈতিক, আর্থিক ও বৈষয়িক সমর্থন দানের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে মস্কোর প্রভাব বিস্তারের শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়। ৬ষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি নাগাদ 'আপসো' পুরোপুরি সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং প্যালেস্টাইনী মুক্তি সংস্থা (পিএলও) আর অ্যাঙ্গোলার গণমুক্তি সংস্থার (এমপিএলএ) গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণদানের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আর কেজিবি সাহায্য করতে থাকে।

এসব মুক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে এজেন্ট রিক্রুটের বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত হয় কেজিবি'র তিন-চারজন সক্রিয় অফিসার। এরা ছিল আফ্রো-এশীয় কমিটির স্টাফের অন্তর্ভুক্ত। ছাত্র শাখার দায়িত্বে ছিল জনৈক স্মির্নভ। কেজিবি'র লেঃ কর্নেল ছিল লোকটা। তার প্রধান কাজ ছিল ভাল এজেন্ট হবার উপযুক্ত ছাত্র বাছাই করে রিক্রুট করে ফেলা। কাজটাকে রণকৌশলগতভাবে মনে করা হত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশে ফিরে গিয়ে এসব ছাত্রের কেউ কেউ নেতৃত্বের পর্যায়ে চলে যেত। কেউ কেউ মন্ত্রী-টন্ত্রী পর্যন্ত হয়ে যেত।

আমাকে দেয়া হলো জাপান, ভারত ও অন্যান্য এশীয় দেশে অপারেশনের দায়িত্ব। এসব দেশের আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদ থেকে আগত প্রতিনিধি দলগুলোর সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনায় আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ্রমণকালে প্রায়ই তাদের সফরসঙ্গী হই। আমার

কাজের একটা বড় অংশ ছিল যে সব বিদেশীর সাথে দেখা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট লেখা, তাদের ব্যক্তিগত ইতিহাস, রাজনৈতিক মতামত ও ব্যক্তিগত দুর্বলতা বিশ্লেষণ করা। রিপোর্টগুলো জমা দিতে হত 'আন্তর্জাতিক বিভাগে'। কপি পাঠানো হত কেজিবি'র ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেট-এ। এটাই বিদেশে গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা করে।

বিদেশী গ্রুপগুলোর সাথে আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির সম্মেলনগুলো সোভিয়েতের দ্বারা পুরোপুরি সাজানো ব্যাপার। প্রতিটি বক্তৃতার কপি সোভিয়েতরা আগেই পেয়ে যায়। কোন বক্তৃতার মধ্যে অপছন্দের কিছু থাকলে তাদের ওইসব দেশ বা কমিটির অন্তর্ভুক্ত এজেন্টরা অপছন্দনীয় অংশগুলো ছেঁটে ফেলার চেষ্টা করে। সেটা সম্ভব না হলে সোভিয়েতের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের অধীনে সংগঠনগুলোর সদস্যদের দ্বারা ওই বক্তব্যের প্রবল বিরোধিতা করানো বা জবাবদানের ব্যবস্থা করা হয়।

আফ্রো-এশীয় কমিটিতে আমার প্রাথমিক দিনগুলোতে এক মজার ঘটনা ঘটে ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থার ইয়াসির আরাফাতকে নিয়ে। মস্কোতে তখনও পিএলও'র সরকারী মিশন হয়নি, তবে আলাপ-আলোচনা চলছিল মিশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। আরাফাত সে সময় নিয়মিত মস্কো সফর করতেন সোভিয়েত-আফ্রো-এশীয় কমিটি আয়োজিত আলোচনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশে। কিন্তু এসব আলোচনায় উপস্থিত থাকত আন্তর্জাতিক বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার, কেজিবি'র অফিসার, 'গ্রু', (সোভিয়েত জেনারেল স্টাফের প্রধান গোয়েন্দা দফতর) এবং সোভিয়েত বিদেশ মন্ত্রণালয়ের অফিসাররা।

আরাফাত আর 'আন্তর্জাতিক বিভাগের' দুটি মীটিং-এ আমি উপস্থিত ছিলাম। যে জিনিসটা আমার বেশি মনে পড়ে তা হলো নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে আরাফাতের অতিরিক্ত উদ্বেগ। তাঁর ফিলিস্তিনী দেহরক্ষীরা ছিল আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত। আরাফাতের সফরসঙ্গী পিএলও প্রধান সেনাপতির কোমরে ঝুলছিল বিরাট এক রিভলভার। আরাফাত সাধারণ চেহারার মাঝবয়েসী লোক। মুখে হাসি লেগেই আছে। কিন্তু চোখ দুটো তাঁর ঘোরে সব জায়গায়, স্থির থাকে না এক মুহূর্ত, সদাসতর্ক ও অনুসন্ধানী। হাস্যমুখ মাঝবয়সী মানুষটাকে এবং তাঁর শীতল সন্দিগ্ধচোখ দুটি দেখে তাঁকে দুনিয়ার সবচেয়ে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের প্রধান হিসাবে চিনে নেয়া সহজ হয়ে ওঠে।

আরাফাতের সাথে এসব আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে সোভিয়েত ও পিএলও'র অবস্থান। পিএলও ছিল রাষ্ট্র হিসাবে ইসরাইলের

অস্তিত্বের ঘোর বিরোধী। সোভিয়েত প্রতিনিধিরা বৃথাই চেষ্টা করত ইসরাইলের বিরুদ্ধে পিএলও'র বিষোদগার কিছুটা হ্রাস করাতে। কিন্তু আরাফাত এসব মানতে রাজি হননি। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সোভিয়েত ও পিএলও'র উদ্দেশের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তা এক ছিল না।

সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটি আরেকটি সংগঠন গড়ে তোলে। ভিয়েম সাপোর্ট কমিটি (বিএসপি)। এর উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করা। এর সবচেয়ে বড় করণীয় ছিল জাপানে ছুটি ভোগ করতে গিয়ে যেসব আমেরিকান সৈন্য দলত্যাগ করত তাদেরকে হাত করা। স্টকহোমে শেষ গন্তব্যস্থলে পাঠাবার আগে তাদেরকে মস্কো বা সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্য কোন শহরে তিন-চার সপ্তাহ রাখা হত যাতে সোভিয়েত প্রচারযন্ত্র আমেরিকা বিরোধী প্রচারণায় দলত্যাগীদের ব্যবহার করতে পারে। জাপানী জেলে নৌকাগুলো পলাতকদের নিয়ে উত্তরাঞ্চলে সোভিয়েত জলসীমায় এলেই কেজিবি'র সাথে ওদের দেখা হত। কেজিবি দলত্যাগীদের তুলে দিত সোভিয়েত সীমান্ত প্রহরীদের জাহাজে।

ছয়জন পলাতক আমেরিকান সৈন্যের সাথে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মস্কোতে পৌঁছেই এই গ্রুপটি রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে বসে।

দলত্যাগীদের কেউ কেউ ছিল একেবারে ছেলেমানুষ। ভীতসন্ত্রস্ত। যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। আবার কেউ কেউ ছিল খাঁটি শান্তিবাদী। ধর্মীয় কিংবা নৈতিক বিশ্বাসের কারণে যুদ্ধ বা নরহত্যায় বিমুখ। কিছুসংখ্যক ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধী ছিল এ জন্যে যে, ওটা ছিল অঘোষিত যুদ্ধ। তাছাড়া যে কোন অজুহাতে দলত্যাগ করতে ইচ্ছুক এমন লোকরা তো ছিলই।

ছয়জনের এই দলটি বলতে লাগল, 'আমরা মস্কোতে থেকে যাব।'

এখন, সোভিয়েত প্ল্যান কিন্তু এ রকম ছিল না। আন্তর্জাতিক বিভাগ আর কেজিবি এদেরকে প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারে তৈরি থাকলেও তারা স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে থেকে যাক এটা কখনও চায়নি। তাই সংহতি কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল দ্যাসোখব-এর কাছে ডাক পড়ল আমার।

'আমরা ওদেরকে এখানে রাখতে পারি না, লেভচেঙ্কো, বললেন তিনি। সুইডেন ওদের ভার নিক। তুমি ওদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানে থাকার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করো। কিভাবে করবে জানি না, তবে বোলচাল মেরে, এটা তোমাকে করতেই হবে। মাথায় যা আসে সেই যুক্তি প্রয়োগ করো। দরকার

হলে সোভিয়েতের নিন্দাও করতে পারো, বুঝলে তো?'

'ইয়েস স্যার' বলে হাসিমুখে বেরিয়ে এলাম। জানতাম এ কাজে বেশ মজা হবে। মজা পেয়েছিলামও বটে। পরদিন সকালে ওই আমেরিকান সৈন্যদের সাথে দেখা হতেই গলার স্বর যতটা সম্ভব নামিয়ে বললাম আমি চাই না যে আমার কথা ওরা ছাড়া আর কেউ শুনুক।

'শুনুন মন দিয়ে,' বললাম, 'এ মুহূর্তে আমি আপনাদের যা বলছি তার জন্য আমাকে গুলি করে মারতে পারে। তবু বলছি, কারণ এখানকার অবস্থা আপনাদের জানা দরকার।' এর পরে আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েতের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এমন তীব্র বিষোদগার করলাম যে, আমেরিকান সৈন্যগুলো সর্বসম্মতিক্রমে মস্কোতে আশ্রয় প্রার্থনা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

আমি অনেকবার এদের সফরসঙ্গী হয়েছি। কিন্তু নিজে কেজিবি অফিসার হবার পরেই কেবল জেনেছি যে, এই দলত্যাগীদের সোভিয়েত ইউনিয়নে পাচারের কাজটি করত কেজিবি। ৬ষ্ঠ দশকের শেষে এবং ৭ম দশকের শুরুতে বেহেইরেন নামক একটি সংগঠনে কিছু জাপানী (প্রধানত বুদ্ধিজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) সক্রিয় ভূমিকা পালন করত। বেহেইরেন মানে 'ভিয়েতনামের জন্য শান্তি।' কেজিবি এই বেহেইরেনের এক সেক্রেটারিকে দলে ভিড়িয়ে ফেলে। তার মাধ্যমে আমেরিকান দলত্যাগীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। উক্ত জাপানী সংগঠনটি এই কাজের জন্যই যেন সৃষ্টি হয়েছিল।

বছর দুই কি তিন বেহেইরেন কেজিবি'র পাইপ লাইন হিসাবে ভাল করল। তারপরেই কিছু একটা ঘটল। আমেরিকান সৈন্যরা মস্কো এসে পৌঁছলে সাধারণত সংহতি কমিটির কয়েকজন কর্মকর্তা ওদের সাথে দেখা করত। প্রাথমিক কথাবার্তার পরে আমাদের একজন ওদেরকে নিয়ে যেতাম মস্কোর স্পুটনিক হোটেলে। ওদেরকে ওই হোটেলেই রাখা হত। ওরা এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করত। আমরা সঙ্গে থাকতাম। একদিন এক তরুণ নৌসেনা বিকালের এসকর্ট আসার আগে বেরিয়ে পড়ে তার রুম থেকে। চলে যায় এক রেস্তরাঁয়। এক বোতল ভদ্‌কা কিনে গিলতে থাকে। ঘটনাচক্রে আমেরিকান দূতাবাসের দুই মহিলা ওই একই রেস্তরাঁয় খাচ্ছিলেন।

'আমি মদ কিনছি,' ঘোষণা করল নৌসেনাটি ইংরেজী ভাষায়। 'একজন আমেরিকান নৌসেনার সাথে ড্রিঙ্ক করার মত কেউ আছে?' বিদেশীদের সাথে মিতালী করতে সোভিয়েতরা চট করে এগিয়ে যায় না। ফলে স্থানীয় লোকরা কেউ সাড়া দিল না। আমেরিকান মহিলারা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলেন তার

সাথে।

'একজন আমেরিকানের কণ্ঠ শুনে কি খুশিই না হলাম,' বললেন মহিলাদের একজন। আরেকজন বললেন, 'আমেরিকান নৌসেনা কেমন করে মস্কোতে এল?'

অন্য আমেরিকান সৈন্যরা রেস্তরাঁয় পৌছার আগে নৌসৈনাটি তার পলায়নের গোটা কাহিনী বলে ফেলল মেয়ে দুটিকে। মেয়ে দুটি ওকে বুঝিয়ে ফেলল যে, তার উচিত দেশে ফিরে যাওয়া। মাতালরা যা করে সেভাবে বিলাপ করতে করতে সে ওদেরকে বলল, দেশে ফিরতে ওকে সাহায্য করার জন্য। রেস্তরাঁর বাইরে মেয়ে দু'টির গাড়ি ছিল পার্ক করা অবস্থায়। তারা নৌসেনাটিকে গাড়িতে তুলে দূতাবাসে নিয়ে গেল। গাড়িটা চলে যাবার সময় দূতাবাসের গেটের কাছে দাঁড়ানো সোভিয়েত গার্ডরা দেখল যে, গাড়ির ফ্লোরে একজন লোক শুয়ে আছে।

ওই ঘটনার পর আমেরিকান পলাতক সৈন্যদের স্রোত শুকিয়ে যায়।

'এমন ঘটা অবধারিত ছিল,' বলাবলি করল সবাই। 'যে কোন সময় ঘটতে পারত। এটা স্রেফ দুর্ভাগ্য। মেয়ে দুটোর ওই রেস্তরাঁয় থাকা আর নৌসেনাটির সবার আগে ওখানে পৌছা স্রেফ ঘটনাচক্র।'

কিন্তু আমি কখনও এমনটি মেনে নিতে পারিনি। একজন গোয়েন্দা অফিসার হিসাবে আমি এ ঘটনার মধ্যে আরও কিছু দেখেছি। প্রথমত, নৌসেনাটি অন্য কোন রেস্তরাঁয় না গিয়ে ঠিক ওই রেস্তরাঁতেই গিয়েছিল। তাকে হোটেলের রুম থেকে বেরিয়ে যেতে কিংবা রেস্তরাঁয় যাওয়ার পথেও কেউ দেখেনি। দ্বিতীয়ত, নৌসেনাটি ভদ্‌কার বোতল কিনেছিল বটে, কিন্তু অতটা খায়নি যাতে তার মত একজন তাগড়া জোয়ান মাতাল হয়ে পড়বে। সর্বশেষে, গাড়িটি আমেরিকান দূতাবাসে প্রবেশ করার সময় সে ফ্লোরে শুয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করেছিল।

আমার পেশাগত বিচারে নৌসৈনাটির ঘটনা একটি সুপরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত গোয়েন্দা কার্যক্রম। আমার দৃঢ় সন্দেহ, ওটা আমেরিকান নৌ-গোয়েন্দা সংস্থার কাজ। আমার বিশ্বাস, তার কিছু প্রমাণও রয়েছে।

পরে জেনেছি নৌসেনাটি আমেরিকায় ফিরে গিয়ে কংগ্রেসের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি মনে করি, ওই তরুণ নৌসেনাটি ভিয়েতনাম থেকে জাপান হয়ে মস্কো পর্যন্ত বিস্তৃত পাইপ লাইনটির কথা ফাঁস করে দেয়। ফলে ওটা বন্ধ হয়ে যায়।

ওই পাইপ লাইনে সর্বশেষ আগত একটি গ্রুপে এক সুশ্রী তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্য

ছিল। তাকে গ্রুপের সবাই ডাকত রোমিও বলে। যতবারই তাকে জিজ্ঞেস করা হয় কেন সে পালিয়েছে, সে মাথা উঁচু করে জবাব দেয়, 'আমি একজন প্রেমিক, যোদ্ধা নই।'

আমরাও সহসা বুঝে ফেললাম যে, সে সত্য কথাই বলছে। তাকে হোটেলে আনতে না আনতেই চার-পাঁচজন মহিলার সাথে গোপনে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে ফেলে। যে মেয়ের সাথেই দেখা হোক, সে ফষ্টিনষ্টি করবেই। তার রঙচঙের পোশাক, সুগন্ধী অ্যাসেন্স ইত্যাদির জন্য বন্ধুরা খুব ঠাট্টা করত তাকে।

আমার কাজ ভিয়েতনাম থেকে পলাতক আমেরিকান সৈন্যদের সাথে থাকার মত সহজ ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির প্রধান করণীয় ছিল আমেরিকাবিরোধী প্রচারণা চালানো (এগুলোকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রচারাভিযান বলা হত)। এসব প্রচারণা পরিকল্পনার অনেকগুলো আমার রচিত। আমার লেখাগুলো সাধারণত 'আন্তর্জাতিক বিভাগে' পাঠানো হত। সেখানে গৃহীত হলে পাঠানো হত পলিটব্যুরোতে। পলিটব্যুরো অনুমোদন করলে সেগুলো হয়ে যেত সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারী প্রচারণা কর্মসূচী। আমার একটা অনুমোদিত লেখায় এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকায় ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী প্রচারণা উস্কে দেয়ার কর্মসূচী ছিল। আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটি ও 'আন্তর্জাতিক বিভাগের' নেতৃত্ব এমন ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করত যে, কমিটির গোপন নির্দেশিকায় প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ব্রেঝনেভ কিংবা পার্টির তাত্ত্বিক সুস্লভের ব্যক্তিগত স্বাক্ষরও আমি দেখতে পেতাম।

১৯৬৬ ও ১৯৭০-এর মধ্যে আমি কয়েকবার জাপান যাই। কখনও দোভাষী হিসাবে, কোন না কোন কমিটির সদস্য হিসাবে, কিংবা কোন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে। যখনই দরকার হয়েছে আমাকে জাপানে পাঠিয়েছে যে কোন একটা কিছু বানিয়ে। এ রকম এক সফরকালে হিরোশিমায় আণবিক বোমা বর্ষণের স্মরণে অনুষ্ঠিত সমাবেশে যোগ দিয়েছিলাম। আমার পক্ষে ওই ভাবগম্ভীর সমাবেশে যোগদান ছিল ভণ্ডামিপূর্ণ।

গোয়েন্দাবৃত্তির পথে আমার অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি। ১৯৬৬ সালে আমি আরেকটি ফোন-কল পেলাম। এবার আমাকে ডাকা হলো মিলিটারি কনস্ক্রিপশন কেন্দ্রে।

সেখানে যাঁর সাথে দেখা হলো তিনি নিজের পরিচয় দিলেন 'গ্রু'-র (সোভিয়েত সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান পরিচালনা কেন্দ্র) একজন সদস্য হিসাবে। কিছু সৌজন্য বিনিময়ের পর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে

বিস্মিত করে তিনি বললেন, 'চলুন একটু হাঁটি। এখানে কথা বলা যাবে না।'

বাইরে পার্কের মত জায়গায় গিয়ে তিনি আমাকে বললেন যে, আকস্মিকভাবে যুদ্ধ বেধে গেলে কি করতে হবে সেই পরিকল্পনা তৈরি আছে। 'পশ্চিমা জগতের সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে এজেন্টদের নামিয়ে দেয়া হবে প্যারাস্যুটযোগে। আপনাকে নামানো হতে পারে লিভারপুলের কাছে, কারণ আপনি ইংরেজী বলতে পারেন। তাছাড়া আপনি দেশটা সম্পর্কে জানেন।' ওই মুহূর্তে আমার কেবল একটু মনে পড়ল যে, লিভারপুল ব্রিটেনের একটা প্রধান বন্দর।

'আমরা চাই যে, আপনি ওরকম একটা যুদ্ধকালীন মিশনের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণে স্বেচ্ছায় যোগ দিন। আমি মিথ্যা বলব না আপনাকে। ওরকম মিশনে যোগ দিতে যদি কখনও আপনাকে ডাকা হয় তাহলে আপনি সম্ভবত দিন কয়েকের বেশি বাঁচবেন না। তবে যে তথ্য আপনি সংগ্রহ করতে পারবেন তার মূল্য হবে অসীম।'

'যদি বেঁচে থাকি তাহলে বেরিয়ে আসব কিভাবে?' জানতে চাইলাম। অনেকক্ষণ নীরব থেকে তিনি জবাব দিলেন, 'আপনি সেখানে পৌঁছার পর আমরা আপনাকে বলে দেব।'

দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠলাম হো-হো করে।

১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মকালে সামরিক বাহিনী ছয় সপ্তাহ ধরে প্রশিক্ষণ দিল আমাকে। পারমাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডারগুলো চিনতে শেখানো হলো, শেখানো হলো কিভাবে গোয়েন্দা বেতার ব্যবহার করতে হয়, সাঙ্কেতিক বার্তা পাঠাতে হয়। পরবর্তী গ্রীষ্মে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় প্যারাস্যুট জাম্পিং-এ। তাছাড়া, কিভাবে খাবার সংগ্রহ করতে হয়, সঙ্গে খাদ্যবস্তু না থাকলে বাঁচার জন্য কি কি করতে হয় এসবও শিখলাম। হাল্কা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারও শেখানো হলো।

'গ্রু'-র যেসব অফিসারের সাথে দেখা হলো সবাই জাতীয় প্রতিরক্ষায় আত্মনিবেদিত এবং একনিষ্ঠ কর্মী। কাজটাও সোজা-সরল। দেহ-মনের জন্য তৃপ্তিকর। 'গ্রু'-র সাথে যুক্ত হয়ে নিজেকে সম্মানিত বোধ করলাম।

আমি জানলাম যে 'গ্রু' কেজিবিকে ঘৃণা করে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে কেজিবি'ই যে জিতবে এটাও 'গ্রু' জানে। 'গ্রু'-র কার্যক্রম যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট। এজন্য কেজিবি'র রাজনীতি ও পার্টিনীতি মাথা ভণ্ডামি থেকে মুক্ত। 'গ্রু' অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার।

১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মে 'গ্রু'-র অধীনে আমার ট্রেনিং তৃতীয়বারের মত শুরু হতে যাচ্ছিল। এমন সময় একজন 'গ্রু' অফিসার আমাকে ডেকে নিয়ে

দুঃখিতভাবে বললেন যে, 'গ্রু'-র সাথে আমার যোগাযোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাকে কেজিবি'র সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টরেট-এর হয়ে কাজ শুরু করতে হবে। রেগে আগুন হয়ে গেলাম।

এসসিডি হচ্ছে কেজিবি'র অন্যতম প্রধান ডাইরেক্টরেট। এটা সোভিয়েত ইউনিয়নে সকল কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স অপারেশন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। তদন্ত ও দণ্ডবিধান দু'য়েরই ভার এর ওপর। আমেরিকানদের কাছে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য। তারা যে ব্যবস্থার অধীনে বাস করে সেখানে তদন্ত কাজ যারা চালায় বিচারের বা শাস্তি প্রদানের ভার তাদের ওপর থাকে না। এসসিডির অসংখ্য টিকটিকি (ইনফর্মার) আছে। ওরা প্রায় প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিক, বিদেশী ট্যুরিস্ট, কূটনীতিবিদ, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী সম্পর্কে সর্বক্ষণ তথ্য সরবরাহ করে। বেতনভুক্ত টিকটিকিরা অনুপ্রবেশ করে ভিন্ন মতালম্বীদের সংগঠনগুলোতে, মানুষকে ফাঁদে ফেলে মনের কথা বের করে নেয়, তারপর তাদের নামে রিপোর্ট করে। কেজিবি'র অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় এসসিডি সকল বিদেশীর কার্যকলাপের ওপর নজর রাখে। এসসিডির অধীনে কাজ করার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। আমার ভয় ছিল সোভিয়েত সফরে আগত জাপানীদের বিরুদ্ধে আমাকে ব্যবহার করা হবে।

ক্রোধ সামলাতে না পেরে গালাগাল দিয়ে উঠলাম। 'গ্রু' অফিসারটি বললেন, 'গাল দিয়ে আর কি হবে। এসসিডির কাজ আমরাও পছন্দ করি না। কিন্তু যেতে আপনাকে হবেই।'

কেজিবি'র সঙ্গে সহযোগিতা করলেও মূলত আমি আগের কাজেই ব্যস্ত রইলাম। আগের কাজ মানে, বিদেশী অতিথিদের নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘুরে বেড়ানো, আদর্শ খামার, ফ্যাক্টরি, স্কুল ও হাসপাতাল বিদেশী অতিথিদের দেখানো, বিশেষভাবে সাজানো-গোছানো শিশু নিকেতন দেখানো, সর্বক্ষণ সতর্ক থাকা, সযত্নে মঞ্চস্থ শোগুলো বরবাদ করতে পারে এমন সবকিছু লুকিয়ে রাখা, যে কোন মূল্যে সত্য গোপন করা, যে কোন বিদেশী সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট পেশ করা, বিদেশীদের সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আকৃষ্ট করার উপায় উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা। প্রায় প্রতিবছরই জাপান যেতাম। তখন এই রুটিন ভঙ্গ হত। কিন্তু জাপানে গিয়েও নিস্তার ছিল না। কাজ করতে হত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির জন্য।

জাপানে গেলে ওই সমৃদ্ধ ও সুসমন্বিত দেশটা দেখে প্রতিবারই আমার মনে সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে একই প্রশ্ন জাগত। আমি দেখতাম এক বর্ধিষ্ণু অর্থনীতি, রাস্তায় চলমান অসংখ্য গাড়ি, প্রচুর খাদ্য সম্ভার, ভোগ্যপণ্যে ভরপুর

দোকানপাট—অথচ দেশটিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের কোন চিহ্নই নেই।

ক্রমেই আমার মনে হতে থাকে যে, কাজটা বড় খাটুনির। প্রতিদিনই নিজের কাজের ওপর ঘৃণা বাড়তে থাকে। তরুণ বয়সের আদর্শবাদ অদৃশ্য হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আমি সত্যের মুখোমুখি হই। যে কাজ করছি তা যে নীতি বিগর্হিত সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হই। কোন কোন লোক আত্মিক শূন্যতার মধ্যে জীবন কাটাতে পারে। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। দোভাষী থেকে গোয়েন্দায় রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়ায় আমি আত্মিক শান্তির সন্ধান পেলাম রুশ অর্থোডক্স চার্চের মধ্যে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে চার্চে যাওয়া বেআইনী না হলেও দেশটা হচ্ছে নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্র। কিন্তু ধর্ম পালন বেআইনী না হবার অর্থ এই নয় যে, ধর্ম পালনকারীর ওপর উৎপীড়ন হবে না।

আমার অবশ্য কোন ধর্মীয় শিক্ষা ছিল না। তাই প্রথম প্রথম শুধু দর্শক হিসাবেই চার্চে যেতাম। দেখতাম একজন বাইরের লোক হিসাবে। তারপর, যেতে যেতে একদিন উপলব্ধি করলাম যে, কখন যেন ভিতরের লোক হয়ে গেছি। এইভাবেই শুরু হয় ধর্মের পথে আমার দীর্ঘ যাত্রা।

একটা কাজে বড় আনন্দ পেতাম। সেটা ছিল বিদেশীদের রাশিয়ার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো দেখানো। গোড়ার দিকে শুধু এসব স্থানের, প্রাসাদ মিউজিয়াম, গীর্জার বাহ্যিক অবয়বের সৌন্দর্যই দেখতাম।

ক্রমে ক্রমে, অতি ধীরে ধীরে আমি এসবের মধ্যে আরও গভীরতর কিছু দেখতে শুরু করলাম। পুরোহিতদের কেউ যখন বিদেশী দর্শকদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাত, তখন নীরবে বসে লক্ষ করতাম প্রার্থনা করতে যারা এসেছে তাদের মুখ। সেসব মুখে আমি দেখতাম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর ভয়ের ছাপ। কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হয়ে লক্ষ করতাম যে, হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা শুরু করা মাত্রই সেই মুখগুলো থেকে উদ্বেগ আর ভীতির ছাপ মুছে যেত। প্রার্থনা শেষে ফিরে যাবার সময় মুখগুলোতে দেখা যেত শান্তি ও সুখের ছাপ। এটা আমার মনে গভীর প্রভাব ফেলত।

ক্রমে ক্রমে আমি চার্চের সব উপকরণ, সঙ্গীত ও আর্টের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে লাগলাম। পুরোহিতরা কি বলেন তা শুনতে লাগলাম। ধীরে ধীরে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠলাম। কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় জানতাম না। পাদ্রীদের জিজ্ঞাসা করতে সাহস হত না। কারণ আমি যে ধরনের কাজ করি তাতে ওসব শিখতে চাইলে তাঁরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতেন। বিশ্বাস করে মনের কথা কাউকে বলতেও পারতাম না। ফলে আমি হয়ে গেলাম এক গোপন খ্রীষ্টান।

মস্কোর লাইব্রেরিগুলোতে যাতায়াত ছিল। খুঁজতে লাগলাম রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ সম্পর্কে বইপত্র পাই কিনা। কিছু কিছু পেলাম। নকল নাম নিয়ে পাঠাগারে বসে বসে সেসব পড়ে নিলাম। খুব সতর্ক থাকতাম যাতে কেউ দেখে না ফেলে কি পড়ছি।

সবচেয়ে বেশি দুঃখ লাগত এজন্য যে, আমি কোন প্রার্থনা জানতাম না। প্রার্থনা কিভাবে করতে হয় তার কোন ধারণাই আমার ছিল না। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল প্রবল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা জানতাম না।

আমার গোপন বিশ্বাসের কথা বৌকেও বলিনি। কাউকে বলিনি। আমেরিকায় যাবার আগে কোনদিন কনফেশনেও যাইনি। যেতে পারিনি। বিশ্বাস করার মত কেউ ছিল না। ধর্মবিশ্বাস অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করল আমার ব্যস্ত জীবনের ওপর। বাপ আমাকে শিখিয়েছিলেন সত্যপরায়ণ হতে। গোটা জীবন তাই হতে চেয়েছি। ফলে কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ আমি কাজ করছিলাম নিরীশ্বরবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য এবং কাজটা ছিল নীতিবিগর্হিত। নিজেকে বোঝাতে চেয়েছি এই বলে যে, আমার কাজ আমার প্রিয় স্বদেশের মঙ্গলের জন্য।

ভাগ্যের কি পরিহাস, আমি যখন ধর্মের আশ্রয়ে শান্তি খুঁজছি তখনি আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে হয়। স্বেচ্ছায় হইনি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে গোঁড়া বিশ্বাসী কোনদিনই ছিলাম না। জানতাম যে অনেকেই পার্টির সদস্য হয় প্রথমত ক্যারিয়ারের কারণে। তবে আমি তো তার আগেই পার্টির অন্যতম প্রধান সংস্থা আন্তর্জাতিক বিভাগের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত সংগঠনগুলোতে বছর কয়েক কাজ করে ফেলেছি। জানতাম আমার অবস্থা একটি সাদা কাকের মত। সেখানে আমিই ছিলাম একমাত্র কর্মী যে পার্টি সদস্য নয়। পরিস্থিতিটা যে সঙ্গীন তা বুঝতে পেরে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র দাখিল করলাম আঞ্চলিক কমিটিতে।

এক বছর পরে পার্টির সদস্যকার্ড পেলাম। আমি আর সাদা কাক রইলাম না। কিন্তু বহু বছর পার্টির সক্রিয় কর্মী আমি হলাম না। অতিরিক্ত কাজের চাপের দোহাই পেড়ে (সেটা অবশ্য মিথ্যা ছিল না)।

অনেকদিন পরে, সর্বক্ষণের জন্য গোয়েন্দা অফিসার হিসাবে জাপানে কর্মরত থাকাকালে, আমাকে জাপানে অবস্থিত সোভিয়েত সাংবাদিকদের পার্টি সেলের ডেপুটি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। সেক্রেটারি ছিলেন প্রাভদার সংবাদদাতা ল্যাতিশেভ, প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিটিউটে আমার পূর্বতন উপদেষ্টা। তিনি ছিলেন একজন চতুর ক্যারিয়ারিস্ট। প্রয়োজনীয় মীটিং ও আলোচনাদি

সুদক্ষভাবে পরিচালনা করতেন। গোয়েন্দা অফিসার ছিলেন না। তবে নিজের চাকরির উন্নতির লক্ষ্যে পার্টি কর্মকর্তা হিসাবে যে কোন সুযোগ পেলেই কাজে লাগাতেন। এ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি। সেল-এর জন্য কোন কাজই করতেন না। আমিও জানতাম যে অলসতার জন্য কেউ আমার সমালোচনা করবে না, কারণ গুপ্তচর হিসাবে প্রতিমাসে এজেন্টদের সাথে আমি বিশ-পঁচিশটা গুপ্ত মীটিং করতাম। এটা চাট্টিখানি কথা নয়।

১৯৬৯ সালের শেষদিকে আন্তর্জাতিক বিভাগের জাপান বিষয়ক ডেস্কের প্রধানের দফতরে ডাক পড়ল আমার। তিনি আমাকে যে দায়িত্বের কথা বললেন তা একাধারে আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর। আমাকে প্রথমবারের মত সাংবাদিকের পদে নিযুক্ত করা হলো।

আন্তর্জাতিক বিভাগ এবং নভোস্তি প্রেস এজেন্সি আমাকে পরীক্ষামূলকভাবে ওসাকার এক্সপো-৭০ প্রদর্শনীতে সোভিয়েত প্যাভিলিয়নে জনসংযোগের কাজের জন্য মনোনীত করেছে। আট মাস ধরে চলবে প্রদর্শনীটা। জানতাম, আমার দায়িত্ব এক্সপো-৭০'র প্রচারণার সীমানা ডিঙ্গিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হবে। কর্তা আমার ধারণা সমর্থন করে বললেন, 'তোমাকে ও আন্দ্রে ঝুদ্রোকে কানসাই এলাকার প্রধান প্রধান শহরে এবং ওসাকা ও কোবে শহরে আগত সোভিয়েত জাহাজগুলোতে কয়েকটি বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করতে হবে। এসব মীটিং-এর উদ্দেশ্য হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী জোরদার করা। তোমার দায়িত্ব হবে জাপান-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির কার্যক্রমকে প্রভাবিত করা। তাইগাই বাংকো কিয়োকাই (বিদেশের সাথে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিষয়ক জাপানী সমিতি)-কেও প্রভাবিত করতে হবে।'

'প্রভাবিত করা' মানে কি তা জানতাম। আমাকে মিথ্যার জাল বুনতে হবে এবং প্রচারণার ফাঁদ পাততে হবে যাতে ওই জাপানী সংগঠনগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

তিনি আরও বললেন যে, ঝুদ্রো আর আমাকে সরাসরি সোভিয়েত দূতাবাসের প্রত্যক্ষ নির্দেশনার অধীনে কাজ করতে হবে এবং যত বেশি সম্ভব জাপানী সংগঠনের মধ্যে সোভিয়েতপন্থী মনোভাবের প্রসার ঘটাবার চেষ্টা করতে হবে। 'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ,' বললেন তিনি। 'তোমার অফিসে আরও একজনকে দেয়া হবে। নাম ইভানেঙ্কো। কেজিবি'র কাউন্টার ইনটেলিজেন্স-এর একজন মেজর। তোমরা যাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি যাচাই করবেন তিনি।'

ওহ্ হো! এই ব্যাপার! আমাদের ওপর একজন পাহারাদার বসানো হবে। পাহারা অবশ্য সব সময় থাকে, তবে এ রকম প্রকাশ্যভাবে নয়। প্রতি সপ্তাহ শেষে আমাদের একজন টোকিওতে অবস্থিত দূতাবাসে গিয়ে আমাদের রিপোর্টগুলো ট্রান্সমিট করতাম মস্কোতে।

আট মাস জাপানে কাটাবার লোভে দায়িত্বটা গ্রহণ করাম।

১৯৭০ সালে মার্চ মাসের প্রথমদিকে ওসাকা পৌঁছি। সোভিয়েত প্যাভিলিয়নের নির্মাণ কাজ তখন সবেমাত্র শেষ হচ্ছে। প্যাভিলিয়নটি ছিল অদ্ভুত আকৃতির এবং বিশাল। বাতাসে আন্দোলিত একটি লাল পতাকার মত। একদিক অপেক্ষাকৃত নিচু, অপরদিকে প্রদর্শনীর প্রায় সব প্যাভিলিয়নের চাইতে উঁচু। এর নির্মাণে কত অর্থ সোভিয়েতের ব্যয় হয়েছে ভাবতে পারলাম না। এক বিলিয়ন ইয়েন? হতেও পারে। আগেকার বিশ্ব মেলাগুলোতে কাজ করেছে এমন কয়েকজন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ আমাকে বলল যে, ওই আট মাসে যত বেশি সম্ভব জাপানীর মন জয় করার জন্য আমরা এক বড় ধরনের প্রচার অভিযানে নামছি।

সোভিয়েত প্যাভিলিয়ন ছিল সব ধরনের প্রদর্শনী দ্রব্যে ঠাসা। এগুলোর মধ্যে এমন সব আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ছিল যা সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যবহার করা হয় না। এছাড়া ছিল সাইবেরীয় খনিজ দ্রব্য। সেরা ডিজাইনারদের দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো। সোভিয়েত মহাশূন্য যানের মডেলগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রচার সামগ্রী। প্যাভিলিয়নের বিভিন অংশের রূপসজ্জার জন্য সাইবেরিয়া থেকে একেকটা আস্ত গাছ তুলে নিয়ে আসা হয়।

দর্শকদের কাছে ইংরেজী ও জাপানী ভাষায় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সাফল্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্যাভিলিয়নে প্রায় তিনশো সোভিয়েত গাইড নিয়োগ করা হয়। এই বিশাল বাহিনী দিনরাত প্রচার চালিয়ে যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরোপুরি শান্তিকামি এবং কেবল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদই বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে তারা মুশকিলে পড়ে যায় ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত হামলাকে চেক জনগণের নিরাপত্তা বিধানে সোভিয়েতের ভ্রাতৃত্বমূলক পদক্ষেপরূপে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। ওই গল্পটি জাপানীদের বিশ্বাস করানো সম্ভব হয় না।

চেক প্যাভিলিয়নটি ছিল ছোট্ট। তবে চমৎকার স্থাপত্যরুচি দ্বারা নির্মিত এবং অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত।

চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হামলার পরে তখন মাত্র

দেড়টি বছর কেটেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, চেক প্যাভিলিয়নের লোকগুলো তখনও উত্তেজিত ও তিক্ত। সোভিয়েতদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তারা নিজস্ব পন্থা অবলম্বন করে। সারাদিন ধরে তারা বিষাদপূর্ণ বাজনা ও করুণ শোকসঙ্গীত বাজায়। কেউ যদি কারণ জিজ্ঞাস করে তারা বলে, 'চেকোস্লোভাকিয়া শোক পালন করছে'। সোভিয়েতরা খেপে গেল। কিন্তু ওই বাজনা আর সঙ্গীত বন্ধ করাতে সোভিয়েত প্যাভিলিয়নের কমিশনারের কয়েক মাস লেগে যায়। ইতোমধ্যে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে।

এক্সপো ৭০-এ কাজ করতে গিয়ে ঝুদ্রো আর আমি দেখলাম যে, আমরা সম্পূর্ণভাবে মস্কোর কোভালেঙ্কো ও তাঁর সহকারী কুজনেৎসভের অধীন। ঝুদ্রো তাঁদের দুজনকেই আমার চাইতে ভালভাবে জানত। তবে আমার কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। সেটা আমার কিছু কিছু কাজের বিশেষ প্রকৃতির দরুন।

আমার কাছে প্রায়ই যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জাপানী সমাজতন্ত্রী দলের সক্রিয় সদস্য এবং স্থানীয় মৈত্রী সমিতির অন্যতম প্রধান ব্যক্তি সাইতো নোবুরো। সৎ, আন্তরিক ও পরিশ্রমী মানুষটি। সোভিয়েত প্রচারণার অনেকখানিই গিলেছিলেন। মি. সাইতোকে একজন সচেতন সোভিয়েত দালাল বলা যেত না। তিনি সোভিয়েতদের সাথে সহযোগিতা করতেন যেহেতু দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্বাস করতেন যে, সঠিক কাজই করছেন। সরল ও বোকা লোকরা খুব ভাল এজেন্ট হতে পারে।

ওসাকায় ওই মাসগুলোতে খুব ধকল গেছে আমার ওপর দিয়ে। প্রতিদিন মনে হত আমি যেন দু'টি পৃথক ও সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করছি। একটি জগত সোভিয়েত প্যাভিলিয়নে। সেখানে দাঁড়িয়ে, আমরা যে জাপানে আছি এটা না জানলে যে কোন লোকের মনে হত যে, সে সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন অংশের কোন অফিসে রয়েছে। অন্য জগৎটি ছিল সোভিয়েত প্যাভিলিয়নের বাইরে, আমাদের আবাস ভবনগুলোর বাইরে। সেখানে আমার সময়টা ভালই যাচ্ছিল। কানসাই এলাকার অনেক গণসংগঠনের সাথে আমার কাজ করতে হত। একা ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ ছিল। এ সুযোগ প্যাভিলিয়নে কর্মরত অনেকেরই ছিল না। ছুটির দিনে ও সপ্তাহান্তের দিনগুলোতে আমি চলে যেতাম মিউজিয়ামে, সিনেমায়, পার্কে। ঘুরে ঘুরে দেখতাম যতটা পারি। কোন ছোট্ট রেস্তরাঁয় বসে সুসি, সাশিমি আর বিয়ার খেতে খেতে গল্প করতাম অন্য খদ্দেরদের সাথে।

প্রথমবারের মত সুযোগ পেলাম কিয়েটো ও নারা'র বৌদ্ধ মন্দির ও সিন্টো

মন্দিরগুলো, ঐতিহাসিক স্থানগুলো স্বচক্ষে দেখার। রিয়োনজীর জেন মন্দির কমপ্লেক্স দর্শনের বিরল সৌভাগ্য হলো আমার। সেখানকার পাথরের উদ্যানটি দেখে ওই আশ্চর্যজনক বস্তুটি যে বাস্তব হতে পারে তা আমার বিশ্বাস হতে চাইল না। দু'টি ঘণ্টা কাটালাম সেখানে। রিয়োনজী সেদিন ছিল চুপচাপ, নির্জন। দর্শনার্থী ছিল কম। তাই চুপচাপ বসে ভাবনায় তলিয়ে যেতে অসুবিধা হয়নি। বাগানটার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছে পাথরগুলো যেন সাগরের মধ্যে একেকটি দ্বীপ, কিংবা মেঘ ফুঁড়ে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো পাহাড়ের চূড়া। ক্রমে আমার ধ্যান ভাঙল। মন শান্ত হলো। জানতাম যে একটা অসাধারণ, গভীর ও সুন্দর কিছু দেখছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি ওরকম সাদামাঠা একটা বাগান ও পাথরের দৃশ্য আমাকে কেন অমনভাবে অভিভূত করল।

সাইহোজির শেওলা মন্দিরের দৃশ্যও আমাকে প্রায় একই রকমভাবে অভিভূত করে। চল্লিশ ধরনের বিভিন্ন শেওলার রঙ আর গাছপালার সৌন্দর্য মিলে সেখানে এক রূপকথার রাজ্য তৈরি হয়েছে। শিশুসুলভ স্বপ্নে ও চিন্তায় ডুবে যাওয়ার স্থান ওটা। নারা-তে আমি অনেকবার গিয়েছি। ওই প্রাচীন রাজধানীর পরিবেশ আমার বড় ভাল লেগেছে। জাপানের প্রাচীনতম মন্দির কমপ্লেক্স হোরিযুজির সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। পার্কের পরিচ্ছন্ন পথে হাঁটতে হাঁটতে পোষা হরিণগুলোকে খাওয়ানো এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা।

কিয়োটোতে বিখ্যাত গিওন উৎসবও দেখেছি আমি। সেদিন উপলব্ধি করেছি কি গর্বের সাথে জাপানীরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উৎসবগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই গর্ব তাদেরকে পূর্ব পুরুষদের সাথে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বেঁধে রাখে। পূর্বপুরুষদের তারা স্মরণে রাখে অতীতের জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের মাধ্যমে। উৎসবে সমবেত জনতা উদ্বেগহীন, আনন্দমুখর। ঐতিহ্যময় কিমোনো পরা মেয়েদের রূপ মন কেড়ে নেয়। সেই হাসিমাখা মুখের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই ভেবে মনটা দুঃখে ভরে গেল যে, আমি হয়তো আর কোনদিন এসব দেখব না, অন্তত সোভিয়েত ইউনিয়নে। এই কারণে নয় যে রাশিয়ান, উক্রাইনীয় কিংবা অন্য কোন সোভিয়েত জাতির নিজস্ব গৌরবমণ্ডিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই, বরং এই কারণে যে, কমিউনিস্ট পার্টি এসব জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সকল বহিঃপ্রকাশ সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে অবদমন করেছে। জাতিগত

উত্তরাধিকারগুলো সংরক্ষণের গৌরব থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছে।

সোভিয়েত প্যাভিলিয়নের কাজটি ছিল বড় পরিশ্রমের। প্রতিদিন আমাকে জাপানী সংবাদপত্র—আশাহি, গাইনিচি ও ইওমিউরি পড়তে ও জাপানী টেলিভিশন দেখতে হত। জাপানীরা কি খোলামেলা, গণতান্ত্রিক, উদ্যমশীল এবং পরিশ্রমী তা দেখে আমি বিস্মিত হলাম। জাপানী সমাজে লোকে যে কোন মতামত অবাধে পোষণ ও ব্যক্ত করতে পারে। সেই মতামত রক্ষণশীল কিংবা বামপন্থী, কমিউনিস্ট কিংবা বিপ্লববাদী যাই হোক না কেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ দেশের সঙ্গে এখানকার অবস্থাটার পার্থক্য তুলনা করলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নে সংবাদপত্র সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। পার্টির প্রচারযন্ত্র যেটুকু জানতে দেয় কেবল সেটুকুই জানতে পারে পাঠকরা। অথচ এখানে জাপানী বন্ধুদের আমি প্রতিদিন বলছি যে, সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক, তার চাইতে ভাল ব্যবস্থা দুনিয়ায় আর নেই।

দিনে বারো থেকে পনেরো ঘণ্টা করে খাটতে আমি দৈহিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কেজিবি অফিসাররা সর্বক্ষণ নিরাপত্তার কড়াকড়ি বৃদ্ধি করতে থাকায় সোভিয়েত প্যাভিলিয়নের পরিবেশেরও অবনতি ঘটে। কয়েকজন গাইডকে মস্কোতে ফেরত পাঠানো হয়। ওদের কেউ কেউ বিদেশী মেয়েদের সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিল। আমার সবসময় মনে হতে থাকে যে, কেউ আমার ওপর নজর রাখছে। প্যাভিলিয়নের প্রতিটি কর্মীই যে এ রকম অনুভব করত তা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। জাপানের মত চমৎকার দেশেও এ রকম চাপের মধ্যে থাকা কষ্টকর।

ঠিক করলাম, সোভিয়েত প্যাভিলিয়নের ডেপুটি কমিশনারকে বলব আমাকে মস্কো ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিতে। ডেপুটি কমিশনার ছিলেন কেজিবি'র জেনারেল পাশোলিকভ। কঠোর স্বভাবের গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক বলে খ্যাতি ছিল লোকটার। তাই একই সাথে আমি আবেদন জানালাম আন্তর্জাতিক বিভাগ এবং সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির কাছে। তখনও আমি এ কমিটির হয়ে কাজ করছি। আমার আবেদন গৃহীত হয়। ১৯৭০-এর জুনে আমি ফিরে যাই মস্কোতে।

জাপান ছেড়ে যাবার পর কিছুই ভাল লাগল না আমার। আত্ম-পরীক্ষা আর ভাবনা-চিন্তার মধ্যে দিন কাটতে লাগল। মনে মনে স্বীকার করলাম যে, হাল-অবস্থা যা দেখছি তার মধ্যে পছন্দের কিছুই নেই। কারণগুলো পরিষ্কার। প্রতিদিন ডুবে আছি ভণ্ডামির মধ্যে। নিজে ভণ্ডামি তৈরি করছি, ভণ্ডামির

কারবার করছি। ঘেন্না ধরে গেল নিজের এবং সবকিছুর ওপর।

যে ব্যবস্থা এবং তার তৈরি করা পদ্ধতির পক্ষে কাজ করছি তার প্রতি ঘৃণা আমার বাড়তে লাগল দিনের পর দিন। রোবোটের মত আবার লেগে গেলাম আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির বক্তৃতা-লেখক আর মুখপাত্রের ভূমিকা পালনের কাজে। আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কংগ্রেসে আমার সম্পাদিত বা রচিত বক্তৃতা কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্যরা পড়তে লাগলেন। এসব বক্তৃতায় আমেরিকানদের যুদ্ধোন্মাদ, সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ট বলে গাল দেয়া হত ভিয়েতনাম যুদ্ধে ওদের জড়িত হবার কারণে। নিন্দা করা হত যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতনের এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী নীতির। কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর নির্যাতনের এই নিন্দা আমার কাছে মনে হত ভণ্ডামি। আমাদের সোভিয়েত নগরী কিয়েভে কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রকে খুন করা হয় একটি মাত্র কারণে। কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ মেয়ের সাথে ওদেরকে হাঁটতে, কথা বলতে এবং হাসতে দেখা গিয়েছিল বলে। কিন্তু আমার কাজ ছিল আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার নিন্দা করা, সোভিয়েত যুক্তির অসারত্ব প্রদর্শন নয়। তাছাড়া, কিয়েভে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণদের মৃত্যুর কথা জানত বলে আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটি কখনও স্বীকার করেনি।

১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে আমাকে আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদের চতুর্থ সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের প্রেস অফিসার হিসাবে কায়রো পাঠানো হয়। আমার কাজ ছিল স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলা এবং প্রচার কার্য চালানো। এই সম্মেলনগুলো ততদিনে আমার কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। ফলে বিদেশ ভ্রমণের আনন্দ অর্ধেকই উবে গেল। সেই একঘেয়ে কাজ, এশীয় এবং আফ্রিকান প্রতিনিধিদলগুলোকে পটানোর অক্লান্ত চেষ্টা। মুষ্টিমেয় আফ্রিকান মুক্তিসংগ্রামী গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রায়ই বেধে যেত সংঘাত। অসুবিধা দেখা দিত পিএলও'র পছন্দ অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণের ব্যাপারে।

সন্ধ্যায় লেগে থাকত পার্টি। কায়রোর প্রাসাদোপম শেরাটন হোটেলে উঠেছিলাম আমরা। অত্যন্ত ব্যয়বহুল হোটেল। এই হোটেলে সব প্রতিনিধিদলের অবস্থানের যাবতীয় খরচ বহন করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। পয়সার দুশ্চিন্তা না থাকায় প্রতিনিধিরা বার-এ ভিড় জমিয়ে দেদার মদ গিলতে থাকে, রুম সার্ভিস নেয় ইচ্ছামত, যে কোনও খাবার ও মদের অর্ডার দেয়।

সোভিয়েত অভিমত ও প্রস্তাব অন্ধের মত অনুমোদন করিয়ে নেয়ার জন্য বিদেশীদের এভাবে ঘুষ দেয়া আর ফুর্তি-আমোদের সুযোগদানের রীতি মোটেই ভাল লাগেনি আমার। জানতাম যে, এরকম অনুভূতি বিপদে ফেলে দিতে পারে আমাকে। তাই পরিত্রাণের একটা উপায় খুঁজতে লাগলাম। উপায় তেমন ছিল

না আমার সামনে। একজন আমেরিকান যা মুহূর্তে করতে পারে আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। সে পারে কাজটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু খুঁজে নিতে। আমি যদি তা করি তাহলে সব অফিসে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে এ কাজটা ছেড়ে দিলাম কেন। গ্রহণযোগ্য কোন জবাবই আমি দিতে পারব না।

আমার জাপান থেকে ফিরে আসার মাস সাতেক পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল দোলাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন কমিটির সদর দফতরের এক কাফেতে তাঁর অতিথি হবার জন্য। দোলাদ কেজিবি'র লোক। আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির হয়ে গোয়েন্দার কাজ করতেন।

বাকপটু লোক দোলাদ। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, 'তোমাকে দেখে মনে হয়, আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির কোন না কোন ব্যাপারে তুমি হতাশ হয়েছ, তাই না?'

জবাবে কিছু বললাম না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, 'হতাশ যদি হয়ে থাকো তবে দোষ দেব না তোমাকে। আমি যতটা জানি, এ প্রতিষ্ঠানটা বিরক্তিকর আমলাতান্ত্রিক এবং ভুয়া। তোমার দরকার হচ্ছে সত্যিকারের কাজের মত কাজ।'

বলতে বলতে গ্লাসটা তুলে তাকিয়ে রইলেন দোলাদ অবশিষ্ট মদটুকুর দিকে। শেষে আবার মুখ খুললেন। এবার গলার স্বর এবং বলার ভঙ্গিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমি সতর্ক হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, 'লেভচেঙ্কো, আমি খোলাখুলি কথা বলব তোমার সঙ্গে। আমি কেজিবি অফিসার। ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেট-এর সাথে যুক্ত। তোমার ওপর নজর রাখছিলাম। আমি মনে করি, তুমি একজন ভাল গোয়েন্দা অফিসার হতে পারবে। আমার বিশ্বাস কেজিবি'তে কাজ করে আনন্দ পাবে।'

আমার জানা ছিল যে, ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেট (এফসিডি) হচ্ছে কেজিবি'র বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখার ছদ্মনাম। ওটার কাজ হলো গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

'এখন যা বলছি, তাতে বিস্মিত হয়ো না,' হেসে বললেন তিনি, কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যেই তোমার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পরীক্ষা করে ও মিলিয়ে দেখেছি। ফলাফল ইতিবাচক। সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টরেট তোমার কাজের প্রশংসা করেছে। তোমার কাজে ওরা আসলেই খুব সন্তুষ্ট। বিশেষ করে, ৬০-এর দশকে ওদের হয়ে যে একটি কাজ তুমি করেছ তাতে আমাদের খুব ভাল ধারণা হয়েছে তোমার ওপর।

জানতাম আমার কোন্ কাজের কথা তিনি বলছেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে

গ্রু-র মিলিটারি প্রশিক্ষণ লাভের পর দ্বিতীয় চীফ ডাইরেক্টরেট আমাকে একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেয়।

আমাকে তলব করা হয় কেজিবি হেড কোয়ার্টারের পাশে হোটেল বার্লিনে। যে কোন ইউরোপীয় হোটেলের মত একটি স্যুটে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম নিখুঁত পোশাকধারী মাঝারি আকারের একজন বসে আছেন। মুখে ডানহিল পাইপ। পরিচয় দিলেন কেজিবি'র কর্নেল আজিজভ বলে। আমাদের আলাপ হলো সংক্ষিপ্ত। আজিজভ আমাকে বললেন যে, আমার সম্পর্কে সব খবরই কেজিবি রাখে, আমার প্রতিটি পদক্ষেপই তাদের নখদর্পণে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ আমাকে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছে তা-ও জানে তারা। 'এখন তোমাকে আমাদের দরকার,' বললেন তিনি, 'আমরা তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেব।' তাঁর কথায় বুঝলাম সম্প্রতি মস্কো আগত দু'জন জাপানী কূটনীতিককে রিক্রুট করার ব্যাপারে সাহায্য করাই হবে আমার কাজ। আমাকে ওদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে হবে, যতটা সম্ভব ঘন ঘন দেখা করতে হবে ওদের সঙ্গে এবং কাজ কেমন চলছে তা রিপোর্ট করে জানাতে হবে। কেজিবি ইতোমধ্যেই লেগে গেছে ওদের পিছনে। খুঁটিয়ে দেখছে কোথায় কোথায় ওদের দুর্বলতা। তবে জাপানী ভাষায় আমার দক্ষতা এবং জাপানীদের সাথে মেলামেশায় আমার অভিজ্ঞতা তাদের প্রয়োজন।

'ওদের একজন বোধহয় সমকামী। যে সব বেশ্যার সাথে আমরা পরিচয় করিয়ে দিয়েছি তাদের কারও সাথেই শোয়নি। ওর অ্যাপার্টমেন্টের সব ঘরে আমরা নজর রাখি বলে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে কাজটা করা হয়। 'অদ্ভুত ব্যাপার! ব্যাটা হস্তমৈথুনও করে না।'

তিনি আরও বললেন যে, আমাকে একটা টিমের মধ্যে কাজ করতে হবে এবং টিমের কোন কোন লোককে—বেশ্যা ও কালোবাজারীদেরকে আমার পছন্দ না-ও হতে পারে। কিন্তু তিনি আশ্বাস দিলেন যে, আমাকে কোন খারাপ ভূমিকা নিতে হবে না। আমাকে 'নিষ্কলঙ্ক' বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। কাজটা ভালভাবে করতে পারলে আমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়ে যাবে। তাঁরা আমার ক্যারিয়ারের উন্নতিতে সাহায্য করবেন। ঘনঘন জাপান সফরের সুযোগ পাব আমি। আমার মনে দ্বিধা জাগল। দ্বিধার ভাবটা বোধহয় চেহারায়ও ফুটে উঠেছিল, কারণ হঠাৎ তিনি আমার দিকে ঝুঁকে বললেন, 'প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান কোরো না। করলে বাকি জীবন পস্তাবে। মনে রেখো, আমাদের অনুমোদন ছাড়া তুমি কখনও মঙ্গোলিয়াতে পর্যন্ত যেতে পারবে না।'

তিনি কি বলতে চান বুঝতে কোন অসুবিধা হলো না। কেজিবি'র কালো

তালিকায় আমার নাম তুলে দেয়া মোটেও কঠিন নয় তাঁর পক্ষে। সেক্ষেত্রে আমি দেশের বাইরে কোন ভাল চাকরি বা দায়িত্ব পাব না। সহযোগিতা করতে রাজি হলাম। একটা কাগজে সই করে কর্নেল আজিজভের নির্দেশে চলতে সম্মত হলাম। ঠিক হলো যে আমি 'আর্থার' ছদ্ম নামে রিপোর্ট করব।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো ওই জাপানী তরুণ দু'টির সাথে। বহুবার গেছি ওদের কাছে, ওদের বন্ধু হয়েছি, ওদের অ্যাপার্টমেন্টে অনেক পার্টিতে যোগ দিয়েছি, ওদের মেয়ে বন্ধু—'কেজিবি'র দোয়াল'দের সাথে পরিচিত হয়েছি। আমার নতুন জাপানী বন্ধুদের একজন ছিল চরিত্রবান মানুষ। এটা আমি জানলাম এক অত্যন্ত দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। আজিজভ জানতেন যে, আমার এক বান্ধবী ছিল। লিউবা নামে এক আকর্ষণীয় তরুণী স্থপতি। আজিজভ জেদ ধরলেন আমি যেন মেয়েটিকে এ খেলার মধ্যে টেনে আনি। তাই করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেয়েটি ওই জাপানী তরুণের প্রেমে পড়ে গেল। ওদের রোমান্সটা ছিল সুন্দর নির্মল। কিন্তু আজিজভ চাইলেন লিউবা নিয়মিত রিপোর্ট করে সবকিছু, ওদের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ পর্যন্ত তাঁকে জানাক। মনের সাথে অনেক লড়াইয়ের পর লিউবা অস্বীকার করল ওর ছেলেবন্ধুর সাথে বেঈমানী করতে। আজিজভ হুমকি দিলেন যে, সহযোগিতা না করলে বয়ফ্রেণ্ডকে আর দেখবে না কোনদিন। লিউবা অনড় রইল। অবশেষে হেমন্তের এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে কয়েকজন গুণ্ডা লিউবার বাড়িতে গিয়ে বলল, 'ওই হলদেমুখো বানরটার সঙ্গে আরেকবার দেখা করলেই মরবে।' গুণ্ডাগুলো যে কেজিবি'র লোক এতে কোন সন্দেহ ছিল না। লিউবা তার জাপানী বন্ধুর সঙ্গে আর কখনও দেখা করেনি।

লিউবার সহায়তা না পেয়ে কেজিবিকে পরিকল্পনায় রদবদল করতে হয়। তারা একটা দুর্বলতার সন্ধান পায়। কূটনীতিকটি জুয়া খেলতে ভালবাসে এবং তাস খেলে। কেজিবি সিদ্ধান্ত নিল জুয়াতেই আর্থিকভাবে ফতুর করবে ওকে এবং তার পরে অর্থের বিনিময়ে কাজ আদায় করবে ওর কাছ থেকে।

আমাকে বলা হলো কেজিবি'র কাউন্টার ইনটেলিজেন্স (প্রতি গোয়েন্দা) বিভাগের ভ্লাদিমির নামের এক অফিসারের সাথে কূটনীতিকটির পরিচয় করিয়ে দিতে। ভ্লাদিমির ছিল তাস খেলার ওস্তাদ এবং পাক্কা চোর। কিন্তু বড় 'স্টেক' এ না খেললে তাসের কোন কোন খেলায় বেশি টাকা হারতে অনেক সময় লেগে যায়। তাই আজিজভ আমাকে হুকুম দিলেন, 'ওকে মাতাল করো, তারপরে ব্ল্যাকজ্যাক শুরু করো। খেলা শুরু হলে স্টেক বাড়িয়ে দিয়ে এক রাতেই কুত্তির বাচ্চাকে ফতুর করে দাও।' তাস খেলা আমি ভাল জানতাম না। ট্রেনিং নিতে

লাগলাম ভ্লাদিমিরের কাছে। সে আমাকে শিখিয়ে দিল কায়দা-কৌশলগুলো, কোন্ সময় কি ইশারা দেবে তা-ও বলে দিল।

আমরা গেলাম জাপানী কূটনীতিকদের অ্যাপার্টমেন্টে। কড়া মদ গিললাম প্রচুর। তারপর শুরু হলো খেলা। তরুণ জাপানী দু'জন অনেক রুবল হারল। ভোর পর্যন্ত চলল খেলা। ফেরার পথে ভ্লাদিমির কিছু রুবল আমাকে দিয়ে বলল যে, ওটা আমার পুরস্কার। জিজ্ঞেস করলাম জেতা রুবলের হিসাব দেবে কিনা কেজিবিকে। 'নরকে যাক ওরা। ওটা আমরা জিতেছি, একটা কাজ করেছি সফলভাবে। তাছাড়া, ওই রুবলের দরকার নেই ওদের,' জবাব দিল সে।

প্রায় বছর দুই পরে আমি ওই দুই জাপানী কূটনীতিকের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপারেশন থেকে ছাড়া পাই। পরে জেনে খুশি হয়েছি যে, কেজিবি ওদেরকে রিক্রুট করতে পারেনি। বহু বছর পরে ওদের একজনের সাথে আমার আবার দেখা হয়। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরের এক স্মরণীয় দিনে জাপানী কর্তৃপক্ষ নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমাকে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ করে। জাপানী বিদেশ মন্ত্রকের জেরাকারীদের একজন আমার সেই পুরানো বন্ধু। আমি ওকে মস্কোতে ওর অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। ওই ঘটনাটা সে ওর উপরওয়ালাদের জানিয়েছিল কিনা তা আমার অজ্ঞাত ছিল, তাই জিজ্ঞেস করে বিব্রত করতে চাইনি।

'ওই জাপানী কূটনীতিকদের ব্যাপারে তুমি যা কাজ দেখিয়েছ তার ফলে সোভিয়েত গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের দ্বার তোমার জন্য খোলা। অবশ্য, তোমার যদি ইচ্ছা থাকে,' দোলাদের কথায় আন্তরিকতার আভাস পেয়ে খোলাখুলি বলে ফেললাম, 'সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টরেটকে আমি ঘৃণা করি।'

'কেন?'

'ওটা জিজ্ঞেস করছেন কেন? স্তালিনের আমলে কেজিবি'র পূর্বসুরিরা কি নৃসংশ কাজ করেছে আপনি জানেন না? ভেবে দেখুন তো একবার! ওদের এখনকার পদ্ধতিও আমার ভাল লাগে না!'

'সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টরেট-এর ওসব গর্দভের কথা মোটেই ভাববে না,' বললেন তিনি, 'এবং ওদের কাজের সাথে গোয়েন্দা সার্ভিসের কাজের তুলনা করার চেষ্টাও করবে না। দুটো সংস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টরেট-এর হারামজাদারা ওদের নচ্ছার টিকটিকি আর চরদের নিয়ে এখানে দেশের অভ্যন্তরে ওদের নোংরা কাজ চালিয়ে যাক। তুমি হবে সেরা লোকদের একজন। কাজ করবে কেজিবি'র গোয়েন্দা অফিসার হিসাবে। একবার ভেবেই দেখো ব্যাপারটা, স্তান্স্লাভ! তুমি কাজ করবে দেশের বাইরে,

বিদেশের মাটিতে, গোপন তথ্য সংগ্রহ করবে, বিদেশী চর রিক্রুট করবে। নিজের দেশবাসীকে সাহায্য করার এ হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাহসিকতাপূর্ণ উপায়।'

এর পরে তিনি বললেন সেই কথাটি যা আমার খুব মনে ধরল। আন্তর্জাতিক বিভাগ আর এসসিডি'র সাথে কাজ করতে আমার এত ঘেন্না ধরে গিয়েছিল যে এতে আমি গলে গেলাম।

'এ হচ্ছে আসল পুরুষের কাজ,' বললেন তিনি, 'এ লাইনে কাজে মানুষ আঘাত পায়, গ্রেফতার হয়, অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়। সব সময় বিপদ মাথায় নিয়ে চলতে হয় তাদেরকে। গোয়েন্দা অফিসারদের হতে হয় ত্বরিতবুদ্ধি এবং শক্ত লোক, আসল মানুষ!'

'কোন্ দেশের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নিশ্চয় করে বলতে পারিনে, তবে তুমি জাপানের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। জাপানী ভাষা জানো, বহুবার গেছ ওদেশে। তাই এটা যুক্তিসঙ্গত যে তোমাকে সেখানেই পাঠানো হবে। সম্ভবত দুই কি তিন বছরের জন্য,' বললেন তিনি।

আমার হৃদয় নেচে উঠল আনন্দে। কেজিবি বিশাল প্রতিষ্ঠান। লাখ লাখ লোক। বাইরে থেকে এর জন্য ওরা খাটে। ভাড়াটে চর হিসাবে, চাকর হিসাবে, অনুগত পদলেহী হিসাবে। কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও অনিচ্ছায় পালন করে এর হুকুম। কিন্তু এই সংগঠনের সদস্যপদ সোভিয়েত নাগরিকদের তুলনামূলকভাবে কমই দেয়া হয়।

অত্যন্ত গোপন এই সংগঠনের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ খুব কম লোকই পায়। আমাকে যে সেই বিরল সুযোগটি দেয়া হচ্ছে তা বিশ্বাসই হচ্ছে না।

'দু'তিন দিন ভেবে নাও,' বললেন কর্নেল দোলাদ, 'তারপর এসো আমার অফিসে। তখন বিস্তারিত আলাপ করা যাবে।'

আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম যে, এ চাকরিটা নিলে আমার দেশবাসীর উপকার হবে এবং আমিও সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির যাঁতাকল থেকে রেহাই পাব। ঠাণ্ডা মাথায় প্রস্তাবটার ভাল-মন্দ সব দিক ভেবে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবচাইতে যে উত্তেজনাকর চিন্তাটা আমার মনে শ্যাম্পেনের বুদবুদের মত ফুটে উঠতে লাগল তা হচ্ছে এই যে, আমি জাপানে থাকব! দুই দিন পরে দোলাদের অফিসে গিয়ে বললাম যে, তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করব। তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে কয়েকটি ফরম দিল পূরণ করতে।

আমার নৈতিক ও আত্মিক শূন্যতা, দুর্বলতা কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে দোলাদের কোন ধারণা আছে বলে মনে হলো না। তাঁর বক্তব্য শেষ হবার

আগেই আমি বুঝে ছিলাম, আমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং আমাকে কি করতে হবে। এমনিভাবে টোপ গিলে আমি কেজিবি'র স্পাই হয়ে গেলাম।

শুরু হলো খেলা
মস্কো ঃ ১৯৭১-১৯৭৫

প্রায় মাস আটেক পরে আমার দরখাস্ত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমাকে তলব করা হলো ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেটের (এফসিডি) বিশেষ বোর্ডের সামনে হাজির হতে। যে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করা হলো তা আশ্চর্যজনকভাবে গতানুগতিক ও মামুলি। বোর্ডের সদস্যরা সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি এবং মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদ সম্পর্কে কিছু সহজ-সরল প্রশ্ন করলেন। কারণটা অবশ্য বুঝতে পারলাম। আমার সম্পর্কে তাঁদের খোঁজখবরে কোন ফাঁক ছিল না। সবই, আমার ভিতর-বাইরের সব খবর ছিল তাঁদের নখাগ্রে। বোর্ডের সামনে আমাকে হাজির করে তাঁরা কেবল যাচাই করে নিচ্ছিলেন যে আমার বিষয়ে যে সব তথ্য তাঁদেরকে জানানো হয়েছে সেগুলো যথার্থ কিনা এবং আমি মানুষটা আসলে দেখতে কেমন। ইন্টারভিউটা শেষ হতে না হতেই আমি অলৌকিকভাবে একজন তরুণ কেজিবি অফিসার হিসাবে রূপান্তরিত হলাম। ক্রেমলিনের অদূরে দ্‌ঝারঝিনস্কি স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রকাণ্ড, বিশাল, ধূসর রং-এর বাড়ি। বাড়িটার গায়ে কোন চিহ্ন বা পরিচিতি লেখা নেই। স্কোয়ারের মাঝখানে চির নীরবতার মধ্যে দণ্ডায়মান একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি। মূর্তিটা সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশের প্রথম অধিকর্তা 'আয়রন ফেলিক্স' দ্‌ঝারঝিনস্কির।

১৯৭১-এ কেজিবিতে যোগ দিয়ে আমি প্রথমবার যাই সদর দফতরে। ওখানে সব কিছুর মধ্যে গাম্ভীর্য। ফটোর সঙ্গে আমার মুখ মিলিয়ে দেখল যে শান্ত্রীটি, পুরানো ক্যাঁচক্যাঁচ করা লিফ্‌ট, দীর্ঘ ছায়াচ্ছন্ন পুরানো কার্পেট পাতা করিডোর, বেসামরিক পোশাক পরা মোটা তাজা ভদ্র অফিসার, সবার মধ্যে ছড়িয়ে আছে এই গাম্ভীর্য। অধিকাংশের মুখে গোপনীয়তা, প্রজ্ঞা ও

রহস্যময়তার ছাপ দেখে বিস্মিত হলাম। ওই সব মুখে যে উচ্চতর জ্ঞানের অভিব্যক্তি তা বুঝতে বেশ সময় লাগল আমার। প্রতিটিমুখ যেন বলতে চায়: 'আমি যা জানি তা কখনও তুমি জানবে না।'

সত্যি তারা এমন বিষয় জানে যা বেশির ভাগ মানুষ কোনদিন জানতে পারবে না। আমেরিকায় প্রথম এসে আমেরিকানদের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমি বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ি কেজিবি' সম্পর্কে তারা কত কম জানে তা দেখে। মুক্তবিশ্বের প্রতি কেজিবি কত বড় হুমকি সে সম্পর্কে আমেরিকানদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমার বিস্ময়টা ভেঙে দিলেন বছর কয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রে আগত আরেক রাশিয়ান। আমাকে বললেন, 'ওরা এসব জানবে এটা তুমি আশা করতে পারো না। খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নেও কেজিবি সম্পর্কে আসল তথ্য খুব কম লোকেই জানে।'

তাঁর কথা অবশ্য ঠিক। এরপর থেকে আমার বক্তৃতায় ওই হুমকিটা কি ধরনের তা বোঝাবার জন্য প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরি।

যেমন আমি বলি, সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশ, যার এখনকার নাম কেজিবি, সংগঠিত হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের মাত্র দু'মাস পরে। তখন ওটার নাম ছিল 'চেকা'। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির লেনিনের ব্যক্তিগত নির্দেশেই এটা গঠিত হয়েছিল। গুপ্ত পুলিশের দরকার হয়েছিল কেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের? এ প্রশ্নের জবাব বিপ্লবের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিপর্যয় ডেকে আনে রাশিয়ায়। অরাজকতা, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি আর লুটতরাজে জনগণের জীবনে সৃষ্টি করে সীমাহীন দুর্দশা। দুর্ভিক্ষের শিকার হয় অগনিত নরনারী। জনগণের আর্থিক দুর্গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্নীতিগ্রস্ত ও আমলাতান্ত্রিক জার সরকারের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভও বাড়তে থাকে। সামাজিক আবহাওয়া উত্তরোত্তর উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে।

অক্টোবর বিপ্লবের আট মাস আগে, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটা গণবিপ্লব ঘটে। আলেকজাণ্ডার কেরেনস্কির নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকার জনগণকে সকল মানবিক অধিকার প্রদান করে। ওরকম স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র রুশ জনগণ তাদের ইতিহাসে আর কখনও ভোগ করেনি। কিন্তু নতুন গণতান্ত্রিক সরকার যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়। দেশে বিদ্যমান ধ্বংসাত্মক অরাজকতা ও নৈরাজ্য বন্ধ করতে বা নিয়ন্ত্রণ করতেও ব্যর্থ হয় এ সরকার।

কেবল একটি মাত্র পার্টিরই ছিল পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী। বলশেভিকরা ছিল চরমপন্থী বুদ্ধিজীবী। ওদের ছিল গোপন কার্যকলাপের অভিজ্ঞতা। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অল্প কিছুকাল আগে কমিউনিস্ট পার্টি দুই উপদলে বিভক্ত হয়। এক উপদলের নাম হয় বলশেভিক বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, অপর দল পরিচিতি লাভ করে মেনশেভিক বা সংখ্যালঘিষ্ঠ দল। আসলে এ শব্দগুলো বিভ্রান্তিকর, কারণ পার্টি সদস্যদের প্রায় ৫০ হাজার যোগ দেয় মেনশেভিকদের দলে, আর মাত্র ১০ হাজার থাকে বলশেভিকদের দলে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব বলশেভিকদের নেতা লেনিনকে হতভম্ব করে দিয়েছিল। তিনি তৈরি ছিলেন না ওটার জন্য। ক্ষমতা দখলের জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাঁকে। দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে তিনি কতগুলো শ্লোগান তৈরি করেন। অধিকাংশ খুবই সাদামাঠা, এমনকি ওরওয়েলীয়, কিন্তু তা হলেও জনগণের কাছে আকর্ষণীয়ঃ 'জনগণের জন্য খাদ্য চাই', 'জার্মানির সাথে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থামাও', 'শোষকরা নিপাত যাক'। জনসাধারণ এসব শ্লোগান সমর্থন করলেও বলশেভিকদের কর্মসূচী কি তা জানত না। এই অজ্ঞতার জন্য তাদের অনেককেই পরে অত্যন্ত চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লবে জয়যুক্ত হবার পর লেনিন ও তাঁর অনুসারীরা এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ক্ষমতা দখল করে বলশেভিকরা দেখল যে, ওটা ধরে রাখা খুবই কঠিন। 'প্রাক্তন শোষক'দের ওপর সর্বহারার একনায়কত্ব কায়েমে দেরি করেননি লেনিন। এই 'শোষকরা' ছিল অভিজাত শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী বহির্ভূত জনগণ। স্পষ্টত, এই একনায়কত্ব বলবৎ করার জন্য বলশেভিক পার্টি ও তাদের সরকারের প্রয়োজন ছিল একটা হাতিয়ার। এভাবেই জন্ম হয় চেকার।

লেনিনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন দ্‌ঝারঝিনস্কি। তাঁকে করা হয় চেকার অধিকর্তা। জন্মসূত্রে পোলীয়, স্বেচ্ছাক্রমে পেশাদার বিপ্লবী এবং জারের জেলখানার পুরানো বাসিন্দা এ মানুষটির নির্বাচন ছিল নিখুঁত। নিষ্ঠুরতার জন্য পার্টি সদস্যরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'আয়রন ফেলিক্স'। তাঁর প্রথম করণীয় হয় বলশেভিক পার্টির মধ্যে শুদ্ধি অভিযান চালানো। পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর তিনি এই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, জারের পুলিশ (ওখ্‌রানা নামে পরিচিত জার-পুলিশ বাহিনীর প্রতিগোয়েন্দা বিভাগ) বলশেভিক পার্টির গভীর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং ১৯০০ সাল থেকে এই অনুপ্রবেশ অব্যাহত ছিল। মস্কো পার্টি সংগঠনে লেনিনের প্রধান প্রতিনিধি ম্যালিনভস্কি নিজেই ছিলেন ওখ্‌রানার এজেন্ট। বলশেভিক পার্টির সরকারী মুখপাত্র প্রাভ্‌দার সম্পাদক এবং

কোষাধ্যক্ষও ছিলেন ওখ্‌রানার বেতনভুক। উন্মাদনাগ্রস্ত বলশেভিক পার্টি (পরে কমিউনিস্ট পার্টি) নেতারা নিঃসন্দেহ হন যে, পার্টির অভ্যন্তরেই রয়েছে শত্রু। চেকা তার অস্তিত্বের প্রথম দিকে এসব তথ্য উদ্‌ঘাটন করাতেই এরকম সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে যায়।

ভিন্ন মতাবলম্বীদের উৎখাত করার জন্য চেকা এক বিরাট অভিযান চালায় (এখন এটা লাল সন্ত্রাস নামে পরিচিত)। অক্টোবর বিপ্লবের বিরোধীতাকারী লাখ লাখ লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। হাজার হাজার মানুষ স্রেফ অদৃশ্য হয়ে যায় শুধু শ্রেণীগত কারণে, অর্থাৎ অভিজাত বা সচ্ছল শ্রেণীতে জন্মের কারণে। বলশেভিকরা চেকাকে বিপ্লবের প্রতিশোধ গ্রহণকারী তলোয়ার আখ্যা দেয়। সরকারের নিরাপত্তা দৃঢ়তর হবার পর চেকা খোদ বলশেভিক পার্টির সদস্যদের, যারা কোন না কোন ভাবে নেতাদের সাথে একমত হতে পারেনি, তাদেরকে অধিকতর সংখ্যায় গ্রেফতার করতে শুরু করে। ১৯২০-এর দশকের শেষ দিকে চেকা হয়ে পড়ে দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভীতিকর সংস্থা। বিতাড়িত বলশেভিক নেতা ত্রৎস্কির হাজার হাজার অনুগামীকে জেলে বা বন্দী শিবিরে প্রেরণ করা হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে স্তালিনের হুকুমে সোভিয়েত নিরাপত্তা পুলিশ আধুনিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব রক্তাক্ত সন্ত্রাসী অভিযান চালায়। এতে দু'কোটির মত সোভিয়েত নাগরিক নিহত হয়। স্তালিনের আমলে নিরাপত্তা পুলিশের নাম পরিবর্তিত হয় কয়েকবার। চেকা থেকে ওগপু, ওগপু থেকে এনকেভিডি-পিপলস্ কমিশারিয়েট ফর ইন্টারন্যাল অ্যাফেয়ার্স। তারপরে হয় এমজিবি, মানে, মিনিস্ট্রি অব স্টেট সিকিউরিটি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, গুপ্ত পুলিশ হয়ে দাঁড়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রধান খুঁটি। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরোধিতা বা ভিন্নমতের কোন চিহ্ন দেখলেই গুপ্ত পুলিশ নিমিষে তা নির্মূল করে দিত। কোন নিয়মরীতি বা বাধানিষেধ ছিল না এর ওপর। এটা ছিল আইনের উর্ধ্বে এবং এখনও আছে। এটা পরিণত হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বের নির্মম হাতিয়ারে। নতুন সামাজিক শ্রেণী কমিউনিস্ট পার্টির ওপরের স্তরের লোকজন এবং অক্টোবর বিপ্লব থেকে সৃষ্ট সরকারী আমলাতন্ত্রের সদস্যবৃন্দের স্বার্থরক্ষার জন্য নিজস্ব জনগণকে দমিয়ে রাখার কাজে এ হাতিয়ারকে ব্যবহার করা হয় যদৃচ্ছভাবে।

বেশিরভাগ আমেরিকান কেজিবিকে গোয়েন্দা সংস্থা সংক্রান্ত তাদের নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী, সম্ভবত সিআইএ সম্পর্কে যেটুকু জানে তার ভিত্তিতে বিচার করতে চায়। কিন্তু কেজিবি নামে পরিচিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিটির বহুমুখী কার্যকলাপের মধ্যে বিদেশে গুপ্তচরবৃত্তি ও গোয়েন্দা কার্যক্রম চালানোর স্থান

তুলনামূলকভাবে গৌণ। এই বিশাল দমনমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। বিদেশী এজেন্ট ও তথ্য যোগানদারদের হিসাবে নিলে কেজিবি'র জন্য যারা কাজ করে তাদের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। মুক্ত বিশ্বের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তৎপরতা আইনগতভাবে সীমিত ও নিয়মাবদ্ধ। তাদের কোনটার সাথে বিশ্বের এই বৃহত্তম গুপ্ত সংস্থাটির তুলনা হতে পারে না। কেজিবিকে জবাবদিহি করতে হয় একমাত্র সোভিয়েত পলিটব্যুরোর কাছে। পলিটব্যুরোই এর প্রায় সীমাহীন তহবিল নিয়ন্ত্রণ করে। পক্ষান্তরে, সিআইএকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস। কেজিবি কি জিনিস, কি করতে চায় এবং কিভাবে করতে চায় তা বোঝাবার জন্য আমি এত কথা বলছি। একমাত্র এভাবেই, মুক্ত বিশ্বকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে এবং মুক্ত মানুষদেরকে আমি যা-যা জানি তা বলে দিয়েই আমার ঋণ পরিশোধ করতে পারি।

কেজিবি'র ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেটে যোগ দেয়ার পর আমার নতুন কাজ হয় বৈদেশিক গুপ্তচরবৃত্তি। কেজিবি অফিসার হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে প্রথমেই আমাকে জেনে নিতে হয়, চেকা কিভাবে প্রথম বৈদেশিক গোয়েন্দা তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ে এবং কেজিবি'র অধীনে সেটা কিভাবে বিকাশ লাভ করে। আমি জেনে গেলাম যে, চেকা প্রথমে গড়ে ওঠে সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণ তদন্ত ও সন্ত্রাসী সংস্থা হিসাবে। অত্যন্ত দ্রুত ওটা বৈদেশিক গোয়েন্দা কার্যক্রমে প্রবেশ করে। ১৯২০-এর দশকে ওটা ছড়িয়ে পড়ে বহির্বিশ্বে। দুই স্তরে কাজ শুরু করে। প্রধানত, কমিন্টার্নের (আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন) সদস্যদের এজেন্ট বানিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিদেশে গুপ্ত তৎপরতা চালাতে থাকে। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্স, জার্মানি, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও পোল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণকারী রুশ গ্রুপগুলোর মধ্যে চেকা অনুপ্রবেশ শুরু করে। জার্মানি ও ফ্রান্সের সবচেয়ে সক্রিয় সোভিয়েত বিরোধী রুশ দেশান্তরী গ্রুপের মধ্যে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয় চেকা। এ গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত সোভিয়েত বিরোধী নেতা প্রাক-বিপ্লব সন্ত্রাসবাদী বোরিস সাভিনকভ। তাঁর নেতৃত্বে এ গ্রুপগুলো সামরিক ও রাজনৈতিক গোপন তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এবং নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য দলে দলে লোক পাঠাত সোভিয়েত রাশিয়ায়।

চেকা সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে তার শত শত এজেন্টকে নিয়ে এক ভুয়া প্রতিবিপ্লবী সংগঠন তৈরি করে সুপরিকল্পিতভাবে সাভিনকভের তৎপরতা ভণ্ডুল করে দিতে সক্ষম হয়। 'অপারেশন ট্রাস্ট' নামে পরিচালিত এই অভিযানের ফল হিসাবে প্রলুব্ধ হয়ে বোরিস সাভিনকভ সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রবেশ করেন এবং প্রবেশের সাথে সাথেই ধরা পড়েন। দীর্ঘমেয়াদে কারাদণ্ডিত

হন তিনি। বছর কয়েক পরে চেকা খুব সযত্নে সাভিনকভের জন্য একটা আত্মহত্যার পরিকল্পনা তৈরি ও কার্যকর করে। ওই একই 'অপারেশন ট্রাস্টে' গ্রেট ব্রিটেনের অন্যতম সেরা গোয়েন্দা অফিসার সিডনি রেইলীও প্রতারিত হয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রবেশ করে ধৃত হন এবং গুপ্ত পুলিশের কারাগারে প্রাণ হারান।

চেকা খুব দ্রুত তার বৈদেশিক তৎপরতা সম্প্রসারিত করে। ১৯৩০-এর দশকে চেকা'র বৈদেশিক গোয়েন্দা সার্ভিসের সুদক্ষ এজেন্টরা অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে সফলভাবে তৎপরতা চালাতে থাকে। তৃতীয় রাইখের প্রতি-গোয়েন্দা সংস্থা গেস্টাপোসহ নাজী জার্মানির সব সরকারী দফতরে সোভিয়েতরা তাদের এজেন্ট বসিয়ে দেয়। জাপানে নিযুক্ত এরকম একজন এজেন্ট ছিল রিচার্ড সোর্গ। বিখ্যাত এই গোয়েন্দাটি টোকিওতে অবস্থিত জার্মান দূতাবাসে অনুপ্রবেশে সমর্থ হয়। একজন জার্মান সংবাদিকের নাম পরিচয় নিয়ে সোর্গ কাজ করত জাপানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর নাজী জার্মানির পরিকল্পিত আক্রমণের কথা (১৯৪১ সালের জুন) কয়েক সপ্তাহ আগেই সোর্গ জানিয়ে দিয়েছিল সোভিয়েত নেতৃত্বকে। আমি সব সময় রিচার্ড সোর্গের সাথে একাত্মতা অনুভব করতাম। কারণ আমিও কতিপয় সোভিয়েত সাময়িকীর প্রতিনিধিরূপে জাপানে গোয়েন্দাগিরির কাজ করতাম।

মহাসন্ত্রাসের এই ভয়াবহ যন্ত্র, লাখ লাখ জীবন ও লাখ লাখ মানুষের ভবিষ্যৎ বিনষ্টকারী এই শয়তানী মেশিনটি নিজেও রক্ষা পায়নি স্তালিনের শুদ্ধি অভিযান থেকে। সর্বোচ্চ সোভিয়েত একনায়ক স্তালিন চেষ্টা করেন চেকা'র এমন সব লোকদের নির্মূল করতে যারা তাঁর গণবিরোধী অপরাধগুলো সম্পর্কে জানত। হাজার হাজার সোভিয়েত গোয়েন্দা অফিসার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় শুধু একারণে যে, তারা বড় বেশি জানত।

১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশকে পুর্নগঠন করে এর নাম দেয়া হয় কেজিবি। তথাকথিত অ-স্তালিনীকরণ অভিযানের সময় সোভিয়েত নেতা নিকিতা খ্রুশ্চভ সোভিয়েত জনগণকে বারে বারে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে শুদ্ধি অভিযানগুলো স্তালিনের এবং সোভিয়েত নিরাপত্তা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের হিংসা পরায়ণতার ফল। খ্রুশ্চভের ভাষ্য অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টির ওসবে কোন হাত ছিল না। স্তালিন ও চেকা যেসব নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন সে বিষয়ে অধিকাংশ পার্টি সদস্য কিছুই জানতেন না। কিন্তু খ্রুশ্চভ মিথ্যা বলেছিলেন। চেকা ছিল কমিউনিস্ট পার্টিরই একটি বাহু।

কেজিবিও তাই, পার্টি নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত একটি অনুগত হাতিয়ার। খ্রুশ্চভের বচন মুহূর্তের জন্যও কেউ বিশ্বাস করেনি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক গোয়েন্দা সার্ভিসে, কেজিবি'র ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেটে প্রবেশ করলাম আমি। ওদের অফিসগুলো মস্কোর কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে, শহরতলীর ইয়াসেনেভো জেলায়। সুন্দরভাবে নির্মিত অফিস কমপ্লেক্স। ভার্জিনিয়ার ল্যাংলীতে অবস্থিত সিআইএ সদর দফতরের মত। জনরবে প্রকাশ, খ্রুশ্চভের ইচ্ছাতেই নাকি ল্যাংলীর সিআইএ হেডকোয়ার্টারের অনুকরণে এটা নির্মিত হয়েছিল আমেরিকানদের প্রতি ঠাট্টা হিসাবে।

মস্কোর বাইরের জঙ্গলে চারতলা এক ভবনে অবস্থিত কেজিবি'র বৈদেশিক গোয়েন্দা স্কুলের ছাত্র হলাম। ভবনের চারপাশে সাদা পোশাকে কেজিবি অফিসাররা টহল দেয় সারাক্ষণ। রাতে ওদের সঙ্গে থাকে পাহারাদার কুকুর। চারদিকে ছয়ফুট উঁচু দেয়াল। ওপরে কাঁটাতারের বেড়া। আমাদের প্রায়ই মনে হত যে, স্কুল তো নয়, ওটা যেন এক কারাগার। আমাদের শিক্ষার বিষয়গুলোর গুরুত্ব বোঝাতে শিক্ষকরা বহু কায়দা-কৌশলের আশ্রয় নিতেন। যেমন, নিজেদের আসল নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। সহপাঠীদের সাথে পরিচয় হলেও জানতাম যে, শিক্ষা শেষে আমরা হারিয়ে যাব এক ধরনের অদৃশ্য জগতে, যেখানে মুখগুলো মনে থাকবে, কিন্তু নাম পরিচয় মনে থাকবে না। ওই স্কুলে থাকাকালে আমার নাম ছিল লিভেঙ্কো।

রুটিনটা ছিল বড় কঠোর। সকাল ৮টায় শরীরচর্চা, ক্লাস শেষ হত সন্ধ্যা ৬ টায়, রাতে তিন-চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে পড়াশোনা। এক বছর ধরে চলে এই প্রশিক্ষণ। আমি মনোযোগ দিয়ে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি।

অন্য যে কোন জটিল পেশার মত গুপ্তচর বৃত্তিও শিখতে হয়। একেবারে রপ্ত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অনুশীলন করে যেতে হয় এর কায়দা-কৌশলগুলো। বহু কিছু, বহু নৈপুণ্য অর্জন করতে হয়। কিভাবে কার ওপর নজর রাখতে হয়, প্রতিগোয়েন্দার কাজ করতে হয়, ইলেকট্রনিক বস্তু ব্যবহার করতে হয়, মনস্তাত্ত্বিক টেকনিক প্রয়োগ করতে হয় এবং কিভাবে 'প্রভাবিত' করতে হয় তা শিখিয়ে দেয়া হয় আমাদেরকে। আমাদেরকে বারে বারে বলে দেয়া হয় যে, গোয়েন্দা-তথ্য সংগ্রহের কাজ সব সময়েই ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন। বলা হয়, আমাদের পেশাগত জীবন হবে কষ্টকর, শ্রমসাধ্য এবং যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল। প্রত্যেক প্রশিক্ষকই বলেন যে, আমাদের এ পেশায় পুরোপুরি দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং সবকিছু শিখে নিতে হবে। কারণ আমাদেরকে বিদেশে কেজিবি'র আস্তানাগুলোতে পাঠানো হবে। সেখানে কাজ করতে করতে শিখে নেয়ার কোন

সময় পাওয়া যাবে না।

তাঁরা বার বার বলেন যে, কতক কাজ আছে যেগুলো এমনভাবে অনুশীলন করতে হবে যাতে পুরোপুরি আত্মস্থ হয়ে যায়, অভ্যাসে পরিণত হয়। গুপ্তচরবৃত্তির কয়েকটি দিক আছে যেগুলোর বিকাশে স্বভাবজাত মেধা দরকার হয়। নজর রাখার কাজটি সবাই পারে, কিন্তু দলে টানার মত লোক খুঁজে বের করা ও তাকে রিক্রুট করা অনেকটা কঠিন। আমি পরে দেখেছি যে, ওই মেধাটা আমার রয়েছে। জাপানে কয়েক বছর ধরে ওই কাজটাই করেছি সফলভাবে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের প্রধান প্রধান গোয়েন্দা ও প্রতিগোয়েন্দা সংস্থার সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ক্লাস নেয়া হত। ওসব ক্লাসে উপস্থিত থাকতাম। এ বিষয়ের ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন লেঃ কর্নেল হালতুইয়েভ। সিআইএ, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-১৬, ফরাসী ও জার্মান বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার পেশাদারী দক্ষতা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা দেন। আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এবং ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ ও পশ্চিম জার্মান প্রতিগোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্যকলাপ সম্পর্কেও তিনি বলেন। ওরা কেজিবি'র তৎপরতা বন্ধ করতে না পারলেও তাদের দেশে কর্মরত কেজিবি ও গ্রু'র এজেন্টদের ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলে।

উচ্চপদস্থ জনৈক কেজিবি অফিসারের বক্তৃতায় আমি প্রথম বুঝতে পারি গোয়েন্দাবৃত্তির ঘাঁটি হিসাবে জাপানের গুরুত্ব। বুঝতে পারি জাপান কেন কেজিবি'র গোপন সামরিক, রাজনৈতিক, উচ্চ প্রযুক্তিগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। মুক্ত বিশ্বের অন্য প্রধান প্রধান দেশের প্রতিগোয়েন্দা সার্ভিসগুলো বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্যাদি সংগ্রহকালে বহু সোভিয়েত গোয়েন্দাকে গ্রেফতার ও বহিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি থেকে বহিষ্কৃতদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু জাপানী প্রতিগোয়েন্দা সংস্থা দুর্বল। এ বিষয়ে বক্তা বলেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে পারে। ওখানে সেই প্রচেষ্টাকে কেবল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। জাপানকে আমরা প্রয়োজনীয় সব রকম তথ্য সংগ্রহের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করতে পারি। ওখান থেকে প্রচুর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক তথ্য আহরণ করতে পারি। এবং সেগুলো কেবল জাপান সংক্রান্ত হবে তা নয়। জাপানে বসে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ অন্যসব দেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।'

পরে দেখেছি, ভদ্রলোক সেদিন কমই বলেছিলেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এক টনেরও বেশি ওজনের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সরঞ্জাম আর তথ্যের চালান

জাপান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যেতে। আমাকে বলা হয়েছে, 'এ রকম চালান তো নিয়মিত যায়।' আমি বুঝতে পারি, জাপানকে লুটের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ কত বিরাট।

মাস কয়েক লেকচার শোনার পর আমাদেরকে নিয়ে যায় মস্কোতে। প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং-এর জন্য। নগরীর উপকণ্ঠে যুবোস্কায়া স্কোয়ারের কাছে এক রাস্তায় একটা বিশাল বাড়িতে রাখা হলো আমাদেরকে। বাড়িটা বাইরে থেকে একটু সেকেলে ও জরাজীর্ণ দেখায়। অক্টোবর বিপ্লবের আগের অভিজাতদের বাড়িগুলোর মত। ভিতরটা বিদেশে কেজিবি'র আস্তানাগুলো যেমন হয় ঠিক সেভাবে সাজানো। দুনিয়ার সব দেশে কেজিবি'র আস্তানাগুলো একই ধাঁচের হয়।

প্রতিদিন আমরা বাইরে যাই নির্দিষ্ট মিশনে। যোগাযোগ স্থাপন করি, অন্যের নজর এড়িয়ে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ বা মাস পরে যে কাজগুলো সত্যিকারভাবে করব তার কায়দা কৌশল আমরা রপ্ত করে নিচ্ছি। বেশ ভাল লাগল আমার এসব করতে গিয়ে। আমার চাইতে দক্ষ লোকদের সাথে বুদ্ধি ও দক্ষতার পাল্লা দেয়া বেশ উত্তেজনাকর। বুদ্ধির খেলায় বিপক্ষকে হারিয়ে দেয়ার চ্যালেঞ্জটা খুব প্রীতিকর মনে হলো।

যে কোন গোয়েন্দার মত দক্ষতা অর্জনে ট্রেনিং নিতে নিতে আমরা খালি বা ভর্তি কাগজপত্রের প্যাকেট কুড়িয়ে নেয়া বা রেখে দেয়া, জরুরী সাক্ষাতের জন্য সিগন্যাল দেয়া, কয়েক বাড়ি পরে ঘাপটি মেরে থাকা এজেন্টদের কাছ থেকে রেডিও মেসেজ গ্রহণ করা, অন্য এজেন্টদের কাছে প্রেরিত নির্দেশ পৌঁছে দেয়া ইত্যাদি শিখলাম। সবচেয়ে বড় কথা, কিভাবে টার্গেটকে অনুসরণ করতে হয় তার মহড়া দিলাম।

আমরা জানলাম যে, কাউকে অনুসরণের দু'টি কারণ থাকে। একটা হচ্ছে সে কোথায় যায় তা দেখার জন্য তাকে নজরে রাখা। দ্বিতীয়টি হলো হয়রানিমূলক। তার কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে জানিয়ে দেয়া যে, তার পিছনে লোক লেগেছে। দ্বিতীয় ধরনের অনুসরণ টার্গেটকে নার্ভাস করে দেয়। নার্ভাস হলেই সে ঘাবড়ে গিয়ে বোকার মত এমন কিছু করে বসে যা তার উদ্দেশ্যকে ফাঁস করে দেয়। একজন টার্গেটকে তার অজ্ঞাতে নজরে রাখা অনেক কঠিন কাজ। জনবহুল কোন শহরে কাজটা আরও কঠিন। এই কারণে কাজটা সাধারণত দলবদ্ধভাবে করা হয়। কোন এজেন্ট যদি তার 'টার্গেট' বা 'সাবজেক্ট'কে হারিয়ে ফেলে কিংবা 'সাবজেক্ট' যদি তাকে দেখে ফেলে তাহলে এজেন্টদের টিমের আরেকজন লোকটার পিছু নেয়। এই

পিছু নেয়া বা অনুসরণের কাজে খুব চতুরতার দরকার হয়। মস্কোতে আমরা বারে বারে পরস্পরের পিছু নিয়েছি।

আমাদেরকে বলে দেয়া হয় যে, গোয়েন্দাবৃত্তির প্র্যাকটিস করতে বের হলে সার্ভেল্যান্স (নিরীক্ষণ) ডাইরেক্টরেটের পেশাদার লোকেরা যে কোন সময় আমাদের পিছু নিতে বা আমাদের নজরে রাখতে পারে। যদি মনে হয় কেউ পিছু নিয়েছে বা নজর রাখছে তাহলে যেন আমাদের সন্দেহটা যথার্থ কিনা তা যাচাই করে দেখি। যদি নিশ্চিত হই যে, সন্দেহটা ঠিক তাহলে যেন সাক্ষাৎকার এড়িয়ে আস্তানায় ফিরে যাই। অনুসরণকারীকে দেখা মাত্রই যেন রিপোর্ট করি এবং কখন কিভাবে আমরা আমাদের সন্দেহটা যাচাই করে দেখেছি তা জানাই। অনুসরণকারীকে দেখতে না পেলে সেদিনের জন্য আমরা 'ফেল মার্ক' পাব। আবার, কেউ পিছু না নিলেও যদি কোন ছাত্র রিপোর্ট করে যে, তাকে অনুসরণ করা হয়েছে সে-ও ফেল করবে।

ছাত্ররা সঠিকভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারছে কি পারছে না সে বিষয়ে এজেন্টের এবং ছাত্রদের ওপর নজর রাখার কাজে নিয়োজিত অফিসাররা বিস্তারিত রিপোর্ট দেয় এবং তাতে ছাত্রদের যোগ্যতা, স্থিরতা, মনোবল ইত্যাদির মূল্যায়ন থাকে। এ পর্যায়ে পুরো মার্ক পেয়ে ট্রেনিং শেষ করা দুঃসাধ্য। আসলে স্কুলে বলাবলি হতে থাকে যে, কোন ছাত্র যদি পেশাদার গোয়েন্দাদের চোখে দু'বার ধুলো দিতে পারে তবে সেরা ছাত্র বলে গণ্য হবে।

এ সময়কার স্মৃতি আমার কাছে এখনও স্পষ্ট। আমার এজেন্টের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকার নির্ধারিত হয় শহরতলীর এক জনপ্রিয় রেস্তরাঁয়, ঠিক দুপুর বেলায়। সেদিন সকাল ৯-৩০ এ ঘর থেকে বেরিয়ে বাসে চড়ে চলে যাই 'গাম' ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। বাসের প্রত্যেকটি যাত্রীর চেহারা অলক্ষিতভাবে তাকিয়ে মনে রাখার চেষ্টার কথা এখনও স্মরণ আছে। বাস থেকে নেমে একটা পত্রিকা কিনে মেলে ধরি সামনে, যাতে যেসব যাত্রী নামছে তাদের দিকে নজর রাখতে পারি। সবাই ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, কেবল দু'জনকে দেখলাম আলাপে এমন গভীরভাবে মত্ত যে, কারও বা কোনদিকে তাদের মনোযোগ আছে বলে মনে হলো না। আমি স্টোরে ঢুকে মুহূর্তখানেক দাঁড়ালাম একটা কাউন্টারের সামনে। ঠিকই দেখলাম ওই দু'জনের একজন স্টোরে ঢুকল, কাউকে খুঁজছে এমনভাবে তাকাল চারদিকে, তারপর চলে গেল অন্যদিকে।

এ সুযোগে আমি কিছু কেনাকাটা করলাম। খেলনার কাউন্টারে দশ মিনিট দাঁড়ালাম লাইনে। আলেকজাণ্ডারের সপ্তম জন্মদিবসের জন্য একটা বিশেষ খেলনা কিনে দাম দেয়ার জন্য আরেক লাইনে দাঁড়ালাম। মিনিট দশেক পরে

বের হলাম স্টোর থেকে। দেখলাম একটা লোক কাছেই পায়চারি করছে, যেন অপেক্ষা করছে বাসের জন্য। স্টোরে যাকে দেখেছিলাম তারই মত লম্বা-চওড়া। কিন্তু একটু বেশি বয়স্ক। চুলে পাক ধরেছে, মোটা গোঁফ, চোখে চশমা। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও বুঝলাম যে একই লোক। যে রেস্তরাঁয় আমার যাবার কথা তার বিপরীত দিকগামী এক বাসে উঠে পড়লাম। নেমে পড়লাম একটা ক্যাফের সামনে। লাঞ্চ খেয়ে সিনেমায় ঢুকলাম। সিনেমা দেখার পরে বেকারি থেকে একটা পাউরুটি কিনে বাড়ি ফিরে গেলাম।

ডি-ব্রিফিং-এ একজন কেজিবি কর্নেল আমাকে প্রশ্ন করলেন এ সম্পর্কে, অর্থাৎ আমি কেন নির্ধারিত রেস্তরাঁয় এজেন্টের সাথে মিলিত হইনি। জবাব দিলাম, 'আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছিল—তাই যাইনি। দু'জন লোক পিছু নিয়েছিল "গাম" স্টোর পর্যন্ত। ওদের একজন ভিতরে পর্যন্ত অনুসরণ করে আমাকে। তারপর কিভাবে যেন পোশাক বদলায় ও ছদ্মবেশ নেয়। স্টোর থেকে বেরিয়ে দেখি লোকটা বাস-স্টপে অপেক্ষা করছে আমার জন্য।'

ওটা যে একই লোক তা কিভাবে জানলে তুমি? ছদ্মবেশ পরা লোকটাকে চিনলে কেমন করে? প্রশ্ন করলেন কর্নেল।

'সোজা ব্যাপার,' জবাব দিলাম। জুতো জোড়া বদলাতে সে ভুলে গিয়েছিল।

সেদিন বিকালে দ্বিতীয়বার বেরুতে বলা হলো আমাকে। হকি খেলার মাঠে এক জনের সাথে মিলিত হতে হবে আমাকে। তিন ঘণ্টা ঘুরে বেড়ালাম মস্কোর চারদিকে। বারে বারে বাস বদল করলাম। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হলাম যে পিছনে কেউ লাগেনি। তারপর আইস-হকির মাঠে ঢুকে মিলিত হলাম নির্দিষ্ট লোকটার সাথে। হকিপাগল অন্য দর্শকদের মত দু'জনে বকবক করলাম সারাক্ষণ। খেলাটাও দারুণ জমেছিল। খেলা শেষ হবার পর ফিরে গেলাম ঘরে। বুঝতে পারলাম কারও নজরে পড়েনি।

এ রকম এক মিশনে তৃতীয়বার বেরিয়ে সত্যিকারভাবে ভড়কে গিয়েছিলাম। মস্কোর প্রাণকেন্দ্রে আরেক জনপ্রিয় রেস্তরাঁয় গেলাম এজেন্টের সাথে মিলিত হবার জন্য। পথে অনুসরণকারী কাউকে দেখলাম না। এজেন্টকে দেখে চিনলাম যে তিনি কর্নেল আলতিনোভ। কেজিবি'র লোক। জাপানে এক দুর্ঘটনায় আগুনে পোড়া যান। এখন মদে ডুবে থেকে দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। তাঁকে মস্কোতে ফিরিয়ে আনার পরে কোন প্রভাবশালী বন্ধুর কারণে তিনি বরখাস্ত হননি চাকরি থেকে; এখন এ ধরনের কাজ দেয়া হয় তাঁকে। দেখলাম, মদে চুর হয়ে বসে আছেন তিনি। মুশকিলে পড়ে গেলাম। ডিউটিরত

অবস্থায় তাঁর এ মাতাল হওয়ার ব্যাপারটা রিপোর্ট করলে দুর্ভাগা বুড়ো কর্নেলের চাকরি যাবে। আর যদি রিপোর্ট না করি এবং ঘটনাটা যদি কখনও জানাজানি হয়ে যায় তাহলে কর্তব্যে অবহেলা করার দরুন আমি নিজে বরখাস্ত হব। আমি চুপ করে থাকলেও মদের নেশা কেটে গেলে কর্নেল আলতিনোভইবা কি বলবেন তা-ও আমি জানি না।

কত বুঝালাম, কিন্তু মাতাল কর্নেল কিছুই শুনলেন না। কেবল বলতে লাগলেন আরেক বোতল ব্র্যাণ্ডি তাঁর চাই-ই। আর সে কি অনর্গল বকবকানি!

বারে বারে বলে গেলেন, তোমাকে বুঝতে হবে, তোমাকে জানতেই হবে কি অবস্থার মধ্যে আমি পড়েছিলাম। মারা পড়তে পারতাম, বলতে বলতে শুরু করলেন কান্না। চোখের পানি গাল বেয়ে পড়তে লাগল টেবিলে। অর্ধেক জাপানকে আমরা হত্যা করতে পারতাম। আর কেজিবি কি করত? দাঁত বের করে হাসত।

'হয়েছে, কর্নেল। এখন আমাদের বাড়ি যাওয়া দরকার?' বললাম যতটা সম্ভবত নিচু স্বরে।

'নো, বাড়ি যাব না। ওই হারামজাদাগুলোর কথা তোমাকে না বলে বাড়ি যাব না,' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'তোমাকে বুঝাতেই হবে।'

তাঁর কাহিনীটা অসংলগ্ন এবং দুর্বোধ্য। পরে অবশ্য আমি যতটা সম্ভব হয়েছে জেনে নিয়েছি কাহিনীটা। লোমহর্ষক কাহিনী। কর্নেল আলতিনোভ ছিলেন জাপানে। কাজ করতেন লাইন এক্স-এ। লাইন এক্স-এ ছিল বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তি ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে গোয়েন্দাবৃত্তিতে নিয়োজিত সোভিয়েত গোয়েন্দা শাখার নাম। এরা মস্কোস্থ কর্তৃপক্ষকে জানায় যে, জাপানী গবেষকরা বিষের প্রতিষেধক এবং কতিপয় রোগের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য মারাত্মক জীবাণু নিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। মস্কো কর্তৃপক্ষ হুকুম দেয় একটি বিশেষ জীবাণু চুরি করে পরীক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠাতে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলে দেন যে, জীবাণুটা যেহেতু খুবই মারাত্মক, তাই ওটা বিমানে পাঠানো চলবে না। তাঁরা ভয় করছিলেন, জীবাণুটিসহ বিমানটি কোন কারণে বিধ্বস্ত হলে ওটা ছড়িয়ে পড়বে এবং বহু লোকের মৃত্যু ঘটাবে। তাই টোকিওতে অবস্থিত কেজিবি দফতর আলতিনোভ আর জনৈক ড্রাইভারকে হুকুম দেয় ওই মারাত্মক জীবাণুভর্তি একটি বোতল সোভিয়েতের এক মালবাহী জাহাজে তুলে দিতে। জাপানের রাস্তায় যানবাহনের অন্তহীন স্রোত ও যানজটের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা বুঝবে যে সেখানে গাড়ি চালানো কি কঠিন ব্যাপার। যে কোন মুহূর্তে অসতর্ক কোন ড্রাইভার ধাক্কা দিতে

পারত তাদেরকে। আর দিলেই আলতিনোভের ভাষায়, বহুলোকের মৃত্যু ঘটতো। শেষ পর্যন্ত কোনমতে লোকটাকে দু'পায়ে দাঁড় করিয়ে বললাম, 'চলুন, কমরেড কর্নেল, আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাই।'

আমার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু আমার লৌহ আলিঙ্গন ছাড়াতে পারলেন না। ফিসফিস করে বললাম, 'ওরে হারামজাদা, বুঝতে পারছ না রেস্তরাঁর লোকেরা মিলিশিয়া ডাকতে যাচ্ছে? বিপদে পড়ে গেছি আমরা। তোমাকে বাড়ি যেতে হবে। এক্ষুণি যেতে হবে, বুঝেছ কুত্তির বাচ্চা?'

বাড়ি নিয়ে গেলাম তাঁকে। ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় খিল এঁটে বললাম, 'কর্নেল আলতিনোভ, আজ যা যা ঘটল এর কিছুই আমি আমার রিপোর্টে উল্লেখ করব না।' একটা বিশ্রি গাল দিয়ে লোকটা বসে পড়ল কৌচে।

ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছিলাম আলতিনোভ কি রিপোর্ট দেয় তা জানার জন্য। শেষ পর্যন্ত আমাদের বিভাগটা যিনি দেখাশোনা করতেন সেই কর্নেলটি আমাকে আলতিনোভের রিপোর্টটি দেখালেন। তিনি লিখেছেন, আমি যুক্তিসঙ্গত ও যথোপযুক্ত আচরণ করেছি, আমার মধ্যে তিনি একজন অভিজ্ঞ অফিসারের মত অন্তর্দৃষ্টি লক্ষ্য করেছেন এবং তিনি নিশ্চিত যে, কোন এজেন্টের মধ্যে আস্থার ভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমার আছে।

আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎকারটি ছিল দুপুর বেলায়। পাঁচ ঘণ্টা আগে, সকাল ৭ টায় বেরুলাম ঘর থেকে। উদ্দেশ্য যে কোন অনুসরণকারীকে ফাঁকি দেয়া, ঝেড়ে ফেলা।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমি যে বাসে উঠি তারই পিছনে লেগে যায় কয়েকটা করে ভন্না গাড়ি। অনুসরণকারীদের এড়াবার, ঝেড়ে ফেলার যত চালাকি বা কৌশল আমাকে শিখানো হয়েছে সবই প্রয়োগ করলাম। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠলাম, হুশ্ করে অফিস বা দোকানপাটের এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম, হঠাৎ অন্য দরজা দিয়ে বেরুলাম। অনেক কসরতের পরে।

শেষ পর্যন্ত ঝেড়ে ফেললাম ওদেরকে। পিছনে আর কোন অনুসরণকারীর চিহ্নও নজরে পড়ল না। সাড়ে এগারোটার দিকে পাতাল রেলগাড়িতে চেপে রওনা হলাম সেই রেস্তরাঁর দিকে—যেখানে এজেন্টের সাথে আমার মিলিত হবার কথা। আমার পাশের সীটে বসে আছে একজন মাঝ-বয়সী শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। চেহারা একেবারে দেবতাসুলভ। কিন্তু সেটা আমার মনের ভুলও হতে পারে। সে যা-হোক, ট্রেন থামার মুহূর্তে নেমে যাবার সময় আমার দিকে না তাকিয়ে ফিসফিস করে লোকটি বলল, 'কমরেড, তোমার পিছনে ফেউ লেগেছে।'

কথাটা বলেই লোকটা নেমে গেল ট্রেন থেকে। একবারও তাকাল না পিছনে।

চিন্তিতভাবে নেমে গেলাম পরের স্টপে। লোকটা কি সত্য কথা বলে গেল? মনে হলো সত্যিই বলেছে। নিশ্চয় সে এমন কিছু লক্ষ করেছে যা আমার নজরে পড়েনি। আমার ট্রেনিং-এর অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, অন্যকে অনুসরণ করতে গেলে লোকে এমন কিছু অদ্ভুত আচরণ করে যা অন্য লোকের চোখে পড়ে।

অনুসরণকারীর কাজ হলো তার সাবজেক্ট-এর নজরে না পড়ে অনুসরণ করা। তার জন্য অনুসরণকারীকে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়, কারণ তা না হলে সাবজেক্ট তাকে দেখে ফেলতে পারে। কেবল সোজাসুজি তাকিয়ে নয়, আড়চোখে তাকিয়েও। এ কারণে অনুসরণকারীকে কখনও কখনও ও মাথা নিচু করে ফেলতে, পিছনে হেলতে, দ্রুত পাশ ফিরতে হয়। যাকে অনুসরণ করা হচ্ছে, মানে সাবজেক্টটি, এসব লক্ষ্য না-ও করতে পারে, কিন্তু অন্যরা ঠিকই লক্ষ করে।

আমার সহযাত্রীটি ঠিকই বলেছে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি এজেন্টের সাথে দেখা না করে এক রেস্তরাঁয় খেয়েদেয়ে আস্তানায় ফেরার জন্য পাতাল রেলগাড়িতে উঠলাম। ট্রেনে ওঠামাত্রই মনে হলো যে, আমাকে লক্ষ করা হচ্ছে। কিভাবে এটা বুঝলাম জানি না। স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি যেন আমাকে বলে দিল যে, চারদিক থেকে নজর রাখা হয়েছে আমার ওপর।

পরে জেনেছি যে, মস্কোর গোটা পাতাল রেল ব্যবস্থাটাই তারযোগে এমনভাবে সংযুক্ত যে, অনুসরণকারীরা যে কোন লাইনে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এক ট্রেনে অবস্থিত অনুসরণকারীদল সামনে বা পিছনের যে কোন স্টেশনের অনুসরণকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং নতুন লোকদের হাতে সাবজেক্টকে তুলে দিয়ে নেমে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে একজন থাকে দৃশ্যমান। ওটা খেলার অংশ। আমি জানতাম একজন নজর রাখছে আমার ওপর, কিন্তু এক ঝুড়ি শসা নিয়ে বসে থাকা মোটাসোটা মহিলাটির দিকে লক্ষ করিনি।

এই ঘটনাটি রিপোর্ট করলাম। সবাই বললেন আমার বিবরণ সত্য। একজন অফিসার বললেন, 'এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিটাকে হেলা কোরো না। একেক সময় দেখবে ওটা সোনার চেয়ে দামী।' অনুসরণকারীদের একজনকেও শনাক্ত করতে পারিনি। এ কারণে সর্বোচ্চ ৫ নম্বরের বদলে আমাকে ৪ দেয়া হয়। অবশ্য আমার মোট নম্বরের পরিমাণ স্কুলটির ইতিহাসে কোন ছাত্রের পাওয়া নম্বরের চাইতে বেশি রয়ে গেছে আজ পর্যন্ত।

কেজিবি'র অধীনে আমার গোয়েন্দাবৃত্তি প্রশিক্ষণের বছরটি ছিল বেশ

কষ্টের। তবে অল্পদিনের মধ্যেই বুঝলাম যে, আমার এমন কিছু সুবিধা রয়েছে যা অন্য ছাত্রদের নেই। 'গ্রু'-র ট্রেনিং-এর দরুন অন্যের পিছু নেয়ার কিছু কায়দাকৌশল, সংকেতের ব্যবহার, গুপ্তলিপি চিনতে পারার সিগন্যাল, এজেন্টের সাথে বেতার যোগাযোগ, ক্যামেরার ব্যবহার ইত্যাদি কিছু কিছু জানতাম। ভাষা শিক্ষকদের সাহায্য ছাড়াই আমার দ্বিতীয় ভাষা জাপানী আমি ভালই বলতে পারতাম। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, যে দেশে কাজ করার জন্য তৈরি হচ্ছি সেই দেশে আমি আগেই গেছি। আরেকটি সমপর্যায়ের সুবিধা হচ্ছে কিভাবে লিখতে হয় তা আমি জানি।

প্রশিক্ষণের বছরটি আমার এবং আমার পরিবার উভয়ের জন্যই ছিল বড় কঠিন। কেবল শনিবারের রাতটুকু আর রবিবারের দিনটি আমাকে পরিবারের সাথে কাটাতে দেয়া হত। ফলে নাতালিয়াকে একাই দেখাশোনা করতে হত আমাদের ছোট্ট বাচ্চাটাকে। বাচ্চার সর্দি-কাশি-জ্বর-তাপ সবই সামলাতে হত বেচারীকে। সে প্রশ্ন করত কেজিবি তাকে পরিবার বিজ্ঞানে কোন 'ডিপ্লোমা' দেবে কি-না।

একদিক থেকে বিচার করলে দিয়েছিল বৈকি। প্রার্থীদের ইন্টারভিউর মত তাদের পরিবারের ইন্টারভিউর ওপরও সমান গুরুত্ব দেয়া হত। আমার স্ত্রীর ইন্টারভিউর ফলাফল জেনে গর্বে আমি প্রায় ফেটে পড়েছিলাম। আমার সেকশনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্নেল এক শনিবারে তিন ঘণ্টা ধরে কথা বলেন নাতালিয়ার সাথে। কর্নেল তার কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হন। সে খুব সুন্দরী ও তার ব্যবহার মিষ্টি বলে নয়, তার বুদ্ধিমত্তাই মুগ্ধ করে কর্নেলকে। নাতালিয়ার ধারণা, কর্নেল আমার প্রতি নাতালিয়ার ভালবাসার গভীরতা কতটুকু এবং আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কি-না তা জানতেই আগ্রহী ছিলেন বেশি। কেজিবি'র পেশাদার গোয়েন্দা যে হবে তার পরিবার সম্পর্কে এগুলোই যে সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। পরিবারের একজনের অস্তিত্ব যখন প্রচণ্ড মানসিক চাপ আর ব্যক্তিগত বিপদে ভরপুর তখন স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনযাপন সহজ নয়। এ থেকেই বোঝা যায়, কেজিবি'র মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার এত বেশি কেন।

আমাদের সেকশনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্নেলটি ছিলেন অতি সজ্জন, শ্রদ্ধাভাজন, শুভ্রকেশ ভদ্রলোক। পিতার মতই তিনি স্নেহ করতেন আমাদেরকে। চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য আমার পালা এল। অফিসে ডেকে নিয়ে বিষন্নভাবে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'লিভেংকো, আমি তোমার সাহায্য চাই।' আমার চেহারায় নিশ্চয়ই বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল, কারণ দেখলাম যে, তিনি

হাসলেন একটুখানি, তারপর বললেন, 'বুঝলে তো, তোমার পুরোপুরি সত্য মূল্যায়ন পেশ করতে পারছিনে।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ভয় ঢুকে গেল মনের মধ্যে।

'তুমি বিস্মিত হচ্ছ, কিন্তু কথাটা ঠিক। স্কুলে তোমার রেকর্ড তুলনাহীন। পরীক্ষায়ও খুবই ভাল করেছ। আসলে তোমার একটা খুঁতও আমি ধরতে পারছিনে। কিন্তু খুঁত তোমাকে বের করতেই হবে। নইলে আমার রিপোর্ট মোটেই বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কেউ বিশ্বাস করবে না আমার কথা।'

ভয় কেটে গেল। আশ্বস্ত হলাম। 'তুমি কি সাহায্য করবে আমাকে?'

বলা বাহুল্য কর্নেল তাঁর রিপোর্টে আমার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। প্রশংসাবাণীর শেষে তিনি দু'টি বিরূপ মন্তব্য জুড়ে দিলেন। একটি হলো, যখন সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লেখা ভাল সে সময় লম্বা বিস্তারিত রিপোর্ট লিখি। দ্বিতীয়ত, কোন বিষয়ে উৎসাহিত বা উত্তেজিত হলে আমি এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে চলে যাই, এক চিন্তায় স্থির থাকি না।

বিদায় নিয়ে আসার সময় বললেন, 'আরেকটা কথা, আমি তোমাকে ড্রাইভিং শেখাবার সুপারিশ করছি। তোমার ড্রাইভিং জঘন্য।'

গাড়ি আমি সত্যি খারাপ চালাই। কিন্তু অন্যদের চাইতে খারাপ নয়। এ স্কুলে প্রবেশের আগে আমরা কেউই গাড়ি ড্রাইভ করিনি। তার মানে ড্রাইভিং আমি শিখলাম ত্রিশের কোঠায় পা দেয়ার পরে। আমেরিকানরা মজা পায় এ কথা শুনে। আমি তাদের বলি যে, এতে মজা পাবার কিছু নেই। সোভিয়েত নাগরিকরা দুনিয়ার অনেক ভাল জিনিসই নাগালে পায় না। গ্র্যাজুয়েশনের পরে আমাকে নিয়োগ করা হয় ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেটের সপ্তম বিভাগে। এটা একটা ভৌগোলিক ডিপার্টমেন্ট। জাপান, ফিলিপিন্স, থাইল্যাণ্ড এবং দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে অপারেশন চালনার ভার এ বিভাগের ওপর। আমার 'গ্রু' ট্রেনিং এবং সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টরেটের অধীনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে জুনিয়র লেফটেন্যান্টের পরিবর্তে সিনিয়র লেফটেন্যান্ট পদে আমাকে কমিশন দেয়া হয়। কিন্তু জাপানী ডেস্কে কাজের ক্ষেত্রে আমাকে জুনিয়র হিসাবেই গণ্য করা হয় এবং প্রায় জনা কুড়ি এজেন্ট, রাজনৈতিক গ্রুপ আর পার্টির কেস লোড করে। এসব কেস ঘেঁটে আমি স্কুলে যা শিখেছি সেসব তত্ত্বের বাস্তবতা যাচাই এবং আমার ভবিষ্যৎ কাজের নিশানা খুঁজে পেলাম।

দু'তিনশো পৃষ্ঠার ফাইলগুলোর পাতা উল্টাতে উল্টাতে কিভাবে একজন এজেন্টকে প্রলুব্ধ করে পটিয়ে ফেলতে হয়, কাউকে টেনে আনতে হয় সোভিয়েত পক্ষে, এজেন্টের সাথে সম্পর্ক কেমনভাবে বজায় রাখতে হয় এসব

বিষয়ে অনেক কিছু জেনে গেলাম। কোন ব্যক্তির সাথে একজন গোয়েন্দা অফিসারের নিতান্ত সাধারণ, নির্দোষ, এমনকি বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ হলে অফিসারটি চেষ্টা করে ক্রমে ক্রমে ওই লোকটির দুর্বলতাগুলো কি কি তা খুঁজে বের করার । শিকারী যেভাবে টোপ গিলিয়ে মাছকে খেলায় সেভাবে খেলিয়ে চেষ্টা করে তাকে কব্জা করার। প্রথমে ছোটখাটো উপহার দিয়ে, ক্রমে বড় রকমের প্রলোভন তুলে ধরে শেষে এজেন্ট বানিয়ে ফেলে লোকটাকে। এজেন্ট হবার পর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় লোকটাকে সহযোগিতা করতে হয় কেজিবি'র সাথে। আমার দেখা ফাইলগুলোর মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। যেমন, জাপানী সাংবাদিক আরেস-এর ফাইলটা। আরেস ছিল সোভিয়েত এজেন্ট। তরুণ বয়সে সে ভ্লাদিমির আলেক্সিয়েভ প্রোন্নিকভের খপ্পরে পড়ে যায়। কেজিবি অফিসার প্রোন্নিকভ সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবনযাত্রার এক রঙ্গিন চিত্র তুলে ধরে দক্ষতার সাথে তার রাজনৈতিক মতামত গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে প্রোন্নিকভ আরেস-এর কাছে এটা-ওটা সম্পর্কে তথ্যাদির জন্য বায়না ধরতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আরেস জাপানী গোয়েন্দা বিভাগের অতি গোপনীয় তথ্যাদি চুরি করে প্রোন্নিকভের হাতে তুলে দিতে থাকে।

ফাইলগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে বুঝতে লাগলাম যে, আমাদের যা শেখানো হয়েছে সে সব সত্য। জাপান প্রকৃত অর্থেই একটা রত্ন ভাণ্ডার। সেখান থেকে গোয়েন্দা তথ্যের বিপুল সম্পদ আহরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। জাপানে আমার ওপর কি কি দায়িত্ব পড়বে তা বুঝতে পারলাম। অবশ্য বুঝে খুব পুলকিত হতে পারলাম না। একদিকে জাপানে যাওয়ার, সরেজমিনে স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছা আমার প্রবল। অন্যদিকে জাপানের অনিষ্ট করতে আমি অনিচ্ছুক। অথচ দায়িত্ব পালন করতে আমাকে ঠিক তাই করতে হবে—যে সুন্দর, উদার, সাহসী দেশটাকে ভালবেসে ফেলেছি তার অনিষ্ট করতেই হবে। একটা গভীর পাপবোধ চেপে বসল মনের ওপর।

মনের পাপবোধটাকে চাপা দেয়ার জন্য আর সবাই যা করে আমিও তাই করলাম। মনকে বোঝালাম যে, জাপানের ক্ষতি করার চাইতে নিজের দেশকে সাহায্য করার গুরুত্ব বেশি। তাছাড়া জাপান যদি নিজের ব্যাপারে সত্যি ভাবে তাহলে সে আরও কঠোর গোয়েন্দাবৃত্তি বিরোধী আইন-কানুন প্রবর্তন করবে। জাপান কিন্তু তা করেনি। ফলে সোভিয়েত গোয়েন্দারা সেখানে তথ্য চুরির হরিলুট চালায়। জাপানের সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে এবং জাপানের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপান থেকে বিপুল পরিমাণ বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

তথ্য আহরণ করতে থাকে। এসব তথ্যের সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্যত জাপানের প্রধান দলসমূহের দুই/একটার নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে দিতে পারে।

কয়েক মাস ধরে ফাইলগুলো ঘাঁটতে গিয়ে কর্নেল প্রোন্নিকভের নাম বারে বারে চোখে পড়ল। একদিন সকালে আমি সপ্তম ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। আমার ওপরওয়ালা কর্নেল কালইয়াগিন আমাকে ডেকে বললেন, 'লেভচেঙ্কো, নিচে যাও! প্রোন্নিকভ ইশিদার কাছ থেকে ব্রেজনেভের জন্য একটা গাড়ি আদায় করেছে। গাড়িটা ওরা ক্রেট থেকে বের করছে। কোন পার্টস ইত্যাদি সরিয়ে ফেলে কি-না নজর রাখো গিয়ে।'

প্রাক্তন জাপানী শ্রমমন্ত্রী হিরোহিদো ইশিদা ব্রেজনেভকে মেরুন রঙের যে নিশান লিমোজিনটা দিয়েছিলেন সেটার কথাই বলছিলেন আমার বস্। জাপানের লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে হিরোহিদো ইশিদা তখনও বেশ প্রভাবশালী। প্রোন্নিকভ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল তাঁর সাথে। কর্নেল কালইয়াগিনের কথায় সোভিয়েত সমাজের একটা বড় সমস্যাই প্রকাশ পেয়ে যায়। মস্কোতে কালোবাজারী চোরদের হাত থেকে কোন মোটর গাড়িই নিরাপদ ছিল না। কয়েক সেকেণ্ড সময় পেলেই চোররা যে কোন গাড়ির নাটবল্টুসহ সবকিছু খুলে নিয়ে যেত। কর্নেল কালইয়াগিন জানতেন যে, ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেটের প্রাঙ্গণেও কোন গাড়ি নিরাপদ নয়। আমি গিয়ে দেখলাম যে, গাড়িটা উপযুক্ত লোকদের তত্ত্বাবধানে আছে। গার্ডস ডাইরেক্টরেটের অফিসাররা রয়েছে সেখানে। তবু হুকুম অনুযায়ী আমি দাঁড়িয়ে রইলাম গাড়িটা চলে যাওয়া পর্যন্ত। ফাইলগুলো পড়তে পড়তে প্রোন্নিকভ সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। কেজিবি'র টোকিও দফতরে লাইন পিআর-এর প্রধান হিসাবে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। ওটার দায়িত্ব ছিল রাজনৈতিক গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ। দারুণ প্রতিভার পরিচয় দেন তিনি। হিরোহিদো ইশিদাকে রিক্রুট করা তাঁর এক বড় কৃতিত্ব। এজন্য তিনি পুরস্কৃত হন এবং সম্মান লাভ করেন। প্রোন্নিকভ হয়তো ইশিদার মূল্য বাড়িয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন। সোভিয়েতরা অবশ্য ইশিদার গুরুত্ব বাড়াবার জন্য যা সম্ভব সবই করেছিল। ইশিদা সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে এলে পার্টির সর্বোচ্চ কর্তারা তাঁকে আপ্যায়ন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর এক সফরের শেষে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিন ব্যক্তিগতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে বন্দী একদল জাপানী জেলের মুক্তির আদেশ দেন। মৎস্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার সময় থেকেই আমি অবশ্য জানতাম যে, দর কষাকষির হাতিয়াররূপে ব্যবহারের জন্যই জাপানী জেলেদের

রুটিন মাফিক ধরে বন্দী করে রাখা হয়। যাই হোক জাপানী পত্র-পত্রিকায় এই মর্মে খবর ছাপা হয় যে, জেলেদের মুক্তি সম্ভব হয়েছে সংসদীয় প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসাবে মস্কো সফরকালে ইশিদার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে। দেশে ফিরে ইশিদা বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে সক্ষম হন যে, সোভিয়েত পক্ষ আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী ও নমনীয়। এতে জাপানে ইশিদার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রোন্নিকভের রিক্রুট মূল্যবান হয়ে উঠেন সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য।

১৯৭৪ সালে চীফ ডাইরেক্টরেট সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমাকে এক বছর সোভিয়েতের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সাপ্তাহিক নিউ টাইমস-এ কাজ করতে হবে। আমি ততদিনে একজন গোয়েন্দা অফিসার হয়েছি। নিউ টাইমস-এর চাকরিটা একটা কভার তৈরি করার জন্য, যাতে সাময়িকীটার প্রতিনিধি হিসাবে জাপানে কাজ করতে পারি। এক বছর কাজ করলাম সাংবাদিক হিসাবে। নিবন্ধাদি লিখলাম, সম্পাদনা করলাম, সাক্ষাৎকার নিলাম, মেলামেশা করলাম সাংবাদিক মহলে। কোন সাংবাদিক নিজে যা লিখত তা বিশ্বাস করত না। প্রায় সবাই জানত যে, তারা সোভিয়েত পাঠকদের প্রতারিত করার জন্যেই লিখছে।

কেজিবি'র টোকিও দফতর থেকে অফিসাররা ছুটিতে এলে আমি টোকিও'তে কাজের অবস্থা সম্পর্কে যতটা সম্ভব প্রশ্ন করতাম। ওরা হেসে বলত যে, গোয়েন্দা বৃত্তিতে সবকিছুই কঠিন। তবে এটুকু স্বীকার করত যে, জাপানে ভাল মত কাজ করা এবং প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। জাপানী সোর্সগুলোকে ব্যবহার করে গণচীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ দুনিয়ার যে কোন দেশ সম্পর্কেই প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। ওরা বলত, জাপানী বৈদেশিক মন্ত্রণালয়েও কেজিবি'র সোর্স আছে এবং তারা জাপানের রিসার্চ ব্যুরোর ফাইলেও হাত দিতে পারে।

শেষ পর্যন্ত আমার ট্রেনিং শেষ হলো এবং কভারও তৈরি হয়ে গেল। জাপানে নিয়োগ পেলাম। নতুন দায়িত্ব যখন পেলাম তার আগেই নিউ টাইমস-এ অনেকদিন কাজের ফলে একজন সাংবাদিক হিসাবে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছি। আমার নামযুক্ত লেখা প্রায়ই ছাপা হয় এবং সাংবাদিক মহলে বেশ পরিচিতি লাভ করেছি। জানতাম যে, নিউ টাইমস-এর সহকর্মীরা একটা বিদায় পার্টি আশা করবেন আমার কাছ থেকে। মনে করেছিলাম একশো জনের স্টাফের মধ্যে বিশ-ত্রিশ জন আসবে। আশ্চর্য ও অভিভূত হলাম দেখলাম যে, ডাইনিংরুমে আশি জনের বেশি মানুষ দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে আমাকে বিদায়

অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এক সুন্দর বিদায় পার্টি হয়েছিল ওটা। মনোরম স্মৃতি হয়ে থাকবে আমার মনে চিরজীবন।

নাতালিয়া জাপান যাত্রার দিন কয়েক আগে কেজিবি'তে আমার ওপরওয়ালাদের জন্যও একটা পার্টি দিলাম। জাপানী ডেস্কের পাঁচ জন কর্নেল যোগ দিয়েছিলেন এক জনপ্রিয় ক্লাবে আয়োজিত পার্টিতে। সেখানে আমরা ছয় জন বসে আলাপ করছিলাম গুরুগম্ভীরভাবে। ব্যাপারটা মোটেই মানানসই লাগছিল না। কিন্তু কয়েকটা ড্রিঙ্ক পেটে পড়তেই অবস্থা পাল্টে গেল, সবাই সহজ হয়ে গেলেন।

শেষদিকে আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটল। কর্নেলদের একজন রয়ে গেলেন অন্যেরা চলে যাবার পরেও। 'তোমাকে আমি তিনটি উপদেশ দিতে চাই,' বললেন তিনি। 'তুমি যদি এ কথা কাউকে বলে দাও, আমি শপথ করে বলব যে, তুমি মিথ্যাবাদী, বুঝেছ?'

মাথা নামিয়ে বললাম যে, বুঝেছি।

'প্রথমত, যে সব নিয়ম-কানুন শিখেছ তা প্রাণপণে অনুসরণ করবে। ওগুলো ভাল। তবে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করবে তোমার এবং সাধারণ জ্ঞান আর বিচারবুদ্ধির ওপর। দ্বিতীয়ত, সিআইএ থেকে দূরে থেকো। ওরা তোমার মতই চালাক-চতুর। প্রলুব্ধ করার এমন সব ব্যবস্থা ওদের আছে, যা তোমার অজানা। সে সবের ফাঁদে না পড়লেও দেখবে যে, তুমি বৃথা সময় নষ্ট করেছ। খুব খারাপ ঘটনাও ঘটেছে। কোন কোন অফিসার আমেরিকানদের রিক্রুট করতে গিয়ে নিজেরাই মাছির মত ডুবে গেছে ওদের মধুর ভাণ্ডে।'

একটু দম নিলেন তিনি। তারপর বললেন, তৃতীয়ত, প্রোন্নিকভের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকবে। জাপানে সেই হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক। কেন বলছি এ কথা তুমি নিজেই টের পাবে, তবে টের পেতে খুব বেশি দেরি করে ফেল না যেন।

এক ঢোকে বাকি মদটুকু গিলে তিনি চলে গেলেন।

পুরোদস্তুর কেজিবি অফিসার হয়ে গেলাম। জাপান যাচ্ছি খেলায় যোগ দিতে।

শিকার আর শিকারী
(জাপান ১৯৭৫-১৯৭৯)

অবশেষে বহু বছরের প্রস্তুতি আর প্রতীক্ষার পরে স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে বিমানযোগে জাপান চললাম ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। নাতালিয়া, আমি আর আমার দশ বছরের ছেলে আলেকজাণ্ডার তিনজনের মধ্যে কার উত্তেজনা বেশি ছিল বলতে পারব না। জিনিসপত্র বাঁধাছাদা, সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়া, বিদায় পার্টি ইত্যাদি নিয়ে তিনজনই ছিলাম প্রায় অবসন্ন। বিমানে আমাদের সাথে আলেকজাণ্ডারের ছোট্ট কুকুরটিও ছিল। ওটাকে নিয়ে তার উদ্বেগের সীমা ছিল না, কারণ টোকিওতে প্রথম মাসটি কুকুরটাকে কাটাতে হবে কোয়ারান্টিনে। কিন্তু বিমানবন্দরে নেমে একটু তদ্বির করে ওটাকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারলাম।

আমরা ছিলাম খুবই ক্লান্ত। তাই কাজ শুরু করার আগে কয়েকদিনের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। আশা করেছিলাম যে, টোকিও'র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক কোন হোটেলে আমাদের জন্য বুকিং থাকবে। আগে যতবার জাপান এসেছি ওরকম হোটেলেই থেকেছি। কিন্তু এবার কেজিবি আমাদের তুলল দূতাবাসের কাছে একটা সস্তা, হৈ-চৈ ভরা অপরিচ্ছন্ন হোটেলে।

মনে মনে ভাবলাম, 'প্রচারের জন্য আসলে বোধ হয় ভালভাবে রাখা হয়। নিজের লোকদের কেজিবি নিশ্চয়ই মাথায় তোলে না।' অবস্থা আরও বেগতিক দাঁড়াল যখন দেখলাম যে, হুকুম এসেছে দূতাবাস থেকে—পরদিন সকালে গিয়ে ব্রিফিং নিতে হবে। পরদিন ভোরে উঠে এক কাপ চা গিলে নিয়ে চলে গেলাম দূতাবাসে। একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। ফলে, সুযোগ পেলাম দরজা খোলার আগে বাড়িটাকে এক নজর দেখে নেবার। প্রকাণ্ড বাড়ি—বিশাল, এগারো তলা উঁচু।

ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমেই যার সাথে দেখা হলো তিনি হলেন ভিয়াচেশ্লাভ পিরোগোভ। সেই পিরোগোভ, স্কুলে যে ছিল আমার দু' বছরের সিনিয়র এবং কেজিবি অফিসার বলে যে নিজেকে জাহির করত। যেন হারানো

ভাইকে ফিরে পেয়েছে এমন উচ্ছ্বাস নিয়ে সে সম্ভাষণ জানাল আমাকে। স্পষ্টত, নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে অর্থাৎ কেজিবি অফিসার হতে পেরেছে বলে গর্বিত সে।

'একটুও বদলায়নি,' ভাবলাম আপন মনে। 'স্কুলে টিকটিকি ছিল, এখনও তাই।' স্কুলে এবং কলেজে কারা টিকটিকি (ইনফর্মার) তা আমরা জেনে যেতাম। ওই দক্ষতা আমাদের অর্জন করতে হত প্রাণের দায়ে। কিন্তু পিরোগোভ কারও ক্ষতি করতে পারত না, কারণ সবাই জানত সে কি জিনিস।

তার ওপর ভার পড়েছে আমার সাথে থেকে কোথায় কার কাছে যেতে হবে তা দেখিয়ে দেয়ার। সে আমাকে নিয়ে গেল দশতলায় কেজিবির রেসিডেন্ট অফিসার দমিত্রি ইয়েরোখিনের কাছে। সোভিয়েতের কনিষ্ঠতম এ জেনারেলটির বয়স বিয়াল্লিশ। কিন্তু বয়সের তুলনায় তাঁকে আশ্চর্যজনকভাবে তরুণ দেখায়। হ্যাণ্ডশেক করেই তিনি আমাকে বিদায় দিলেন এই বলে, 'শুনলাম আপনি জাপান বিষয়ে একজন নামজাদা বিশেষজ্ঞ। যান, কাজে লেগে পড়ুন।'

ইয়েরোখিনের অফিস থেকে বেরিয়ে করিডোরে পা দিয়েই দেখলাম মাথা ভর্তি কালো চুলওয়ালা একজন সুবেশধারী লোক উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। 'আপনি স্তানিশ্লাভ আলেকজান্দ্রোভিচ,' বললেন তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে। 'আমি হচ্ছি ভ্লাদিমির আলেক্সিয়েভিচ।'

এভাবেই পরিচয় হলো বিখ্যাত প্রোন্নিকভের সাথে, যার সম্বন্ধে মস্কোতে সাবধান করে দেয়া হয়েছে আমাকে। লোকটি বেঁটে, পাঁচফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু শরীরটা সুগঠিত, শক্ত এবং পেশীবহুল।

'ভিতরে আসুন,' বলে ভ্রু উঁচু করে পিরোগোভকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, আমন্ত্রণটা কেবল আমার জন্য।

তাঁর অফিসে বসে তিনি এমনভাব দেখালেন যেন আমার সাথে পরিচয় পর্ব সারার জন্য যত ইচ্ছা সময় তিনি দিতে পারেন। আসলেও তাই। পরে জেনেছি যে, কোন্ নবাগতকে তাঁর পরিকল্পনা মত কাজে কতটা লাগাতে পারবেন তা বুঝে নেয়ার জন্য তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন।

আমাকে আগে হুঁশিয়ার না করা হলে হয়তো লোকটার খপ্পরে পড়ে যেতাম। আমাদের গোটা আলাপকালে বুঝলাম আমার সম্পর্কে খুঁটিনাটি পর্যন্ত সব তথ্য তিনি জানেন। কোন তথ্যই তাঁর অজানা নেই। এমনকি আমাদের ছোট্ট কুকুরটি এবং ওটার নাম পর্যন্ত তাঁর জানা।

এক পর্যায়ে বললেন, 'আপনার বিউটি (কুকুর) মস্কো থেকে টোকিও পর্যন্ত বিমান ভ্রমণটা কেমনভাবে নিল? সর্বক্ষণ হাসিমুখে বারে বারে বললেন যে, আমি আসাতে বড় খুশি হয়েছেন। কিন্তু তাঁর শীতল ধূসর চোখ দুটো আমাকে

পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত রইল।'

তাঁর অফিস থেকে এ নিশ্চিত ধারণা নিয়ে বেরিয়ে এলাম যে, প্রোন্নিকভ তুখোর লোক। অত্যন্ত দক্ষ ও যোগ্য। নিজের অফিসারদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকতে চান। ওই সময় তিনি ছিলেন পিআর লাইনের, মানে রাজনৈতিক লাইনের প্রধান এবং কেজিবি রেসিডেন্সির (জাপানস্থ কেজিবি দফতরের) দ্বিতীয় প্রধান। পদমর্যাদার দিক থেকে লে: কর্নেল হলেও তিনি অনেক বেশি ক্ষমতাধর বলে মস্কোর ওয়াকিবহাল অফিসাররা আমাকে জানিয়েছিলেন। মস্কোতে ওরা মনে করে যে, প্রোন্নিকভ শেষ পর্যন্ত ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেটের কর্তা হয়ে বসবেন। আমার জানা হয়ে গেল যে, প্রোন্নিকভ এমন এক ব্যক্তি যাঁকে খাটো করে দেখা চলবে না।

পিরোগোভ অপেক্ষা করছিল বাইরে। দূতাবাসের সর্বোচ্চ দুই তলায় কেজিবির দফতর। সে আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবে। ওপরে উঠে দেখলাম মাঝখানে হলঘর। দু'পাশে সারি সারি রুম। অনুবাদের লাইন এক্স-এর (বৈজ্ঞানিক তথ্য চুরির) বেতার ও মাইক্রোওয়েভ ইন্টারসেপশন, সক্রিয় ব্যবস্থা (মিথ্যা প্রচারণা ও প্রভাব বিস্তার অভিযান পরিচালনা) এবং অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনার কক্ষসমূহ—মস্কোর ট্রেনিং দফতরের মত। একমাত্র পার্থক্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামের বিরাট সমাবেশ, অপারেশনের বিরাটত্ব আর অদ্ভুত নীরবতা।

'গা ছমছম করছে,' মন্তব্য করলাম, 'এত নীরব কেন এখানে?'

দেয়াল, ফ্লোর আর সিলিং-এর কারণে। ওগুলো সবই ডবল, ব্যাখ্যা দিল পিরোগেভ। 'ওগুলোর মাঝখানে শূন্য স্থানে সঙ্গীত আর বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিয়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাইরে থেকে কোন ইলেক্ট্রোনিক শ্রবণযন্ত্র বসিয়ে কেউ যেন ভেতরের কথাবার্তা কিছু শুনতে না পারে।'

কয়েকদিন কাটালাম কাজকর্মের সাথে পরিচিত হতে এবং রেসিডেন্সির অন্য অফিসারদের সাথে দেখা-সাক্ষাতে। আমি যাঁর জায়গায় এলাম তিনি হলেন বোরিস পিশ্চিক। উজ্জ্বল সুশ্রী তরুণ অফিসার। জাপান সম্পর্কে অনেক জ্ঞান তাঁর। তিনি মস্কো চলে যাবার পর আমাকে আর নাতালিয়াকে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টটি দেয়া হলো। সেগুগায়ার এক অতি পুরানো বাড়িতে অ্যাপার্টমেন্টটি। ঘরগুলো খুব ছোট ছোট। অফিসের জন্য জায়গা পাওয়া দুঃসাধ্য মনে হলো। জাপানে এসেছি সাংবাদিকের পরিচয় নিয়ে। কাজেই, সাংবাদিকের মতই চলতে হবে। সুতরাং নিউ টাইমস-এর সম্পাদক টোকিও সফরে এলে তাঁকে দেখালাম কেজিবি আমাকে কি অ্যাপার্টমেন্ট দিয়েছে।

'নিউ টাইমস-এর মত মর্যাদাবান পত্রিকার প্রতিনিধির এভাবে থাকা উচিত?' প্রশ্ন করলাম তাঁকে।

'না,' বললেন তিনি, 'আমি মনে করি এর একটা সংশোধন সম্ভব। দেখি কি করতে পারি। শত হোক, তুমি একজন ভাল করেসপণ্ডেন্ট। আমরা তোমাকে যে বেতন দেব তার যোগ্য তুমি।'

তিনি মস্কো ফিরে যাবার আগেই আমাকে শিবুয়া উদাগাওয়া-চো এলাকায় একটা বড় ও ব্যয়বহুল অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। তিন বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টটি খুবই পছন্দ হলো আমাদের। নিউ টাইমস্-এর প্রতিনিধি হিসাবে আমার কভারটি এখন পাকা হয়ে গেল।

পরিচিত হলাম জাপানী সাংবাদিকদের সাথে। যোগ দিলাম প্রেসক্লাবে। এতে সাংবাদিক হিসাবে আমার বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হলো। একই সাথে গোয়েন্দা অফিসার হিসাবে আমার আসল কাজও শুরু করলাম। শুরুতে আমাকে নিয়োজিত করা হলো টোকিও রেসিডেন্সির রাজনৈতিক গোয়েন্দা শাখায়। এখানে আমার কাজ ছিল সরাসরি লে: ক. প্রোন্নিকভের অধীনে। আমাকে বলা হলো সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মহলগুলোতে বন্ধু বা যোগাযোগ স্থাপনের মত লোক খোঁজা, যাতে ভবিষ্যতে তাদেরকে রিক্রুট করতে পারি।

আমি কাজ করছিলাম একটা সুপ্রতিষ্ঠিত কর্মসূচীর মধ্যে—যা জাপান থেকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য ধারাবাহিকভাবে শোষণ করে নিচ্ছিল। এ কর্মসূচীর উদ্ভব হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপানে পরিচালিত সোভিয়েত গোয়েন্দা তৎপরতার ভিত্তিতে, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের শক্তিহীনতা ও দুর্বলতায় উল্লাসিত হয়েছিল।

জাতি হিসাবে জাপান তখন শিল্প, অর্থনীতি ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পরিণামে দূরপ্রাচ্যে কোন রকমের আগ্রাসন চালাবার ক্ষমতাই জাপানের ছিল না। একটা প্রধান শক্তি হিসাবে দুনিয়ার কোথাও চাপ সৃষ্টির বা প্রভাব বিস্তারের কোন উপায় ছিল না তার। জাপানের পরাজয়ের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে সোভিয়েত ইউনিয়নের এগিয়ে আসার সেটাই উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম পরিকল্পনা ছিল জাপানের অভ্যন্তরে জাপানী নাগরিকদের দ্বারা পঞ্চম বাহিনীর মত একটি দল সৃষ্টি করে জাপানকে সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করা। এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য সোভিয়েতরা নজর দিল সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্যের সর্বত্র ছড়ানো বন্দী শিবিরগুলোতে আটক বিপুলসংখ্যক জাপানী যুদ্ধবন্দীদের ওপর। জাপানী যুদ্ধবন্দীদের মার্ক্সবাদ-

লেনিনবাদে দীক্ষিত করার জন্য তাদের মগজ ধোলাইয়ের এক অভূতপূর্ব কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। ওদের জন্য স্কুল খোলা হয়, জাপানী ভাষায় পত্রিকা বের করা হয় এবং একটা কার্যকর শক্তি হিসাবে ওদের গড়ে তোলার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখি, আমার জাপানী ভাষার শিক্ষয়িত্রী মিসেস ইভানেস্কো এমনি এক বন্দী শিবিরে দোভাষীর কাজ করতেন। আমার সময়ে আন্তর্জাতিক বিভাগের জাপানী ডেস্কের যিনি প্রধান ছিলেন সেই ইভান কোভালেঙ্কো যুদ্ধবন্দীদের জন্য প্রকাশিত একটি জাপানী ভাষার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

যুদ্ধ ১৯৪৫ সালে শেষ হয়ে গেলেও এসব বন্দীদের যে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ফেরত দেয়া হয়নি তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে টোকিও এবং অন্যান্য বড় বড় জাপানী শহরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বিক্ষোভকালে জনতা গাড়ি ভাঙচুর ও মার্কিন বিরোধী শ্লোগান দেয়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জাপান সরকার জাপানী কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে। ফলে পার্টি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যেতে বাধ্য হয়। জাপানকে নিজের ঢং-এ বদলে ফেলার সোভিয়েত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ওই দশকের শেষ নাগাদ জাপান তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠে এবং জাপানের অর্থনীতিতে এমন জোয়ার আসে যে, জিএনপি'র দিক থেকে জাপান মুক্ত বিশ্বের সেরা দেশগুলোর সারিতে স্থান পায়। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিজের কর্মকৌশল নতুন করে ভাবতে হয়। ১৯৬০-এর দশক নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েতের অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থের বিকাশে জাপানের অর্থনৈতিক শক্তিকে ব্যবহারের নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য এতে এক বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়। কৃৎকৌশল বা কারিগরি বিকাশের ক্ষেত্রে তারা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অন্যান্য অগ্রসর দেশের তুলনায় পনেরো-বিশ বছর পিছনে। তারা আশা করেছিল, জাপান থেকে সামরিক উদ্দেশে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন সব গোটা কেমিক্যাল প্লান্ট, ফ্যাক্টরি কিনে ফেলবে। জাপান তখন মহানন্দে দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশের সাথে অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ চালিয়ে যাচ্ছিল। এ কারণে অনুরূপ ক্রয়ের আদর্শ স্থান ছিল জাপান। সোভিয়েত ইউনিয়ন জানত যে, জাপানের সাথে বাণিজ্যে তার দেউলিয়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবু জাপান থেকে যা পারে কিনে নেয়ার প্রয়োজন তার এত

বেশি ছিল যে, ফতুর হবার আশঙ্কাকে সে আমল দিয়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্য চুক্তি অনুমোদনে জাপান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশে সোভিয়েতরা লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও সমাজতন্ত্রী দলের সাথে এবং জাপানী ব্যবসায়ী মহলের সাথে দহরম-মহরম শুরু করে।

সোভিয়েতের জাপান নীতির এ পরিবর্তনের একটা সুফল হয়েছিল এই যে তারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ লাভ করে। ওটা কার্যত ভর্তুকি। বস্তুত, জাপানী করদাতা আর বিনিয়োগকারীরা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের নামে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে থাকে। জাপানীরা এটা করত। নিজেদের রফতানি বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ শিল্পকে জোরদার করার জন্য।

সোভিয়েতরা জাপানী বন্ধুদের নানা ধরনের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেয়। ওরা বলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বাণিজ্য জাপানের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। ওরা আরও বলে, সোভিয়েতের বাজারে কোন ওঠা-নামা, অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি নেই। জাপান যদি তার বাণিজ্যের একাংশ সোভিয়েতের দিকে প্রবাহিত করে তবে সোভিয়েতরা সাইবেরিয়া আর দূরপ্রাচ্যের অফুরন্ত মূল্যবান খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার জাপানের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে। সোভিয়েত জাপানকে তেল বিক্রির প্রস্তাবও দেয়। সাইবেরিয়া তেল পেলে বিরাট সুবিধা হত জাপানের। তাকে আর অনেক দূর থেকে তেল আমদানির ব্যয়ভার বহন করতে হত না। তবে ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে সোভিয়েতরা এ প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যায়, কারণ তখন তার নিজেরই তেল ঘাটতি দেখা দিয়েছিল।

সোভিয়েত-জাপান সম্পর্কের এ পর্যায়ে, মস্কো যখন জাপানী ব্যবসায়ীদের নিজের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছিল ঠিক তখনই আমি জাপানে প্রবেশ করি। জাপানী ব্যবসায়ী মহলের হোমরা-চোমরা লোকদের তখন প্রায়ই সোভিয়েত সফরে আমন্ত্রণ জানানো হত। বিলাসপূর্ণ হোটেলে রেখে দামী খাবার খাইয়ে অতিরিক্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে তুষ্ট করার চেষ্টা হত। এ সবই হত সোভিয়েত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত কেজিবি বিশেষজ্ঞদের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে তোশিও দোকোর প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন, জাপানী শিল্পপতিদের শক্তিশালী সংগঠন ফেডারেশন অব ইকনোমিক অরগানাইজেসন্স ইন জাপান (কেইদানরেন)-এর সভাপতি। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য দোকোকে মস্কোতে

আমন্ত্রণ জানানো হয়। মস্কো পৌঁছার পর তাঁকে জানানো হয় যে, প্রেসিডেন্ট ব্রেঝনেভও দেখা করতে চান তাঁর সাথে। তবে মি. ব্রেঝনেভ তখন ছুটি কাটাচ্ছেন ক্রিমিয়াতে। সোভিয়েতরা তাঁকে বিমান যোগে ক্রিমিয়া নিয়ে যেতে চায়। মি. দোকোর কি মর্জি হবে? মি. দোকোর মর্জি অবশ্যই হলো। কাজেই সরকারী খরচে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো এক জাঁকাল প্রাসাদে–যেখানে ব্রেঝনেভ গ্রীষ্মের ছুটি কাটাচ্ছেন। ওই প্রাসাদটি এক সময় ছিল জারদের গ্রীষ্মাবাস। খুব কম বিদেশীকেই ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়। অত্যন্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, সোভিয়েত ব্লকের দেশগুলোর বড় বড় নেতারাই শুধু ওখানে যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের সেই সৌভাগ্য কখনও হয় না। দোকোকে ওখানে নিয়ে গিয়ে সোভিয়েতরা দেখাল যে, ওরা তাঁকে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মনে করে। তাঁর সেখানে অবস্থানকালে তাঁকে বাণিজ্যের ব্যাপারে সোভিয়েতের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার জন্য সোভিয়েতরা চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। এই লাল কার্পেট অভ্যর্থনা কিংবা ব্যবসায়িক কারণে তা নিশ্চয় করে বলা না গেলেও এটা জানা কথা যে, মি. দোকো বহু বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বাণিজ্য চুক্তির একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন।

এখানে একটা ছোট কথা বলে রাখি। সোভিয়েতদের সাথে আলোচনায় বসলেই জাপানী বাণিজ্য প্রতিনিধিরা সুস্পষ্টভাবে বেকায়দায় পড়ে যায়। এর কারণ হচ্ছে, জাপানীরা কি বলবে তা আগেভাগেই জেনে যায় কেজিবি এবং তারা অগ্রীম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখে সোভিয়েত আলোচকদের। সবকিছু সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকার জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানে অত বেশি এজেন্ট রাখে।

আমার জাপানে কাজ করার পুরো সময়টায় সব চেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে যত বেশি সম্ভব 'হাই-টেক' বস্তু সংক্রান্ত তথ্য আহরণের ওপর–কেমিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভারি যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, সেমি-কনডাক্টর, অপটিকস্, রেডিও টেলিভিশন সরঞ্জামাদি, সামরিক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন যে কোন জাপানী জিনিস ছিল আমাদের লক্ষ্যবস্তু। বছরকয়েক আগে সোভিয়েতরা সত্যি এক বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করে ফেলে। ওরা এক বিশাল আকারের টনেজ ও ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ড্রাইডক ওদের কাছে বিক্রি করার জন্য জাপানীদের রাজি করাতে সক্ষম হয়। সোভিয়েতরা জাপানীদের বলে যে, ওদের মাছ ধরার জাহাজগুলো মেরামতের জন্যই কেবল ড্রাইডকটি ব্যবহার করবে। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, জাপানীরা সোভিয়েতদের ওসব বোলচালকে সত্য বলে মেনে নেয়ার মত বোকা, কারণ সোভিয়েতে তখন

পুরোদমে ও খোলাখুলি ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি চলছিল। জাপানে কেউ কেউ নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছিল যে, সোভিয়েতরা ও রকম একটা ডককে সামরিক কাজে লাগাবে। আসলে ঘটেও ছিল তাই। ড্রাই-ডকটি ভ্লাদিভোস্তকে ডেলিভারি দেয়ার মাসকয়েক পরেই সোভিয়েতরা ওদের বিমানবাহী জাহাজ মিনস্ক মেরামতের কাজে ওটাকে ব্যবহার করে। তারপর মেরামত করে কয়েকটি আণবিক সাবমেরিন।

১৯৮৭ সালের গ্রীষ্মকালে মুক্ত বিশ্ব চমকে ওঠে একটা খবরে। খবরটি হচ্ছে এই যে, তোসিবা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি সুইডেনের একটি কোম্পানির সাথে মিলে সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নত প্রযুক্তির মেশিন টুল ও কম্পিউটার বিক্রি করবে। এসব সরঞ্জাম হাতে পেলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী তাদের সাবমেরিনের প্রপেলারের উন্নতি সাধন করতে পারবে—যার ফলে সোভিয়েত সাবমেরিনগুলো প্রায় নিঃশব্দে পানির নিচে বিচরণ করতে সক্ষম হবে এবং সেগুলোর সন্ধান পাওয়া অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। উভয় দেশই এসব যন্ত্রপাতির বিক্রি নিষিদ্ধ করে দেয়। তবে এ ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণ হয় জাপানী কোম্পানিগুলোর সাথে কারবারে সোভিয়েতরা কতটা দক্ষতা অর্জন করেছিল।

জাপানী ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক মহলগুলোর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে ভাল ফল লাভের উদ্দেশে সোভিয়েতরা তাদের সেরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের পাঠায়। ওদের মধ্যে দু'ধরনের লোক থাকে। একদল পরিষ্কার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের জন্য, অন্যদল গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে যা পারে তা আহরণের জন্য। ১৯৭০-এর দশকে এবং ১৯৮০ দশকের শুরুতে একজন নামজাদা সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপক ছিলেন জাপানস্থ সোভিয়েত বাণিজ্য মিশনের প্রধান। তাঁর নাম স্পানদারয়ান। তিনি ছিলেন পরিষ্কার ব্যবসা-বণিজ্যের লোক। কিন্তু তাঁর ডেপুটি পাপুসিন ছিলেন কেজিবির কর্নেল। আগে কর্মরত ছিলেন ব্রিটেনে। পাপুসিন সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে গেলে নতুন যে ডেপুটি আসেন তাঁর নাম ঝারকভ। তিনিও ছিলেন কেজিবির লে: কর্নেল। আমি জানলাম যে সোভিয়েত বাণিজ্য মিশনের কর্মচারীদের শতকরা প্রায় পঞ্চাশজনই কেজিবি অফিসার। এদের বেশিরভাগ বৈজ্ঞানীক ও উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গোয়েন্দাবৃত্তিতে অভিজ্ঞ। জাপান কোন কোন 'হাইটেক' সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে অস্বীকার করে বটে, তবে সেখান থেকে ওসব জিনিস ও তথ্যাদি আহরণ সহজ। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ গোয়েন্দারা চেষ্টা করে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চুরি করতে। এসব করতে গিয়ে ওদের অনেক এজেন্ট ধরাও পড়ে। আমার টোকিও

অবস্থানকালে কেজিবি'র টোকিও রেসিডেন্সিতে লাইন এক্স-এর অধীনে প্রায় বিশজন সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা অফিসার ছিল। লাইন এক্স হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিষয়ক গোয়েন্দা শাখা।

এরা বাণিজ্য সম্পর্ক বহির্ভূত পদে কিংবা স্বল্পমেয়াদী বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োজিত থাকে। আমার জাপানে থাকাকালে সেখানে নিয়োজিত এরোফ্লুতের প্রায় দশজন কর্মচারী ছিল সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিষয়ক গোয়েন্দা। তাস সংবাদ সংস্থার কর্মচারীদের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ছিল কেজিবি'র লোক এবং তাদের অন্তত একজন ছিল লাইন এক্স-এর অফিসার। সোভিয়েত দূতাবাসের বৈজ্ঞানিক কাউন্সিলর ছিলেন উচ্চপদস্থ লাইন এক্স অফিসার। তাঁর সহকারীদের একজনও ছিলেন তাই। উচ্চ প্রযুক্তি চুরিতে 'গ্রু'ও জড়িত। টোকিওর 'গ্রু' রেসিডেন্সির বহু সদস্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিষয়ে গোয়েন্দাগিরিতে অভিজ্ঞ সামরিক অফিসার।

প্রতিটি অফিসার তিন-চারজন এজেন্টকে চালায়। ফলে সহজ হিসাবে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েতের পক্ষে কর্মরত এজেন্টদের সংখ্যা নূন্যপক্ষে ৭৫ এবং বেশি হলে একশো বা তার কিছু বেশি। সোভিয়েতদের যা দরকার তা ওই এজেন্টরা চুরি করে। এটা এক লাভজনক ব্যবসা। একজন এজেন্টকে ১০ হাজার থেকে ১ লাখ ডলার দিয়ে কেজিবি যে. প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াটি হস্তগত করতে পারে তা নিজেরা উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করতে ব্যয় হতে পারে ২০ লাখ ডলারেরও বেশি। কেবল নমুনাগুলো চুরি ও নকল করে সোভিয়েতরা অনেক অর্থ বাঁচায় এবং চুরিও করে অনেক স্যাম্পল। এমনকি কেজিবি রেসিডেন্সি জাপানে জাতীয় পুলিশের গোয়েন্দা টিমগুলোর বেতার যোগাযোগ বার্তা মনিটর করার জন্য যে বিশেষ শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করে তা-ও জাপান থেকেই চুরি করা।

১৯৭০-এর শেষদিকে আমাদের টোকিও রেসিডেন্সির কর্তা লাইন এক্স সম্পর্কে একটা চমকপ্রদ কথা বলেন। 'এসব অফিসার দ্বারা পরিচালিত অপারেশন থেকে প্রতিবছর যা আয় হয় তাতে আমাদের গোটা টোকিও রেসিডেন্সির কয়েক বছরের খরচ মিটেও বেশকিছু অর্থ বেঁচে যায়। বস্তুত বিশ্বব্যাপী পরিচালিত প্রযুক্তিগত গোয়েন্দা অপারেশনের আয় দিয়েই কেজিবি'র সমগ্র বৈদেশিক গোয়েন্দা সার্ভিসের ব্যয় মিটে যায়।'

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। টোকিও রেসিডেন্সির বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিষয়ক জনৈক গোয়েন্দা অফিসার এক সোভিয়েত কারিগরি প্রতিনিধি দলের সাথে জাপানের এক কেমিক্যাল কারখানায় যান। জাপানীরা তাঁদেরকে সাদর

অভ্যর্থনা জানান। গোটা কারখানা ঘুরিয়ে দেখান, এমনকি বিদেশীদের জন্য নিষিদ্ধ অংশগুলোও দেখান। জাপানীরা অবশ্য ভেবেছিলেন যে, সোভিয়েতরা গোটা প্ল্যান্ট না হলেও অন্তত তার নকল তৈরির প্রযুক্তিটা কিনবে। ফ্যাক্টরির একটি অংশে গিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়েই দু'চোখ স্থির হয়ে গেল কেজিবি অফিসারটির। দেয়াল জুড়ে রয়েছে গোটা প্ল্যান্টটির প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াগুলোর রূপরেখা নির্দেশক বিরাট এক চার্ট।

'যত বেশি সম্ভব প্রশ্ন করে গাইডটার দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে রাখো,' বললেন তিনি সাথীদের একজনকে।

সোভিয়েত প্রতিনিধিরা ঘিরে ফেলল গাইডকে। প্রশ্ন করতে লাগল একের পর এক, আর সেই সুযোগে কেজিবি অফিসারটি গোটা চার্টটা এঁকে নিলেন। রেসিডেন্সিতে ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওটা পাঠিয়ে দিলেন মস্কোতে। দু'সপ্তাহ পরে জানা গেল যে, ওই একটা চুরি থেকে যে লাভ হয়েছে তাতেই টোকিও রেসিডেন্সির বারো বছরের ব্যয় নির্বাহ হবে।

অনেক বিশেষজ্ঞ জাপান যেতেন স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যেসব সরঞ্জাম কেনে সেগুলো যাচাইয়ের কাজে। দুই তিন মাস থেকে তারা ভিসা নবায়নের আবেদন পেশ করতেন। এভাবে দূতাবাসের লোকসংখ্যা সরকারীভাবে মোটেই না বাড়িয়ে অনেক বাড়িয়ে ফেলা যায়। ভিসা নবায়ন করে তাঁদের অনেকেই দু'তিন বছর পর্যন্ত থেকে যেতেন জাপানে। এসব বিশেষজ্ঞের অন্তত অর্ধেক ছিলেন কেজিবি'র পেশাদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গোয়েন্দা শাখার লোক। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে কেজিবি'র এই বিপুল গোয়েন্দা বাহিনী নিত্য ব্যাপৃত থাকত 'হাইটেক' চুরির কাজে। বস্তুত এতবেশি তথ্য তারা সংগ্রহ করে ফেলত যে সেগুলো মস্কো পাঠাতে বেগ পেতে হত। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সোভিয়েত দূতাবাসে 'ডিপ্লোম্যাটিক কুরিয়ার' (কূটনৈতিক সংবাদবাহক) আসত মাসে দু'বার। মস্কোগামী লাইন এক্স-এর সংগৃহীত চোরাই নমুনা আর প্রযুক্তি দ্রব্যের ওজন এক টনে দাঁড়ানোও অস্বাভাবিক ছিল না। সোভিয়েত দূতাবাস থেকে কূটনৈতিক ডাক মাইক্রোবাসযোগে বিমানবন্দরে ডেলিভারি দেয়ার এটাও ছিল অন্যতম কারণ। বাসের ফ্লোর থেকে সিলিং পর্যন্ত বোঝাই থাকত বাক্সে। এ থেকেই জাপানে কেজিবি'র লাইন এক্স-এর তৎপরতার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

যুক্তি দ্বারা বুঝতে পারি যে, কেজিবি'র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শাখার দীর্ঘকালব্যাপী তৎপরতার খবর জাপান সরকার নিশ্চয়ই জানত। কিন্তু দেশটা কেন এ চুরি বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এবং যারা অমন খোলাখুলি

ওই চুরিতে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি তা আমার অজ্ঞাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও নিশ্চয়ই হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে, কেবল জাপানী গুপ্ত তথ্যই সোভিয়েতদের লক্ষ নয়। বহু জাপানী গবেষণা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, ল্যাবরেটরি আর কর্পোরেশন অনুরূপ আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ এবং দুই দেশের মধ্যে প্রতিনিধি দল, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীদের ব্যাপক বিনিময় হয়। যে সব জাপানী বিশেষজ্ঞ নিয়মিত যুক্তরাষ্টে যাওয়া-আসা করেন কেজিবি সক্রিয়ভাবে তাঁদের পিছু নেয় এবং আমেরিকার গোপন প্রযুক্তিগত তথ্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে রিক্রুটের চেষ্টা করে।

আগেই বলেছি, জাপানে আমার কাজটা ছিল রাজনৈতিক গোয়েন্দাবৃত্তি আর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে। এ কাজের জন্য আমার সাংবাদিক পরিচয়টি ছিল খুবই যুৎসই। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য জাপানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গোয়েন্দা তৎপরতার গুরুত্ব ছিল অনেক। তবে মুক্ত বিশ্বের অন্য যে কোন দেশের মত এখানেও রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। রাজনৈতিক গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে সোভিয়েত পলিটব্যুরো জাপানের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য এবং জাপান সরকারের ভবিষ্যৎ নীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনাদি সংগ্রহ করে। যুক্তরাষ্ট্র, গণচীন আর দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্কেও প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হয়। আমার যথেষ্ট সুযোগ ছিল চারদিকে ঘুরে বেড়াবার এবং সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এমন সব লোকের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার। একটি সাময়িকীর প্রতিনিধি হিসাবে এমন সব জায়গায় ঢুঁ মারতে পারতাম যেখানে বেশিরভাগ বিদেশী যেতে পারে না। অপরদিকে, আমরা কেজিবি এজেন্টরা ছিলাম 'ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি' বা কূটনৈতিক রেহাই থেকে বঞ্চিত। আমাদের নাম দূতাবাসের সীমিতসংখ্যক কূটনীতিবিদদের তালিকায় ছিল না। ধরা পড়লে আমাদেরকে কেবল কূটনীতিকদের মত বহিষ্কার করা হবে না, ধৃত গুপ্তচরের ভাগ্যবরণ করে নিতে হবে।

যে জাপানীর সাথে আমার প্রথম পেশাদারী যোগসূত্র স্থাপিত হয় তিনি জাপানী সোশ্যালিস্ট পার্টির এক নামজাদা সদস্য। কেজিবি তাঁকে সাংকেতিক নাম দেয় 'কিং'। মৃদুভাষী, দয়ালু চেহারা আর মনজয়ী হাসির মানুষ। জানতাম যে আদর্শগতভাবে তাঁর অবস্থান সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থানের খুবই কাছাকাছি এবং তিনি একজন মনেপ্রাণে সমাজতন্ত্রী। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি সোভিয়েতপন্থী। তবে তাঁর নাগালের মধ্যে যে সব তথ্য রয়েছে তা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। তাই যত্নের সাথে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে

তুলতে লাগলাম।

আমেরিকানরা অর্থ, মতাদর্শ, আপস আর অহমিকা (Money, ideology, compromise, ego) এ চারটি শব্দের ইংরেজী আদ্যক্ষর মিলিয়ে একটি শব্দ তৈরি করেছে MICE। গুপ্তচর জগতে এটি কোন টার্গেটের দুর্বলতা পরিমাপের, তাকে বিদেশী শক্তির এজেন্ট হতে রাজি করানো যাবে কিনা তা নির্ধারণের একটা মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয়। একজন গোয়েন্দা অফিসার কোন টার্গেটের দুর্বলতার মূল্যায়নে সব সময় এই 'মাইস' নিয়ে আরম্ভ করেন। তিনি খোঁজেন অর্থের প্রতি দুর্বলতা, আদর্শগত দুর্বলতা, আপস করার মত দুর্বলতা এবং অহমিকা—এর কোনটা রয়েছে টার্গেটের মধ্যে।

কিং-এর এসব দুর্বলতার কোনটাই আছে বলে মনে হলো না। তিনি মোটা বেতন পান। বৌ আর দুই বাচ্চা নিয়ে একটি সুন্দর ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। তিনি অহমিকাগ্রস্ত, কিংবা তাঁর যে কোন চরিত্রগত দোষ রয়েছে যা ব্যবহার করে তাঁকে আপস করতে বাধ্য করা যাবে এমন কোন তথ্য বা আভাস কেজিবি'র ফাইলে পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমি চোখ-কান সজাগ রাখলাম তাঁকে ধরার মত কোন একটা সূত্র পাওয়ার আশায়।

কিং-এর সাথে দেখা-সাক্ষাৎকালে আমি জাপানী মন-মানসিকতার কয়েকটি দিকের কথা মনে রাখার চেষ্টা করি। জাপানীরা কঠোর পরিশ্রমী, নিজেদের সংস্কৃতি ও রীতিনীতির প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। তাই আমি কিং-এর সাথে প্রতিটি লাঞ্চ ও ডিনারকে আবেদনময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করি। তাঁর পার্টির কাজে লাগতে পারে এমন কিছু ছিটেফোঁটা তথ্যও তাঁকে দিতে লাগলাম। তিনি ভাবলেন, আমি তাঁকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য দিচ্ছি। আসলে আমি দিচ্ছিলাম প্রাভদায় প্রকাশিত কিছু খবর। একই সাথে তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছিলাম জাপানী সোশ্যালিস্ট পার্টি সংক্রান্ত এমন কিছু খবর যা বেশ মূল্যবান বলে প্রমাণিত হয়।

একজন গোয়েন্দা অফিসারের সবচেয়ে মূল্যবান অস্ত্রগুলোর একটা হলো তোষামোদ। 'কিং'-এর সাথে বন্ধুত্বতা একটু জমে উঠতেই ওই অস্ত্রটি ব্যবহার করতে শুরু করলাম। অবশেষে একসময় বললাম, 'একটা বিষয় আপনাকে না বলে পারছি না। তবে এটা আর কাউকে জানাবেন না যেন। আমি যে পত্রিকায় কাজ করি ওটাকে সাধারণত মনে করা হয় ইউনিয়নের সাময়িকী। কিন্তু ওটা আসলে তার চাইতে বেশি। নিউ টাইমস হচ্ছে আন্তর্জাতিক ডিপার্টমেন্টের কাগজ। এতে জাপান বিষয়ে যে সংবাদভাষ্য ছাপা হয় তা সোভিয়েত

ইউনিয়নের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ, খোদ পলিটব্যুরো সদস্যরা পড়েন। কাজেই আমার দেয়া তথ্য সঠিক হওয়া চাই। তথ্য, ঘটনা বা তাদের উৎসের ব্যাপারে কোন ভুল করার উপায় আমার নেই। এজন্যই আপনাকে বন্ধু হিসাবে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। আপনি একজন উঁচুদরের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ। আপনি যা বলেন তার নির্ভুলতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। (এ কথাগুলোর দ্বারা আমি বোঝাতে চাইলাম, "দেখুন, মি. কিং. আপনি এক সাধারণ সাংবাদিকের সাথে কথা বলছেন না। কথা বলছেন এমন একজনের সাথে যাঁর লেখা সোভিয়েত ইউনিয়নে ভিআইপিরা পড়েন। আমার মাধ্যমে আপনি সোভিয়েত নেতৃত্বকে প্রভাবিত করতে পারেন)।" '

জানতাম তাঁর 'অ্যাকিলিস হীল', মানে দুর্বল স্থান খুঁজে পাব। অবশেষে পেলামও। মি. কিং মনেপ্রাণে চাচ্ছিলেন নিজস্ব একখানি পত্রিকা বের করতে। কিন্তু ইচ্ছাটা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁর নেই।

একদিন লাঞ্চে বসে জিজ্ঞেস করলাম পত্রিকার হাল-অবস্থা সম্পর্কে।

'সম্ভব নয়। টাকা জোগাড় করা যাচ্ছে না কোন উপায়ে,' জবাব দিলেন তিনি।

যতটা সম্ভব সহজভাবে 'হবে কিনা জানি না, তবে মনে হয় হতেও পারে। একজন ভাইয়ের মত এটা দিচ্ছি। অনুগ্রহ করে একই অনুভূতি নিয়ে গ্রহণ করুন,' বলে দশ লাখ ইয়েন ভর্তি একটা হলদে মোটা খাম রাখলাম টেবিলে তাঁর সামনে। বিব্রতকর অবস্থাটা কাটাবার জন্য আবার বলতে লাগলাম ও রকম একটা পত্রিকা বেরুলে কি সুবিধা হবে এবং এর প্রকাশে সামান্য সহায়তা করতে পেরে আমি কতটা আনন্দিত ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে খামটা তুলে নিলেন তিনি এবং চট করে পকেটে ভরে ফেললেন। লাঞ্চের শেষে যতটা সম্ভব কথার কথা বলার ঢং-এ আবার বললাম, 'ইয়ে, মানে, অতগুলো টাকা (ইয়েন) আমি নিজেই যে মেরে দিইনি তা প্রমাণ করার জন্য একটা রশিদ তো দরকার। যে কোন কাগজে শুধু একটা সই করে দিলেই হবে।'

তিনি পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে ওটার পিঠে তাড়াতাড়ি লিখে রসিদ সই করে দিলেন।

এটা' ঘটে শুক্রবার। সোমবার জরুরী ফোন কল পেলাম কিং-এর কাছ থেকে। রাজি হলাম লাঞ্চে মিলিত হতে। দেখা হতেই বুঝলাম যে তিনি উদ্বিগ্ন।

'কি হলো? আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন?' প্রশ্ন করলাম।

'না, না, দৈহিকভাবে অসুস্থ নই, তবে আমার কার্ডটা ফেরত পেতে হবে,' বললেন তিনি। 'আরে ভাই, খারাপ লোকের হাতে পড়লে ওই কার্ড আমার সর্বনাশ করবে, আমার রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করবে, আমার পরিবারকে আঘাত করবে।'

'অনুমান করেছি যে কার্ডটাকে ওভাবে ব্যবহার করা যায়,' বললাম বাধা দিয়ে, 'কিন্তু করা হবে না।'

'কোথায় ওটা এখন? সোভিয়েত দূতাবাসে?'

'আরে না, এতক্ষণে ওটা মস্কো পৌঁছে গেছে। শনিবার একজন বিশেষ কুরিয়ার এসেছিল। ওটা তার ব্যাগে ভরে দিয়েছি।'

ধীরে ধীরে অত্যন্ত হতাশ ও বিমর্ষভাবে তিনি এলিয়ে পড়লেন চেয়ারে। তাঁকে চাঙ্গা করার জন্য কিছুই করলাম না। মাস কয়েক পরে তাঁর নির্বাচনী অভিযানে সাহায্য হিসাবে আরও ৩০ লাখ ইয়েন দিয়েছি। পার্লামেন্ট সদস্য হতে না পারলেও এসব 'চাঁদার' দরুন সোভিয়েতদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হলো। 'কিং' এখন আমার লোক হয়ে গেলেন।

তাঁর সাথে আমার ব্যবহার ছিল বরাবরই সম্ভ্রমপূর্ণ ও ভদ্র, তবে ওই মুহূর্ত থেকে তাঁকে আমি আদেশ-নির্দেশ পালনে অভ্যস্ত করে তুললাম ক্রমে ক্রমে। 'কিং' নিজেকে একজন নির্ভরযোগ্য এজেন্ট রূপে প্রমাণ করলেন। অন্য এজেন্টদের কাজের তুলনায় তাঁর কাজের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে।

সুপরিচিত জাপানী সংবাদপত্র ইওমিউরি'র জনৈক প্রবীণ সাংবাদিকের সাথে আমার সম্পর্কটা ছিল অধিকতর জটিল ধরনের। তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন আরেকজন কেজিবি এজেন্ট। লোকটাকে আমার প্রথম থেকে সত্যি ভাল লেগে যায়। আমাদের পছন্দ, রুচি সবই এক রকম। একই রেস্তরাঁ, একই পার্কে আমরা যাই। একই প্রিন্টের শার্ট আমাদের ভাল লাগে। জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রায় একই রকম। সব বিষয়েই আমাদের অদ্ভুত মিল।

চল্লিশোর্ধ বয়সের এই সাংবাদিকই আমার পরিচিত প্রথম জাপানী যিনি আমাকে জাপানী সংস্কৃতি সম্পর্কে সবকিছু বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায়ই তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম জাপানী সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে। যথেষ্ট সময় নিয়ে তিনি পূর্ণ বিশ্লেষণ দিতেন। ধৈর্য ও কায়দা-কৌশল কাকে বলে তা তিনি জানতেন। জাপানী সমাজের কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাপানী বিচার ব্যবস্থার অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি খুব ধৈর্য

সহকারে বুঝিয়ে দিতেন আমাকে। আমাদেরকে প্রকৃত বন্ধুই বলা যেত। পার্থক্য ছিল শুধু এটুকু যে, প্রত্যেকবার তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর আমাকে রেসিডেন্সিতে গিয়ে যা আলোচনা হয়েছে সবকিছুর একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট লিখে দিতে হত।

আমাকে রিপোর্ট করতে হত তাঁর আর্থিক অবস্থা, পছন্দ-অপছন্দের ওপর, তিনি দামী পোশাকের জন্য লালায়িত কিনা, ওপরওয়ালা ও অধীনস্থদের সাথে তাঁর সম্পর্ক, নিজ দায়িত্বে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের ওপর। ডেপুটি রেসিডেন্ট প্রোন্নিকভ আর রেসিডেন্ট ইয়েরোখিন এসব রিপোর্ট বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে নির্দেশ দিতেন কিভাবে আমাদের বন্ধুত্বকে গভীরতর করা যায় এবং কেমন করে আমার বন্ধুকে পেশাদারী ভিত্তিতে আমার সাথে সহযোগিতা করতে কৌশলে রাজি করতে হবে।

কি ভণ্ডের মত কাজ করছি তা জানতাম। যে ভণ্ডামিকে সোভিয়েত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসাবে আমি ঘৃণা করতাম এখন সেটা আমার আচরণ ও কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে। একেক সময় আমার সাংবাদিক বন্ধুকে নিজের চক্রান্তজাল থেকে রক্ষা করার আবেগতাড়িত ও উদ্ভট প্রচেষ্টায় আমার রিপোর্টে এমন সব তথ্যাদি উল্লেখ করতাম না যা পেলে কেজিবি খুশি হবে বলে জানতাম। আমাদের সম্পর্ক নিয়ে দোটানার মধ্যে পড়ে মানসিক কষ্টে ভুগলাম। জাপানে একজন বন্ধুর প্রত্যাশী ছিলাম। কিন্তু কেজিবি অফিসার হিসাবে আমার ভূমিকা সেই বন্ধুত্বটাকে প্রহসনে পরিণত করেছিল।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে কেজিবি'র লোক হিসাবে রিক্রুট করতে সক্ষম হলাম বটে, কিন্তু নিজেকে মনে হলো হতাশ এবং নোংরা। রাতে ঘুমাতে পারতাম না। তিক্ত বিস্বাদে ভরে যেত মনটা। নির্দোষ লোককে জেলে পুরে একজন জেলরের যেমন লাগতে পারে আমারও তেমনি লাগত। অবশ্য জানতাম যে, আমার বন্ধু সত্যিকারভাবে নির্দোষ ছিলেন না। তিনি জেনেশুনে সোভিয়েতদের সাথে সহযোগিতা করছিলেন এবং সেজন্য অর্থ গ্রহণ করছিলেন। তবু তাঁকে তো আমিও প্ররোচিত করেছি। প্রলুব্ধ করেছি এমন এক মানুষকে যিনি হতে পারতেন আমার চির জীবনের বন্ধু। ব্যথাটা বুকে বাজে বৈকি। সম্প্রতি একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার পেশাটা আসলে কেমন ছিল। জবাব দিয়েছিলাম, 'আমারটা হচ্ছে জগতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম পেশা এবং প্রথমটার সাথে এটার বিশেষ পার্থক্য নেই। প্রথম প্রাচীনতম পেশা দেহকে প্রলুব্ধ ও দূষিত করে, দ্বিতীয়টা আত্মাকে।'

টোকিও শিমবুনে কর্মরত আরেক বড় সাংবাদিকের সাথে সম্পর্ক গড়তে গিয়ে আমার এক সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়।

'ফেলিক্স' ছিলেন সম্পাদকদের একজন। তাঁর সাথে রীতিমাফিক বন্ধুত্ব গড়ার চেষ্টা শুরু করলাম। লাঞ্চে বসে বা মদ খেতে খেতে আলাপ জমিয়ে তুললাম। 'ফেলিক্স'-এর সাথে পরিচয়টা করিয়ে দেন কেজিবি'র এক কর্নেল গেন্নাদি ইয়েভস্তাফিয়েভ।

ক্রমে ক্রমে ফেলিক্স আর আমার আলোচনায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের খবর, দু'জনের পঠিত বই ইত্যাদি বিষয় এসে পড়ল। এসব সাক্ষাতের রিপোর্ট দিতে লাগলাম। টোকিও রেসিডেন্সিতে শুধু নয়—মস্কোতে কেজিবি'র হেড কোয়ার্টারেও এসব রিপোর্ট পড়া হতে লাগল।

আমাদের বন্ধুত্ব গভীর ও দৃঢ় হয়ে ওঠার পর যাচাই করে দেখার সময় এল 'ফেলিক্স' আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে কি-না। একদিন লাঞ্চ খেতে খেতে বললাম যে, নিউটাইমস-এর প্রচার সংখ্যা সীমাবদ্ধ। ওটা শুধু সোভিয়েত পলিটব্যুরোর নেতারাই পড়েন। 'এ সংবাদ সাময়িকীর জন্য লিখুন না? অবশ্য ছদ্মনামে,' বললাম তাঁকে। 'আপনার লেখায় জাপানের বৈদেশিক নীতি কিরূপ নেবে সে বিষয়ে কিছু আগাম তথ্য থাকলে তা বিশেষ সমাদৃত হবে।'

'না,' সোজা অস্বীকার করলেন তিনি। 'দুঃখিত, কোন বিদেশী শক্তির সাথে সহযোগিতা করব না।' তারপর আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে আবার বললেন, 'আমার দুঃখ হচ্ছে, লেভচেঙ্কা-সান, এজন্য যে, তোমাকে একটা বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করতে হচ্ছে। তুমি একজন ভাল সাংবাদিক। তোমার জন্য খুবই দুঃখ হয় আমার।'

ফেলিক্স বিনয়ের সাথেই বলেছিলেন কথাগুলো। তবু টোকিও'র শিনাগাওয়া এলাকার প্যাসিফিক হোটেলের কফিশপে বন্ধু হিসাবে ওটাই ছিল আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। সাংবাদিক রিসেপশনে মাঝে মধ্যে তাঁকে দেখেছি, কিন্তু আমার উপস্থিতিকে তিনি পুরোপুরি উপেক্ষা করতেন। জাপানে অবস্থানকালে যেসব চমৎকার মানুষকে ভাল লেগেছে তাঁদের একজন ছিলেন তিনি। তাঁর সাথে যে স্বাভাবিকভাবে মিলিত হতে ও পরস্পরের বন্ধু হতে পারিনি এজন্য দুঃখ রয়ে গেল মনে।

গোয়েন্দাগিরিতে আমার সকল কাজ এমন আবেগজড়িত বা কঠিন কিংবা সফল ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজনের কথা বলি। তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছিলাম। লোকটা এক নামজাদা সাংবাদিক ছিলেন। এখন মাঝে মধ্যে এখানে-ওখানে লেখেন। তিনি জানতেন যে, আমি কেজিবি অফিসার। কার্যত এটা জানেন বলে তিনি গর্ববোধ করতেন। গোয়েন্দাগিরির প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। কাজ করতেন বিরামহীনভাবে। নানা তথ্য নিয়ে আসতেন আমার

কাছে। তথ্যগুলো স্পষ্টত সেদিনকার সকালের পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে, এসব দিয়ে চলবে না। তখন তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে অদ্ভুত, অবাস্তব, মনগড়া ও চাঞ্চল্যকর তথ্য বানিয়ে নিয়ে আসতে লাগলেন। একদিন করলেন কি, এসে জানালেন যে, পার্লামেন্ট সদস্য তোকুমা উৎসুনোমিয়া এবং প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা দাইসাকু ইকেদা আমেরিকার চর। বললেন, 'ইকেদা সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের সাথে কথা বলে ফিরে আসা মাত্রই 'সেই গোপন আলাপের বিষয়টা পুরোপুরি একজন আমেরিকানকে বলে দেন।'

'বলবেন না কেন ইকেদা?' প্রশ্ন করলাম। 'ওই আলাপের মধ্যে এমন গোপনীয় কি কি ছিল যে কাউকে তা বলা যাবে না? শত হোক, কোসিগিন একজন বিখ্যাত লোক। তাঁর নাম করে কথা বলতে চাইবে লোকে—এত স্বাভাবিক।'

'তা হতে পারে,' বললেন তিনি দুর্বলকণ্ঠে। 'তবে মি. কোসিগিন নিশ্চয়ই কাউকে বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।'

এর পরে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে তিনি উৎসুনোমিয়া সম্পর্কে আজগুবি-বানোয়াট অভিযোগ তুললেন। দাবি করলেন যে, উৎসুনোমিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয় সরকারের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন।

এ ধরনের আজগুবি গালগপ্পো শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে তাঁকে বলে দিলাম আমার সাথে যোগাযোগ না করতে। 'দরকার হলে আমিই ডাকব।'

আমার রিক্রুট করা একজন মূল্যবান এজেন্টের সাঙ্কেতিক নাম ছিল ভাসিন। ওর সাথে কোড নামের এক এজেন্ট ছিল। তার সাথে যোগাযোগ রাখত অন্য কেজিবি অফিসাররা। এই এজেন্ট তার ভারপ্রাপ্ত কেজিবি অফিসারকে জানায় যে, তার চেনাজানা এক লোক আছে। এক সংবাদ সাময়িকীর প্রকাশক। লোকটা ভাল এজেন্ট হতে পারবে। ওরা কাজটা আমার ওপর চাপিয়ে দিল। আমার ওপর ভার পড়ল লোকটার সাথে দেখা করে বাজিয়ে দেখার এবং সম্ভাবনাময় মনে হলে রিক্রুট করার।

লোকটাকে ফোন করে নিউ টাইমস্-এর প্রতিনিধি হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, তাঁর প্রকাশিত পত্রিকাটি আমার কত বেশি ভাল লাগে ইত্যাদি। তারপর সাক্ষাৎকার চাইলাম কয়েকটি বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাবের জন্য। দিন কয়েক পরে দেখা হলো লাঞ্চে। পঞ্চাশউর্ধ্ব বয়সের মানুষটিকে দেখে মনে হলো জীবনে বড় ধকল গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। দুটো জিনিস প্রথমেই নজরে পড়ল। তাঁর গায়ের জ্যাকেটটি অন্তত দুই সাইজ বড়। প্রেস ক্লাবের ক্যাফেটোরিয়ায়

প্রবেশ করে গোয়েন্দা অফিসারের মত সবার অলক্ষ্যে তিনি চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন প্রত্যেকটি মানুষকে।

প্রথম কয়েক মিনিটের আলাপেই বুঝে গেলাম পাকা ফলের মত গাছ থেকে টুপ করে আমার হাতে পড়ার জন্য তিনি একেবারে তৈরি। ইতোমধ্যে তাঁর সম্পর্কে নিয়মমাফিক খোঁজ-খবর নেয়ার কাজ চলছিল। অল্প দিনের মধ্যেই জানা গেল যে, আরও কয়েকজন এজেন্ট তাঁকে চিনত এবং তাঁর দেয়া তথ্য ও তাঁর বিচার বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখত। চতুর্থ কি পঞ্চম বৈঠকের পরে তাঁকে রিক্রুট করার উদ্যোগ নিতেই দেখলাম যে, স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। রিক্রুটমেন্টটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে আমার একজন সহকর্মী বিষয়টা কিছুদিন রিপোর্ট না করার উপদেশ দিলেন।

'মস্কোতে ওরা কখনো বুঝবে না যে, ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটতে পারে,' বললেন তিনি। 'তারা ভাববে যে রিক্রুটমেন্টের কাজটা তুমি তাড়াহুড়ো করে অসতর্কভাবে—এমনকি হয়তো বেপরোয়াভাবে করে ফেলেছ। এজন্য তোমাকে ও তোমার এজেন্টকে ওরা বিশ্বাস করবে না। ধীরে-সুস্থে, ঘুরিয়ে—পেঁচিয়ে এগিয়ে যাও।'

পরে জানালাম যে, ভাসিন একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট। ১৯৫০-এর দশক থেকে সক্রিয় ছিলেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টির বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে মতদ্বৈধতার কারণে দল থেকে বহিষ্কৃত হন। তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট তিনি আগের মতই রয়ে গেছেন।

কাজে লেগে গেলেন ভাসিন। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে লাগলেন জাপান সরকারের বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত সমস্যাবলী, গণচীন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সমস্যার ওপর। একেক সময় তাঁকে রিপোর্টের জন্য বলতে হত না। নিজ উদ্যোগেই তথ্য সংগ্রহ ও যোগান দিতেন। আমাদের দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁকে উপদেশ দেয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, ১৯৫০-এর দশকে জাপানী কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী থাকাকালে গোপন কার্যকলাপের মৌলিক কৌশলগুলো তিনি রপ্ত করে ফেলেছিলেন। ওসব তিনি কিছুই ভুলে যাননি।

ভাসিন প্রথম থেকেই অর্থ গ্রহণে কখনও দ্বিধা করেননি। যদিও শুরুতে সামান্যই তাঁকে দেয়া হত। যখনই যা করতে বলেছি বিনা প্রশ্নে করে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী ও চমৎকার এজেন্ট।

আমার ওপরওয়ালারা তাঁর অবদান স্বীকার করেন এবং সেগুলোর মূল্য উপলব্ধি করেন। আমি যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে না গেলে ভাসিনকে হয়তো

সোভিয়েতরা আরও বহুদিন শুধু তথ্য সংগ্রহের কাজেই নয়–প্রভাব বিস্তার, ধোঁকা দেয়া ও মিথ্যা প্রচারে ব্যবহার করত। তিনি যা করতেন সবই আদর্শগত কারণে।

গোয়েন্দা অফিসার হিসাবে আমার কাজ ছিল অপর দেশে সহযোগিতাকারী এজেন্ট খুঁজে বের করা এবং রিক্রুট করা। ওই কাজ করতে গিয়ে বড় রকমের বিপদে পড়েছিলাম কিনা তা প্রায়ই জানতে চাওয়া হয়েছে আমার কাছে। এর জবাব হচ্ছে হ্যাঁ এবং না। গোয়েন্দাগিরি পেশায় আমি ছিলাম সুশিক্ষিত। টোকিও'র রাস্তায় রাস্তায় কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা জেমস বণ্ডসুলভ ভেল্কিবাজির হাতিয়ার নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াইনি। ক্ষুদ্র অস্ত্র ও হ্যাণ্ডগানের ব্যবহার শেখানো হয়েছে আমাকে, তবে আমার আসল অস্ত্র ছিল সতর্কতা এবং সাধারণ বুদ্ধি। প্রধান লক্ষ্য ছিল কর্মরত থাকা, ধরা পড়া নয়। ধরা পড়লে জেলে যেতে হত।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যায় আমার কাজটা। রিক্রুট করার জন্য কাউকে প্রলুব্ধ করার সময় আমি হতাম শিকারী। কিন্তু ওকে তার দেশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার পরে আমি হয়ে যেতাম শিকার। জাপানী প্রতিগোয়েন্দা বাহিনী দুর্বল হতে পারে, কিন্তু অস্তিত্বহীন নয়। কোন এজেন্টের সাথে দেখা করলে কেন করছি তার একটা যুক্তি এবং বিশ্বাসযোগ্য কারণ সব সময় আমি তৈরি রাখতাম। এজেন্টটি সাংবাদিক হলে কিংবা জাপানী কর্তৃপক্ষ চ্যালেঞ্জ করলে তৈরি জবাবটা হত, সে আমাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কিছু বলার জন্য প্রলুব্ধ করছে কিংবা আমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। অন্য কথায় বলতে গেলে, আমি আমার লোককে ধরার পর নিজে ধরা পড়ার বিপদটা দেখা দিত। হ্যাঁ, প্রায়ই বিপদে পড়েছি, তবে প্রাণ হারাবার মত বিপদে পড়েছি খুবই কম।

অপরদিকে, আমার গোয়েন্দা জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতাকে এখন মনে হয় হাস্যকর। কিন্তু ওগুলো ঘটার সময় অনুভূতি ছিল ভিন্ন। জনৈক এজেন্টের সাথে সাক্ষাতের একটি ঘটনা মনে পড়ে। খুব সকালে বেরিয়ে যাই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। সরু অলিগলি আর রাস্তায় গাড়ি নিয়ে ঘুরলাম কয়েক ঘণ্টা, পিছনে যদি কোন অনুসরণকারী বা 'লেজ' থাকে তা ঝরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে। তারপর লোকের নজর পড়ে না এমন এক জায়গায় গাড়িটা পার্ক করে ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলাম একটা বড় স্কোয়ারে, যাতে মিশে যেতে পারি টোকিওর ব্যস্ত জনতার ভিড়ে। সেখান থেকে পাতাল রেলগাড়িতে উঠে চললাম সাক্ষাতের স্থানের দিকে। সবকিছু মনে হচ্ছিল নিরাপদ। নিশ্চিত বোধ করলাম যে, কেউ আমাকে অনুসরণ করেনি। হঠাৎ টের পেলাম যে, ট্রেনের যাত্রীদের বেশ কয়েকজন যেন

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমার দিকে। এটা খুবই অস্বাভাবিক। জাপানীরা বেশি কৌতূহলী নয়। তাছাড়া, টোকিওতে বিদেশীর অভাব নেই।

চট করে নজর বুলিয়ে দেখে নিলাম শার্টের বোতাম-টোতাম এবং প্যান্টের জিপার ঠিকমত লাগানো আছে কি-না। শেষ পর্যন্ত চোখ পড়ল আমার পায়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কেউ যেন এক বালতি বরফ গোলা পানি ঢেলে দিয়েছে মাথার ওপর। আমার ট্রাউজারে লেগে আছে দশ ইঞ্চি লম্বা একটি তার। পাতাল রেলের যাত্রীর ট্রাউজারে অমন জিনিস লেগে থাকার কথা নয়। লোকেরা যে বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাবে এতে আশ্চর্যের কি আছে! আমাকে দেখে ওরা নিশ্চয়ই মজা পাচ্ছিল। কিন্তু আমার জন্য পরিস্থিতিটা নিশ্চয়ই মজাদার ছিল না। অবশ্য জানতাম যে, রেসিডেন্সি থেকে আমি বিচ্ছিন্ন নই। এ সাক্ষাতের উদ্দেশে বেরুবার আগে টেকনিক্যাল অপারেশন অফিসার আমাকে ইয়াতাগান নামের একটি বিশেষ যন্ত্র দিয়েছিলেন। ওটা টেলিফোন 'বীপার'-এর মত দেখতে একটি ছোট্ট কালো বাক্স, কিন্তু এর কাজ ভিন্ন। কেজিবি রেসিডেন্সি যদি জাপানী প্রতিগোয়েন্দাদের বেতার যোগাযোগ শুনে বা অন্য কোন উপায়ে জানতে পারে যে, তার কোন অফিসার বিপদে পড়েছে তাহলে দূতাবাসের ছাদের ওপর থেকে একটা বেতার সঙ্কেত পাঠানো হয়। এ রকম ক্ষেত্রে বিপন্ন অফিসারটির প্যান্টের ভিতর লুকানো ইয়াতাগান কাঁপতে থাকে। এই কাঁপনের অর্থ হচ্ছে সাক্ষাৎ বাতিল করে অবিলম্বে ফিরে এসো। প্রত্যেক বেতার যন্ত্রেরই একটা অ্যান্টেনা থাকে। সেটা সাধারণত লুকানো থাকে ট্রাউজারেই সেফটি পিন দিয়ে আটকানো। স্পষ্টত, সেফটি পিনটা কোথাও হারিয়ে ফেলেছি এবং ফলে অ্যান্টেনাটি পা বেয়ে পড়ে গেছে নিচে। ওটা দেখেই হতভম্ব হয়েছে ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা। পরের স্টেশনে নেমে গিয়ে প্রবেশ করি পায়খানায়। ওখানে বসে ইয়াতাগানটা ঠিক করে ফেলি।

আমার সকল অভিজ্ঞতাই এ রকম হাস্যকর নয়। ১৯৭৮ সালে প্রায় ধরাই পড়ে গিয়েছিলাম। 'ইডো' কোড নামযুক্ত এক এজেন্টের সাথে সাক্ষাতের পরিকল্পনা করেছিলাম। এক প্রধান সংবাদপত্রের কর্মকর্তা 'ইডো' আমার জাপান আসার আগে থেকেই কেজিবি রেসিডেন্সির এজেন্ট। আমি তাঁকে পাই উত্তরাধিকারসূত্রে। কিন্তু তাঁকে আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারিনি। প্রত্যেকবার সাক্ষাতের সময় তিনি দাবি করতেন যে, আগের দিন কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ লোকের সাথে, লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা কোন কেবিনেট মন্ত্রীর সাথে ডিনার খেয়েছেন। আমার হাতে ৯০ হাজার থেকে দেড় লাখ ইয়েনের রেস্তরাঁর রসিদ তুলে দিয়ে বলতেন শোধ

করে দিতে। এসব সাক্ষাতের রিপোর্ট চাইলে কয়েক টুকরো কাগজ বের করে দিতেন। ওতে আঁকিবুকি করে যা লেখা থাকত তার সাথে ওই সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কোন সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যেত না। তারপরে তিনি শুরু করতেন তাঁর ব্যয়ের কোন্ কোন্ অংশ আমার বহন করা উচিত এবং তাঁর পারিশ্রমিক কত হওয়া উচিত তা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে দরকষাকষি। এই অনির্ভরযোগ্য ভাঁড়টাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। প্রকৃত মূল্য আছে এমন কোন তথ্য তিনি কখনও দেননি। তাই, সেই শীতের রাতের সাক্ষাৎকারটার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল না।

সন্ধ্যা ৬টার দিকে ড্রাইভ করে চলে গেলাম য়ুয়োগি স্টেশনে। গাড়িটা রেখে দিলাম পাশের এক রাস্তায়। ট্রেনে উঠে চলে গেলাম শিনজুকু স্টেশনে। সেখানে নেমে পাতাল রেলে পঁয়ত্রিশ মিনিটে চলে গেলাম ইকেবুকোরো। ওখানে নেমে পুরুষদের বিশ্রাম কক্ষে গেলাম। ওয়াস বেসিনে হাত ধোয়ার সময় হঠাৎ মনে হলো কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে। এ পর্যন্ত আসার সময় কেউ যে আমাকে অনুসরণ করেনি এটা জানতাম বলে বুঝলাম যে, এখানে যদি অনুসরণকারী থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে প্রতিগোয়েন্দা পিছু নিয়েছে এখান থেকেই। তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, আমার অনুসরণকারীরা 'ইডো'র সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত সময়সূচী সম্পর্কে অগ্রিম খবর পেয়েছে।

পাতাল রেল স্টেশন থেকে ওঠে গেলাম ওপরে। দেখলাম 'ইডো' দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার মোড়ে। আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। এ ধারণা ঝেড়ে ফেলতে না পেরে চলতে লাগলাম বিপরীত দিকে। প্রায় পনেরো মিনিট চলার পর বুঝলাম যে, এক তরুণ হেঁটে যাচ্ছে আমার আগে আগে। বেচারা জানে না কোথায় যাচ্ছে। আসলে সেও একজন অনুসরণকারী। তার ওপর পড়েছে কঠিনতম কাজটা—টার্গেটের পিছন থেকে অনুসরণ নয়, আগে আগে যাওয়া। ঠিক পথে যাচ্ছে কি-না বোঝার জন্য তাকে থামতে হচ্ছে বারে বারে কোন দোকানের দরজায়, দেখতে হচ্ছে আমি কোন দিকে যাচ্ছি। মিনিট দশেক পরে টের পেয়ে যাই যে, আরও তিন-চারজন অনুসরণকারী রয়েছে আমার পিছনে। 'ইডো'কে বিশ্বাস না করলেও তাঁকে ওদের চোখে ধরিয়ে দিতে পারি না। আমার পিছনে প্রতিগোয়েন্দা লাগার তিনিই যদি কারণ হন, তাহলে আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা তিনি আবারও করবেন। আর যদি না হন, তাহলে তো তাঁকে রক্ষা করাই আমার কর্তব্য।

একটা টেলিফোন বুথের সামনে থেমে গেলাম। বৌ-এর সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। অনুসরণকারীরা যাতে শুনতে পায় তেমন চড়া স্বরে। 'কোথায়

ছিলে এতক্ষণ?' বললাম চেঁচিয়ে। 'এখানে আমার সাথে ডিনারের জন্য একত্র হবার কথাটা ভুলে গিয়েছ?'

'হায় ঈশ্বর! স্তাস, তুমি কি বিপদে পড়েছ?'

'না, না, অবশ্যই অপেক্ষা করব না আমি। কি বিচ্ছিরি কাণ্ড। তোমার এখানে পৌঁছতে দেড় ঘণ্টা লেগে যাবে।' ওর কথা যেন শুনছি এমনভাবে একটু অপেক্ষা করে আবার বললাম, 'না, তুমি কোথাও খেয়ে নাওগে। আমি এখানে কিছু খেয়ে নিতে পারব।'

'তোমার সাহায্য দরকার?' জিজ্ঞেস করল সে উদ্বিগ্নভাবে।

'না, না, আমি হতাশ হয়েছি। যাক, যা হবার হয়েছে। আবার এক সময় আমরা এখানে খাব।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে চলে গেলাম কাছাকাছি একটা ইয়াকিটোরিইয়াতে। খাবারের অর্ডার দিয়ে বসলাম জানালার মুখোমুখি একটা টেবিলে—যাতে রাস্তার দিকে নজর রাখতে পারি। রাস্তার ঠিক বিপরীত দিকে দু'টি বিভিন্ন রুটের বাসস্টপ। লক্ষ্য করলাম একজন লোক অপেক্ষা করছে। একটা বাস এল। কয়েকজন যাত্রী উঠল। বাসটা চলে গেল। কিন্তু ওই লোকটা রয়ে গেছে। অপরদিক থেকে আরেকটা বাস এল। এ বাসেও গেল না লোকটা। লোকটা অনুসরণকারী দলের আরেকজন। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে আমাকে। স্বাভাবিক আচরণই করলাম আমি। খাওয়া শেষ করে ধীরভাবে বেরিয়ে বাড়ি চলে গেলাম।

রেসিডেন্সিতে ওই ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট করতে গিয়ে উল্লেখ করলাম যে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস 'ইডো' একজন ডাবল এজেন্ট। আমার জন্য বড় রকমের বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। উল্লেখ করলাম যে, লোকটি (ইডো) অনুপযুক্ত ও অনির্ভরযোগ্য। তিনি আমার কার্যকারিতা হ্রাস করতে এবং আমার সাংবাদিক পরিচয়টি নষ্ট করে দিতে পারেন। তাঁকে পরীক্ষা করে দেখার ও আমার সন্দেহ সত্য কি-না তা যাচাই করার ইচ্ছাও ব্যক্ত করলাম রিপোর্টে।

'ইডো'র সাথে আরও দুটো সাক্ষাতের পর নিশ্চিত হলাম যে, তিনি ডাবল এজেন্ট। সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, সোভিয়েতের জন্য তাঁর কোন মূল্যই থাকতে পারে না। তিনি অতিমাত্রায় লোভী এবং অর্থ আদায়ে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছিলেন। রেসিডেন্সির অনুমতিক্রমে অবশেষে তাঁকে জানিয়ে দেই যে, তাঁর সেবার আর প্রয়োজন নেই।

শেষ সাক্ষাতের সময় বরাবরের মতই হলদে খামটি যখন দিলাম না তখন

তাঁর মুখটি লাল হয়ে উঠল।

'হারামজাদা!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'তোমার টাকা (ইয়েন) দেয়ার কথা আমাকে। টাকা দাও, নইলে কেলেঙ্কারি বাধাব।'

'পারলে বাধান। যান না একটু এগিয়ে। বাইরে পুলিশ আছে। পুলিশকে গিয়ে বলুন যে, আপনি একজন সোভিয়েত এজেন্ট। যান, যান। তারপর দেখা যাবে কার গায়ে বেশি চোট লাগে, আপনার না আমার।'

রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলাম। ইডো এসে আমার জামার হাতা ধরে চেঁচাতে লাগল, 'তুমি একটা চোর, প্রতারক! তুমি নীচ, কঞ্জুস! তুমি ভাল লোক নও!' প্রথম ট্যাক্সিতে তাঁকে তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করার আগে বললাম, 'আপনাকে যেন আর কোনদিন না দেখি।'

মাস দুয়েক পরে একদিন সকালে ফোন বেজে উঠল। ইডো। মাতাল অবস্থায় কিছু বলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ অসংলগ্ন প্রলাপ। রেখে দিলাম রিসিভার। আর কখনও ফোন করেননি।

যে যে ক্ষতি তিনি করতে পারেন তা ভেবে উদ্বিগ্ন রইলাম। মাস কয়েক খুব সাবধানে চললাম। সাংবাদিকতার কাজে বেশি জোর দিলাম। তবে জাপানী প্রতিগোয়েন্দাদের তৎপরতা বৃদ্ধির কোন প্রমাণ পেলাম না। ওরা মাঝে মধ্যে পিছু নেয় এবং নিলে কি করতে হয় তা আমি জানি।

আমার কাজ ছিল গোপনীয়। আমি ব্যবহার করতাম রেডিও, টেপ রেকর্ডার, এমন সব অ্যাটাশে-কেস অপর লোকে খুললে যেগুলোর ভিতরকার জিনিসপত্র ধ্বংস হয়ে যায়। আমার সাথে থাকত গুপ্তলিপি এবং অনেক ধরনের ক্যামেরা। প্রতিগোয়েন্দাদের নজরের মধ্যে চলাফেরা ও কাজ করার সময় আমাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাব বজায় রাখতে হত। এজেন্টদের সাথে দেখা করতে গেলে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে হত যে, কেউ পিছু নেয়নি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, জাপানী প্রতিগোয়েন্দা তৎপরতা খুব কড়া ছিল না। কোন কোন সময় তিন-চার দিন কেউ অনুসরণ করত না আমাকে। কিন্তু যেটুকু তৎপরতা ছিল সেটা প্রথম শ্রেণীর এবং পেশাদার। বিড়াল-ইঁদুর খেলার ইঁদুর হিসাবে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতাম আমাকে যারা পাহারা দিচ্ছে তাদের না চটাতে। বস্তুত সোভিয়েত দূতাবাসের ওপর নজর রাখত যারা তাদের সাথে আমি এক রকম ভাব জমিয়ে ফেলেছিলাম। যেমন ধরুন, গাড়ি পার্ক করতাম একটা বড় কার পার্কিং-এর জায়গায়। তারপর ভুলে যেতাম কোথায় ওটা রেখেছি। জানতাম আমাকে পাহারা দেয়া হচ্ছে। সাদা পোশাকের লোকটার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করতাম, 'গাড়িটা কোথায় রেখে গিয়েছি জানেন?

কোথায় যে রাখলাম একদম মনে পড়ছে না।' হেসে ফেলত লোকটা। দেখিয়ে দিত আমার গাড়ি।

প্রায় সময়েই এজেন্টের সাথে দেখা করতে যাবার সময় পথ পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে প্রথমে চলে যেতাম উচিশাইওয়াইকোর প্রেস সেন্টার বিল্ডিং-এ। সদস্য কার্ড ছাড়া ওখানে ঢোকার অনুমতি নেই কারও। কার্ড দেখাতে হয় দরজায়। এ ব্যাপারে ওরা এত কড়া যে, জাপানী প্রতিগোয়েন্দা এজেন্টদেরও ঢুকতে দিত না। এই এজেন্টরা ওভাবে হেনস্তা হতে চাইত না। তাদের জন্য ব্যাপারটা ছিল বিরক্তিকর। তাই ওখানে যাবার পথে আমাকে কয়েক মিনিট অনুসরণের পর একজন আমার কাছে ঘেঁষে জিজ্ঞাসা করত, 'মাফ করবেন, স্যার, আপনি কি প্রেস সেন্টারে যাচ্ছেন?' ওখানে যাচ্ছি বললে অনেক সময় ওরা চলে যেত। প্রেস সেন্টারের দরজায় কার্ড দেখাতে না পেরে হেনস্তা হওয়াকে ওরা সত্যি ঘৃণা করত।

তাছাড়া, ওদের লোকবলও ছিল বড় কম। ফলে আমাকে বা অন্য সন্দেহভাজনদের নিয়মিতভাবে অনুসরণ করতে পারত না। জাপানী প্রতিগোয়েন্দা তৎপরতার দুর্বলতার এটাই বোধহয় অন্যতম কারণ।

সোভিয়েত দূতাবাসের ওপর নজর রাখার জন্য নিয়োজিত জাপানী প্রতিগোয়েন্দা টিমে ছোট্ট বেঁটে গোলমুখো একজন ছিল। লোকটা আমাকে একদম পছন্দ করত না। কেন, তা কখনও জানতে পারিনি। তবে কোন্ কারণে আমাকে দেখলেই উত্তেজিত হয়ে উঠত লোকটা। একদিন দূতাবাস থেকে ড্রাইভ করে উদাগাওয়া-চোতে বাড়ি ফিরে দেখি এই অফিসার আমাকে অনুসরণ করে আমার দোরগোড়ায় উপস্থিত। তার ভাবসাবে মনে হলো সে আমার ঘরে ঢুকতে চায়। সেদিন অল্পের জন্য আমাদের দু'জনের মধ্যে ঘুসোঘুসি বাধেনি।

১৯৭৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত বিমানবাহিনীর জনৈক সিনিয়র লেফটেন্যান্ট, ভিক্টর বেলেঙ্কো একটা মিগ-২৫ বিমান নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে জাপানী দ্বীপ হোক্কাইডোর বেসামরিক বিমান বন্দরে অবতরণ করে। ক্রুদ্ধ সোভিয়েত দূতাবাসে হুলস্থুল পড়ে গেল। বৈমানিক আর বিমান ফেরত দেয়ার জন্য জাপানকে রাজি করাতে দূতাবাস কোন চেষ্টাই বাকি রাখল না। কিন্তু বেলেঙ্কো প্রকাশ্যে অস্বীকার করল সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে যেতে। সে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করল যুক্তরাষ্ট্রে। জাপান তাকে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে দিল এবং আমেরিকানরা মিগ বিমানটি ও তার সব যন্ত্রপাতি দেখার

সুযোগ পেল। এ ঘটনার দরুন আমাদের ওপর দিয়ে যে ধকল গেল তাতে অবসন্ন হয়ে পড়ি সবাই। গভীর রাতে বাড়ি ফিরছি, দেখি, আমার গোলমুখো বেঁটে বন্ধুটি দূতাবাসের বাইরে দাঁড়ানো।

'কেমন লাগছে! আপনাদের পাইলট তো মারা গেল!' চেঁচিয়ে বলল সে আমাকে। স্পষ্টত, সে জানে না যে, বেলেঙ্কো শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেই পালায়নি, যুক্তরাষ্ট্রকে একটি মূল্যবান উপহার দিয়েছে।

'আমরা আপনাদের মিগ সম্পর্কে সবাই এখন জেনে গিয়েছি।' বলল সে।

'গোল্লায় যাও!' রেগে বললাম তাকে। গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে লোকটা।

যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসার পর বেলেঙ্কোর সাথে দেখা হয়েছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছি আমরা। ওই গোলমুখো জাপানীর প্রসঙ্গ উঠলেই হো-হো করে হেসে সে বলবে 'ও তোমাকে খুঁচিয়েছে বলে আমি খুশি। খোঁচা তোমার দরকার ছিল।'

বেলেঙ্কোর কথাই ঠিক। আমার ওটা দরকার ছিল।

একজন গোয়েন্দা অফিসারের জন্য স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অসম্ভব। আমার অধিকাংশ দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারগুলো নির্ধারিত থাকে মাঝরাতে। এ জন্যে সন্ধ্যায় বাড়িতে থাকা প্রায়ই হয়ে উঠত না। যেদিন থাকতাম সেদিন এতই ক্লান্ত থাকতাম যে, ঘুমিয়ে পড়তাম চেয়ারে বসা অবস্থায়। কোন সহজ কাজও সহজভাবে করার উপায় ছিল না। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কাজে যাব? আমার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না, কারণ সব সময় আমাকে সতর্ক থাকতে হত যাতে কারও নজরে না পড়ি। জাপানী প্রতিগোয়েন্দারা অবশ্য লোকবলের ঘাটতির দরুন সব সময় আমার বাড়ির ওপর নজর রাখতে পারত না। তবে বাড়ির চৌকিদারকে ওরা আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগাত। তাই সামনের দরজা দিয়ে খুব কমই বের হতাম। বের হলে চৌকিদার সময়টা লিখে রাখত এবং রিপোর্ট করত। বছরের পর বছর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি 'ফায়ার একসিট' মানে বাড়িতে আগুন লাগলে যে পথে বেরুতে হয় সেটা ব্যবহার করেছি।

১৯৭৭ সালের বসন্তে কেজিবি'র অষ্টম ডাইরেক্টরেট একজন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞকে জাপানে পাঠায় তিন মাসের জন্য। আসার পর তাকে যে ভিসা দেয়া হয় তাতে বলা হয় যে, জাপানী বৈদেশিক মন্ত্রণালয়কে আগে না জানিয়ে সে টোকিও ত্যাগ করতে পারবে না। সে আসার কয়েকদিন পরেই আমাকে তলব করা হয় রেসিডেন্টের অফিসে। গিয়ে দেখি রেসিডেন্ট এবং ওই বিশেষজ্ঞ আমার জন্য অপেক্ষারত।

'এ ভদ্রলোক ইয়োকোতায় অবস্থিত আমেরিকান ঘাঁটির অবস্থান স্বচক্ষে

দেখতে চান,' শুরু করলেন রেসিডেন্ট।

'ঠিক আছে,' বললাম জবাবে।

'আমার মনে হয় বিষয়টা তুমি বুঝতে পারোনি, স্তানিস্লাভ,' বললেন তিনি। 'এ কাজটা হবে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, জাপানী বিদেশ মন্ত্রককে না জানিয়ে তাঁর টোকিওর বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ এবং তিনি জানাতে চান না। তাঁকে নিয়ে যাবে তুমি। কাজটা তোমাকেই করতে হবে।'

একেই বলে গ্যাঁড়াকল। জানতাম যে জাপানী পুলিশের হাতে ধরা পড়লে এ মিশনটার পরিণাম বিচ্ছিরি আকার নেবে। তাই বললাম তাঁকে।

'তা হলে ধরা পড়ো না। যা-ই ঘটুক, পুলিশ থামতে বললে থামবে না। এ অপারেশনের নিরাপত্তার জন্য তুমি, লেভচেঙ্কো, সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবে।'

কি আর করা!

পরের দিনটা ছিল শনিবার। ইয়োকোতো যাবার জন্য সেদিনটাকেই সেরা দিন বলে বেছে নিলাম আমরা। ওখানে আগে কখনও যাইনি। তাই জায়গাটার অত্যন্ত সঠিক ম্যাপ আর বিবরণ চাইলাম রেসিডেন্সির কাছে। আমার অষ্টম ডাইরেক্টরেটের সঙ্গীটি সমস্যাটা আরও জটিল করে তুলল এই বলে যে, সে আমেরিকান স্থাপনাগুলোর যতটা সম্ভব কাছে যেতে চায় ওদের যোগাযোগ অ্যান্টেনাগুলোর সঠিক অবস্থান জানার জন্য। আমাকে যে সব ম্যাপ আর তথ্যাদি দেয়া হলো সেগুলো কয়েকবার দেখে এবং যাচাই করে নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম। ইয়োকোতায় পৌঁছে আমরা গিয়ে পড়লাম সঙ্কীর্ণ রাস্তা আর গলির গোলক ধাঁধার মধ্যে। অল্পক্ষণের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললাম। সঙ্কীর্ণ রাস্তা আর গলি ম্যাপে ছিল না।

শেষ পর্যন্ত মনে হলো যে, সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু সঠিক পথের বদলে আমরা সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লাম আমেরিকান ঘাঁটির প্রধান ফটকের ভিতরে। 'সর্বনাশ! বারোটা বেজে গেছে আমাদের!' বলল আমার সঙ্গী। গার্ডরা নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। হুইসেল বাজাতে বাজাতে ওরা ছুটতে লাগল আমাদের পিছনে।

একজনতো পিস্তলই বের করে ফেলল।

আমি একটা 'ইউ' টার্ন নিয়ে গাড়িটাকে থামালাম গেট-এ। চেহারায় বদ্ধ মাতালের ভাব ফুটিয়ে মাথা বের করে ইংরেজীতে বললাম, 'মাফ করো ভায়ারা, দুঃখিত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, বুয়েছ? শালার রাস্তাগুলো কোতায় গেল, বাওয়া? কোন্ শালা রাস্তা সরাল?'

এবার হেসে ফেলল সেন্ট্রি। হাত নেড়ে আমাদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল।

আয়নায় তাকিয়ে দেখলাম সেন্ট্রি আর গার্ডরা হা করে তাকিয়ে আছে আমাদের গাড়ির দিকে।

জাপানে ছিলাম চার বছর। চারটি কঠোর পরিশ্রমের বছর। বারো থেকে পনেরো ঘণ্টা খাটতে হত প্রতিদিন। মাসে গড়ে বিশ-পঁচিশটা সাক্ষাৎ করেছি এজেন্টদের সাথে কিংবা নতুন লোকের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। অতটা করতে গেলে নিরাপত্তার সকল নিয়মরীতি লঙ্ঘিত হয়। কিন্তু কোন উপায় ছিল না না করে।

ওপরওয়ালারা বেশি বেশি কাজ দাবি করতে থাকেন আমার কাছে। আমার কয়েকজন এজেন্ট অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করায় তাঁরা ওদের কাছ থেকে আরও বেশি বেশি তথ্য চাইতে থাকেন। একেক দিন ক্লান্তিতে প্রায় ঢলে পড়তাম। একদিনের কথা মনে পড়ে। দিনটা যে শেষ হবে ভাবতে পারিনি।

বরাবরকার মত সেদিন ঘুম থেকে উঠেছিলাম সকাল ৭টায়। ৯টায় পৌঁছে যাই রেসিডেন্সিতে। ৯টা ১৫ মিনিটে ডেপুটি রেসিডেন্ট প্রোন্নিকভের সাথে সেদিনকার জন্য নির্ধারিত দু'টি সাক্ষাতের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করি। প্রথম সাক্ষাৎটা ছিল ভাসিনের সাথে এবং দ্বিতীয়টা আরেস-এর সাথে। সাড়ে ন'টার মধ্যে পথ পরিষ্কার করার জন্য (অনুসরণকারীদের ঝেড়ে ফেলার জন্য) যে যে রুট ব্যবহার করব সেগুলো ম্যাপে দাগিয়ে ফেলি। ম্যাপটা দিতে হবে সিস্টেম জেনিথ যিনি অপারেট করেন সেই অফিসারকে। সিস্টেম জেনিথ হচ্ছে জাপানী প্রতিগোয়েন্দা টহলদার কারগুলোর বেতার-বার্তা ধরার ব্যবস্থা।

৯টা ৪৫ মিনিটে দূতাবাস ত্যাগ করে লেগে যাই পথ পরিষ্কারে। প্রথমে যাই হারাজুকুতে। দোকানে দোকানে কেনাকাটার ভান করি। সেখান থেকে ড্রাইভ করে চলে যাই শিবুইয়াতে। আধঘণ্টার মত অলিগলিতে ড্রাইভ করে পৌঁছি শিনজুকুতে। সেখানে গাড়ি পার্ক করি। দশ পনেরো মিনিট হেঁটে বেড়াই। মাঝে মধ্যে থেমে 'উইণ্ডো-শপিং', তারপর ঘড়ি দেখে হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুর কথা মনে পড়ার মত ভাব দেখিয়ে ছুটে যাই বড় রাস্তায়, ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসি। ট্যাক্সিতে শিমবাশি গিয়ে ভাসিনের সাথে মিলিত হই বেলা দুপুরে এক কফি শপে। ১-৩০-এ সাক্ষাৎ শেষ হয়। ভাসিন চলে যায়। ওকে সরে পড়ার জন্য প্রায় দশ মিনিট সময় দিয়ে আমিও চলে আসি।

ট্যাক্সি নিয়ে শিনজুকু আসি। সেখান থেকে গাড়িটা নিয়ে দূতাবাসে ফিরি প্রায় আড়াইটায়। সেখানে বসে ভাসিনের সাথে সাক্ষাতের রিপোর্ট তৈরি ও

সেটা দাখিল করে প্রোন্নিকভের অফিসে যাই। ৫ টায় প্রোন্নিকভের সাথে আলোচনা করি সন্ধ্যায় আরেস-এর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে। সিস্টেম জেনিথের অফিসারের সাথে ব্যবস্থা করি। যে ড্রাইভার আমাকে সাক্ষাতের জায়গায় নিয়ে যাবে তার সাথে দেখা করি। কোন্ কোন্ রুটে যাব এবং কোথায় আবার মিলিত হব তা আলোচনা করি। প্রায় ৭টার দিকে বাড়ি ফিরে টেলিভিশনে খবর দেখি, সান্ধ্য পত্রিকাগুলোতে চোখ বুলাই। ঘণ্টাখানেক পরে বেরিয়ে পড়ি। ড্রাইভ করে এলে যাই দক্ষিণ কোরীয় দূতাবাসের কাছে এক বাগানে। সেখান থেকে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করি নানা রাস্তা ও গলিতে, যাতে নিশ্চিত হতে পারি যে, কেউ আমার পিছু নেয়নি। রাত ৯টায় আমাদের দূতাবাসের ড্রাইভারের সাথে পরিকল্পনা মত মিলিত হই। তার গাড়িতে উঠে চলে যাই আরেস-এর সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত স্থানে। রাত ১০টায় পৌঁছে যাই ইয়াগুমোর আবাসিক এলাকায়। গাড়িটা নিয়ে চক্কর দিতে থাকি এলাকাটায়। মিনিট পনেরো পরে আরেসকে দেখি রাস্তা পার হয়ে আসছে। গাড়ি ছেড়ে একত্র হই ওর সাথে। ইতোমধ্যে ড্রাইভার চক্কর দিতে থাকে আগের মত। উদ্দেশ্য প্রতিগোয়েন্দা টিম হঠাৎ উপস্থিত হলে আমাকে তুলে নিয়ে চম্পট দেবে।

আরেস আর আমি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে থাকি। বিশ মিনিটের ওই সাক্ষাতের সময় আরেস চার রোল ফিল্ম দেয় এবং আমি তাকে দিই ওর পারিশ্রমিকের খামটি। পরবর্তী সাক্ষাতের সময় স্থির করে দ্রুত বিদায় নিই পরস্পরের কাছ থেকে। ফিরে আসি আমার গাড়িতে। খুব সাবধানে ড্রাইভার আর আমি চলে যাই এক রেস্তরাঁয়। দু'জনে দুটো ড্রিঙ্ক গলায় ঢালি। ফিল্ম রোলগুলো নিয়ে ড্রাইভার চলে যায় দূতাবাসে। আমি ফিরে যাই আমার গাড়ি যেখানে রেখে এসেছি সেখানে। শেষ পর্যন্ত ফিরতে পারি বাড়িতে। আঠারো ঘণ্টা পরিশ্রমের পরে ঢলে পড়ি বিছানায়। এ রকম দিন আমাকে প্রায়ই কাটাতে হয়েছে।

ঘুমিয়ে পড়ছি এমন মুহূর্তে চমকে জেগে উঠলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যে ড্রাইভারটি ফিল্ম নিয়ে যাচ্ছে সে তো দূতাবাসের ড্রাইভার মাত্র, কুরিয়ার নয়। তাকে বলা উচিত ছিল যে, সে যদি কৌটাটি খোলার চেষ্টা করে তাহলে ওটা বিস্ফোরিত হবে। কেজিবি ফিল্ম বহনের জন্য বিশেষ ধরনের কৌটা ব্যবহার করে। ধাতুর তৈরি এ বস্তুগুলো কালো ভাইনিল দিয়ে আবৃত। ভিতরে ফিল্ম রাখার ছ'টি খাঁজ থাকে। রোলগুলো খাঁজে খাঁজে বসিয়ে কৌটাটি তালাবদ্ধ করার পরে ওটা প্রকৃত অর্থেই বোমায় পরিণত হয়। তালার

ইগনাইটগুলোর কথা যার জানা নেই সে ওটা খোলার চেষ্টা করলেই ঘটবে বিস্ফোরণ এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিল্মগুলো যাবে ধ্বংস হয়ে। আমি নিজেও ওই বস্তু খুলতে পারি একমাত্র কেজিবি রেসিডেন্সিতে। অন্যথায় আমার ওপর নির্দেশ আছে ঃ 'কোন বিপদ দেখলে, কিংবা পুলিশ তোমাকে থামালে, ট্রিগারটায় চাপ দিয়ে গাড়ির জালানা পথে যত দূরে সম্ভব ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।' ওরকম করলেও পোড়া যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

ড্রাইভারের কৌটাটি খোলার অনেক নির্দোষ কারণ থাকতে পারে। যেমন—সে ফিল্ম নিয়ে যাচ্ছে জানে। তাই দূতাবাসে পৌঁছে ওগুলো কৌটা থেকে বের করে তার উপরঅলার হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর সেটা করতে গেলেই ঘটে যাবে বিস্ফোরণ।

কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সম্ভাব্য বিপদ ঠেকানোর চেষ্টা করার আর সময় নেই। আরেস-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে দূতাবাস থেকে বহু মাইল দূরে। তার পরে আমার গাড়ির কাছে গিয়ে ওটা নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। ইতোমধ্যে ড্রাইভারের দূতাবাসে পৌঁছে যাবার কথা। ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিলাম যা হয় হোক, অপেক্ষা করব কাল সকাল পর্যন্ত। ভাগ্যক্রমে কৌটাটি দূতাবাসের একজন বিশেষজ্ঞই খোলেন এবং আমাকে ভুলের জন্য কোন মূল্য দিতে হয়নি।

আরেকটা সমস্যা সৃষ্টি করেছিল ওই একই আরেস। তাকে মনে করা হত রেসিডেন্সির সবচেয়ে মূল্যবান এজেন্টদের অন্যতম। তাই জরুরী অবস্থায় সে যাতে দূতাবাসের ছাদে সরাসরি সিগন্যাল পাঠাতে পারে সেজন্য তার গাড়িতে একটা বিশেষ ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র বসিয়ে দেয়া হয়। ওটা থাকে আরেস-এর গাড়ির রেডিও'র মধ্যে লুকানো। রেডিও'র ভিতরে মাত্র গুটিকয়েক বাড়তি ট্রানজিস্টর স্থাপন করেই ওটা তৈরি। জরুরী পরিস্থিতি দেখা দিলে রেডিও চালু করে একটা বোতাম টিপলেই হলো। এ রেডিওটি যে স্বাভাবিকের চেয়ে আলাদা তা বুঝতে পারবে শুধু একজন রেডিও মেকানিক এবং তাও রেডিওটাকে খুলে ফেলার পরে।

আরেস ছিল স্পোর্টস কারের ভক্ত। গাড়ি পুরানো হতে দিত না। তিন বছর পরপর একটি নতুন গাড়ি কিনত। গাড়ি কেনার পয়সার সিংহভাগ জোগাত কেজিবি। একদিন আরেস ভাবল তার একটি নতুন গাড়ি দরকার। আমার কাছ থেকে নগদ টাকা (ইয়েন অর্থে) পেয়েই ঝট করে কিনে ফেলল একটা ঝকঝকে নতুন সুন্দর গাড়ি। অতীতে ডিলারকে পুরানোটা ফেরত দেয়ার আগে বিশেষ ধরনের রেডিওটা খুলে রাখত। কিন্তু এবার গেল ভুলে। কথাটা যখন সে

আমাকে বলল, আমি তাকে কেবল মারতে বাকি রেখেছি। পরিস্থিতিটা ছিল রীতিমত সঙ্গিন। পুরানো গাড়িটির নতুন মালিক যদি রেডিওটা মেরামত করতে দেয় কাউকে, তাহলে কয়েকদিন বা কয়েক ঘন্টার মধ্যে আরেসকে জাপানী প্রতিগোয়েন্দা বাহিনীর জেরার সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের অনেকেই বিপদে পড়ে যাবে।

মাথা যথাসম্ভব ঠাণ্ডা রেখে আরেসকে হুকুম দিলাম পরদিন সকালেই ডিলারের কাছে চলে যেতে। ডিলারকে বলবে যে পুরানো রেডিওটা তার প্রিয়, ওটা সে ছাড়তে চায় না। তার ধারণা পুরানোটা নতুনটার চাইতে ভাল। গল্পটা উদ্ভট শোনাবে বটে, কিন্তু তবু বলতে হবে। এরপর বলবে যে নতুন রেডিওটার বদলে সে পুরানোটাই ফেরত নিতে চায়। ভাগ্য ভাল যে, ডিলারটা বেশি সন্দেহপ্রবণ ছিল না। ফলে গল্পটা সে বিশ্বাস করে এবং পুরানো রেডিওটা উদ্ধার হয়। আরেস-এর এ অসতর্কতা আমি কখনও ভুলব না এবং ক্ষমা করতে পারব না।

অপরদিকে আরেস আমার জন্য আরেকজন এজেন্ট রিক্রুট করে দেয়। লোকটা সরকারী কর্মচারী। অনেক গোপন খবর জানার সুযোগ আছে তার। আমার নির্দেশনাতেই কাজ করত। কিন্তু আমি কখনও দেখা করিনি তার সাথে। তার সাথে সব যোগাযোগ আদান-প্রদান আরেস নিজেই করত। কেজিবি হেডকোয়ার্টারে অবশ্য নতুন একজন এজেন্ট সত্যি যে রিক্রুট করা হয়েছে তার বস্তুগত প্রমাণ চাইল আমার কাছে। তারা বলল, যে বারটিতে বসে আরেস আর নতুন এজেন্টটি দলিলপত্র আর টাকা পয়সা লেনদেন করে সেখানে যেন আমি গুপ্তভাবে উপস্থিত থাকি।

সাক্ষাৎটা পুরোপুরি চিত্রায়িত করার জন্য আমাকে একটা বিশেষ ব্রিফকেস দেয়া হয়। ওরকম বাজে চেহারার ব্রিফকেস পথে ঘাটে লোকের হাতে লাখ লাখ দেখা যায়। কিন্তু এটার ভিতরে লুকানো ছিল একটি ক্যামেরা। ব্রিফকেসটির হাতলে লাগানো একটা গুপ্ত বোতামে একটুখানি চাপ দিলেই একপাশে একটা ছোট ছিদ্র দেখা দিত। ওখানে বসানো ছিল ক্যামেরার লেন্স। তারপর ছবি উঠতে থাকত সেকেণ্ডেরও কম সময় অন্তর। অন্তত এরকমই হবে বলা হয়েছিল আমাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে, কেতাবে যা লেখা থাকে বিশেষ করে গোয়েন্দা তৎপরতার ক্ষেত্রে, বাস্তবে তা ঘটে না।

টেকনিক্যাল অপারেশন্স অফিসারের কাছ থেকে ব্রিফকেসটা নিয়ে রেসিডেন্সিতে বসেই পরীক্ষা করে দেখলাম ওটা ঠিকমতই কাজ করে।

আমার ওই বারে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা গোপন করার জন্য বৌকে সাথে

নিলাম, যাতে এমন ধারণা সৃষ্টি হয় যে, ওখানে গিয়েছি শুধু ডিনার আর দু'একটা বিয়ার খেতে। লুকানো ক্যামেরাটির অ্যাঙ্গেল ছিল বড় সঙ্কীর্ণ। ছবি ওঠা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে গেলে আমাকে ব্রিফকেসটা টার্গেটের দিকে তাক করেই রাখতে হবে। কোন লোক বারে বা রেস্তরাঁয় বসে অন্যের দিকে ব্রিফকেস তাক করে আছে এমন দৃশ্য জীবনে ক'বার দেখেছেন?

আরেস আর ওর বন্ধু এল। বৌ-এর কথা পুরোপুরি ভুলে গিয়ে, ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে, খুব সাবধানে ব্রিফকেসটা তাক করলাম তাদের দিকে। টিপে দিলাম লুকানো বোতামটা বার কয়েক। খুব গর্ব বোধ করলাম। দুরূহ কাজটা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া অন্য কেউ বেশি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়নি আমাদের দিকে। হেডকোয়ার্টার খুশি হবে এবার।

রাতে ফিরে গেলাম রেসিডেন্সিতে। ছবি ডেভেলপ করার জন্য জাগিয়ে তুললাম টেকনিক্যাল অপারেশন্স অফিসারকে। কিন্তু ছবি কোথায়? সবই যে ফাঁকা। হতাশার আমাদের সীমা রইল না। সবকিছু করা হয়েছে পরিকল্পনা মতই, কেবল একটি ব্যাপার ছাড়া। ক্যামেরার ভিতরকার ফিল্ম ছিল আলো ঝলমল ঘরের জন্য উপযোগী, আবছা আলোকিত বীয়ার বারের জন্য নয়।

এ ধরনের জীবনযাত্রার প্রতি ঠিক কখন যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম জানিনে। পিছনের দিকে তাকালে মনে হয় খারাপ লাগাটা শুরু হয়েছিল জাপানে যাওয়ার কিছুদিন পরেই। কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যে থাকতে হয়েছে যে, নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার সময় পাইনি। জানি, খারাপ শুধু আমারই লাগত না। সহকর্মীরা প্রায়ই বলাবলি করত এরকম জীবন আমাদের পরিবার এবং আমাদের দৈহিক মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কি প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে। একজন তো বলেই বসেছিল যে, তার পোষা বেড়ালটার ওপরও এর প্রভাব পড়ে। আমি বেশি অনুভব করতাম দৈহিক ধকলটা। গভীর ঘুমের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠতাম সর্বাঙ্গে ঘাম নিয়ে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার ছিল হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হয়ে যাওয়া। ডাক্তাররা এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারেনি।

'পরিশ্রম, ধকল,' বলত ওরা। ভ্যালিয়াম দিত খেতে। আমি খেতাম না।

প্রকৃতি বিষয়ক একটা ফিল্মের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে ভাষ্যকারের বাণীঃ 'জঙ্গলের আইন হচ্ছে শিকার করো বা শিকার হও, খাও বা খাবার হয়ে যাও।'

আমি ভাবতাম, তাই যদি সত্য হয় তাহলে আমার জীবন হচ্ছে জঙ্গল। আমিও তাই করি। আমি শিকার করি এবং শিকারে পরিণত হই। আমি শিকার এবং শিকারী দুটোই। এ জীবন আমার ভাল লাগে না। একে আমি ঘৃণা করি।

মানুষের মধ্যে এর চাইতে সভ্য কিছু নিশ্চয়ই আছে!

ওই মুহূর্তে বুঝেছিলাম যে দু'দিন আগে বা পরে জীবনযাপনের ভাল কোন পথ আমাকে খুঁজে পেতেই হবে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম শিকারে এবং জঙ্গলে বিচরণে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
জাপান-মস্কো, ১৯৭৮-১৯৭৯

আরেস নাসের এজেন্টটি আমার বর্ণনায় যা বলা হয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার জাপানে পৌছার এক যুগেরও আগে তাকে রিক্রুট করা হয়। তখন সে ছিল কিওডোর এক নিউজ সার্ভিসের কর্মকর্তা। ওই পদে থাকার দরুন অনেক মূল্যবান তথ্য জানার সুযোগ ছিল তার। জাপানী গোয়েন্দা বিভাগে তার এক ব্যক্তিগত বন্ধু থাকায় আরেস প্রচুর নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করে।

প্রতিদানে তাকে মাত্রাতিরিক্তভাবে পুরস্কৃত করা হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জাপানীরা টের পেয়ে যায় যে কোথায় একটা ছিদ্র রয়েছে এবং ছিদ্রটা বন্ধ করার জন্য তারা তাদের বিপুলসংখ্যক কর্মচারীকে পূর্বের পদ থেকে ভিন্নপদে বদলি করে দেয়। এতে আরেসকে যে বন্ধুটি তথ্য জোগাত সে লোকটি অকার্যকর হয়ে যায়। এর ফলে পরবর্তী তিন বছর আরেস আর আগের মত তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে মাসে এক হাজার ডলারের বেশি দিয়ে যেতে থাকে। তাকে আমার হাতে তুলে দেয়ার সময় আমাকে বলে দেয়া হয় যে, আমার প্রাথমিক কাজ হচ্ছে তাকে আবার উৎপাদনশীল বা সক্রিয় করে তোলা।

আমি প্রথমে তার সম্পর্কে যা জানি সবকিছু বিশ্লেষণ এবং তার সম্পর্কে রেসিডেন্সিতে যে মোটা মোটা ফাইল রয়েছে সেগুলো পর্যালোচনায় হাত দিলাম। ফাইল-টাইল থাকা সত্ত্বেও তাকে মাইস (মানি, আইডিওলোজি, কম্প্রোমাইজ, ইগো) টেস্টে ফেললাম। তার আপস করার ক্ষমতা আর পয়সার লোভের কথা জানি। এগুলো হলো মাইস-এর সি আর এম। আরও জানতাম যে, আরেস একজন সুপুরুষ এবং তার প্রচুর 'ই' (ইগো) বা অহমিকা আছে।

চার অক্ষরের তিনটি মিলে গেল। ফলাফল ভালই বটে। আরেস বিলাসপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে আরাম-আয়েশে থাকতে। এর জন্য প্রচুর পয়সা দরকার—কেজিবি'র পয়সা। এটা বোঝামাত্রই তাকে রাগে আনার পথ স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার চোখে। প্রথমে মাসকয়েক তার মাসোহারা বন্ধ করে রাখলাম—যাতে তার জীবনযাত্রার স্টাইলে একটু বিঘ্ন ঘটে। তারপর আবার কিছু কিছু দিতে শুরু করলাম। সাথে সাথে নম্র অথচ দৃঢ়ভাবে বলে দিলাম যে, তথ্যাদি দেয়া আরম্ভ না করলে মাসোহারা আবারও বন্ধ হয়ে যাবে।

এ কৌশল সুফল দিল। আরেস আবার উৎপাদনশীল হয়ে উঠল। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে আরেস আমাকে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল দেয় যা কেজিবি হন্যে হয়ে খুঁজছিল বছরের পর বছর ধরে।

এজেন্টদের সক্রিয় করার জন্য মাইস টেস্ট আছে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে ঠিক করার জন্য কিছুই নেই ও রকমের। কাজের চাপ এত বেশি যে, সকালবেলাটা ছাড়া নিজের ছেলেটাকেও দেখি না। বাড়ি ফিরি গভীর রাতে। বৌ-এর সাথে দেখা হয় না। (অন্তত জাগ্রত অবস্থায়)। মস্কোতে থাকতেই আমাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, কেজিবি এজেন্টের কাজের চাপ অত্যন্ত বেশি হয়। তার ফলে অনেকের বিয়ে ভেঙে যায়। আমরা কোন ব্যতিক্রম নই।

নাতালিয়ার বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল আমাদের বাড়িটার দূরত্ব। সোভিয়েত দূতাবাস থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে থাকতাম আমরা। আশপাশে আর কোন সোভিয়েত পরিবার ছিল না। জাপানী ভাষাও জানত না নাতালিয়া। স্বভাবতই নিঃসঙ্গ বোধ ও হতাশায় ভুগত সে। একেক সময় সে এতই একা বোধ করত যে দরজা খুলে আমি ঘরে প্রবেশ করতেই হু হু করে কেঁদে ফেলত। খুবই খারাপ লাগত তার জন্যে, নিজের জন্যেও। এ ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টির জন্য আমিই অনেকটা দায়ী। প্রোন্নিকভের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময়েই তিনি আমাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি চাইলে আমার 'সুন্দরী বৌ'-এর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা হতে পারে। আমি চাইনি। অহঙ্কারে বেধেছে। আমাদের জাপানে আসার দু'বছর পরে নাতালিয়ার চাকরি একটা হয়, দূতাবাসের কনসুলার সেকশনে। অল্পদিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়কের পদে সে প্রমোশন পেয়ে যায়। কাজের চাপে সে-ও শ্রান্ত হয়ে পড়তে থাকে। দিনের শেষে তার দরকার সঙ্গ, হয়তো কিছু সান্ত্বনাও। কিন্তু আমি তো তা দিতে পারতাম না। কালেভদ্রে রাতে বাড়িতে থাকলেও নিজের নৈতিক ও আত্মিক সঙ্কটের চিন্তায় থাকতাম মগ্ন। আমার চিন্তামগ্ন নীরবতাকে সে মনে করত

প্রত্যাখ্যান। ভাবত আমি তাকে স্ত্রী আর প্রেমিকা হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছি।

'তুমি কি আমাকে আর ভালবাসো না?'

'নিশ্চয়ই ভালবাসি, নাতাশা।'

'কই, ভালবাসার কোন প্রমাণ তো পাই না?'

'কি করবো, নাতাশা। এত ক্লান্ত থাকি যে···'

একেক সময় তাকে বাজিয়ে দেখতে চাই, বলতে চাই চাকরির ব্যাপারে আমি কতটা হতাশা ও বিরক্ত হয়ে পড়ছি। 'জানি না এ চাকরি আর কতদিন চালিয়ে যেতে পারব। নিজেকে নোংরা লাগে।'

'তুমি ক্লান্ত, ডার্লিং। ঘুমাও। ঘুমানোর পরে ভাল লাগবে,' জবাব দিত সে।

আলাপের এ পর্যায়ে পৌঁছেই নীরব হয়ে যেতাম। নাতাশাকে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। পুরানো বলশেভিক পরিবারে তার জন্ম। তার বাবা অক্টোবর বিপ্লব এবং পরবর্তী গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ত্রিশের দশকে মিথ্যা অভিযোগে বছর দু'য়েকের জন্য জেলে থাকলেও তিনি বিশ্বস্ত কমিউনিস্টই রয়ে যান। নাতালিয়াকে তিনি গড়ে তুলেছেন অত্যন্ত দেশপ্রেমিক মেয়ে হিসাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন সমালোচনাই সে সহ্য করতে রাজি নয়।

পিছনের দিকে তাকালে দুঃখ পাই এটা ভেবে যে, নাতালিয়া আর আমার মধ্যে কত সামান্য মিলই না ছিল। বিবাহিত জীবনের এতগুলো বছরের মধ্যে তাকে একবারও বলিনি যে ধর্মে আমি গভীরভাবে বিশ্বাসী। শুনলে সে আঁতকে উঠত মনে হয়। আমার কাজ কি ধরনের তা সে জানত, যদিও নির্দিষ্ট খুঁটিনাটি থেকে তাকে যতটা সম্ভব দূরে রাখতাম। রাত ৯টায় বেরিয়ে ৩টা পর্যন্ত ফিরে না এলে সে ঘুমাতো না, চিন্তা করত। স্নায়ুর ওপর জানার চাইতে না-জানার চাপ অনেক সময় বেশিই পড়ে। কেজিবি অফিসারদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বেশি হবার এটাও অন্যতম কারণ।

আমাদের জাপানে পৌঁছার অল্পদিন পরে ৬ নম্বর টিভি চ্যানেলের একটি টিম 'টোকিওতে বিদেশী' নামে এক প্রোগ্রাম তৈরি করে। নিউটাইমস-এর প্রতিনিধি টোকিওতে কিভাবে জীবন কাটায় তা দেখে দর্শকরা খুশি হবে ভেবে চ্যানেল ৬-এর লোকেরা এমন একটি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত সুখী পারিবারিক জীবনের দৃশ্য উপহার দেয় যার সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের মিল ছিল খুবই সামান্য। নিউটাইমস-এর প্রতিনিধি যে আসলে একজন গুপ্তচর তা স্বভাবতই ওরা জানত না। আমার গোয়েন্দা তৎপরতায় নাতালিয়াকে মাঝে মধ্যে জড়াতে হতো। এ শর্তটা রাজি না হলেও সে মেনে নিয়েছিল মস্কোতে আমার ট্রেনিংকালে আমাদের সেকশনের কর্তা সেই কেজিবি কর্নেলের সাথে অনুষ্ঠিত

সাক্ষাৎকারের সময়।

একেক সময় তাকে জড়াতে বাধ্য হয়েছি। যেমন, আরেসের সাথে আমার কয়েকটা অতি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় টোকিয়োর বাইরে। শহরের বাইরে ৬০/৭০ কি. মি. পর্যন্ত চলে যাওয়াটা স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করার জন্য নাতালিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছে যাতে দেখলে লোকে মনে করে যে বৌ নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। সে জানত কেন তাকে নিয়ে যাচ্ছি, তবে এজেন্টের সাথে প্রকৃত সাক্ষাৎকারের সময় কখনও সে উপস্থিত থাকত না। এটা শুধু তাকেই আমার তৎপরতায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত গভীরভাবে জড়িত হওয়া থেকে বাঁচাতো না, অপরিহার্য লোক ছাড়া আর কারো উপস্থিত না থাকাও নিশ্চিত করত। টোকিয়োর বাইরে ওই ট্রিপগুলো ভালই লাগত আমাদের।

১৯৭৮ সালে আমাদের ছেলে সোভিয়েত দূতাবাসের প্রাথমিক স্কুল থেকে পাস করলে আমাদেরকে মস্কো যেতে হয় তাকে স্কুলে ভর্তি করতে। তারপর থেকে সে টোকিয়োতে আসতে পারত কেবল গ্রীষ্মের ছুটির সময়। কিন্তু তখনও আমি তার বা নাতালিয়ার সাথে থাকতে পারতাম না। এতে মানসিক উত্তেজনা বাড়তে থাকে। তবে পরিস্থিতি কতদূর গড়িয়েছে তা জানতাম না। এক রাতে অনেক দেরিতে ঘরে ফিরেছি। নাতালিয়া উঠে আমাকে খাবার দিতে দিতে খুব শান্তভাবে বলল 'স্তাস, এরকম জীবন আর সইতে পারছি না। আমাদের উচিত সত্যের মুখোমুখি হওয়া। বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে আমাদেরকে।'

ধসে গেলাম। অত্যন্ত চমৎকার সাহসী মেয়ে, নাতালিয়া। সব সময় অনুগত, বাধ্য। নালিশ বা ক্ষোভ প্রকাশ করে না কখনও। শান্ত করলাম তাকে। বললাম, কত ভালবাসি। বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আমাদের মধ্যে আবার বোঝাপড়া হলো সে রাতে। কিন্তু সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

হৃদয়ের গভীর অভ্যন্তরে আমি জানতাম যে সে ঠিকই বলেছে। দু'দিন আগে বা পরে বিচ্ছেদ আমাদের হবেই।

আমার জীবনের একটা দিক সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল মস্কোতে। সেটার প্রতি এখন বিশেষ নজর রাখা দরকার। সেটা হলো ডেপুটি রেসিডেন্ট প্রোন্নিকভ। আমি যে নাতালিয়াকে দূতাবাসে একটা কাজ দেয়ার জন্য প্রোন্নিকভকে বলিনি তার কারণ অহংকার নয় পুরোপুরি। ১৯৭৫ সালে প্রথম সাক্ষাতের সময়েই বুঝেছিলাম যে প্রখর মেধা ও ক্ষমতার লোভের কারণে নিজের ও রেসিডেন্সির লোকগুলোকে তিনি ইচ্ছা মত গড়ে নেন এবং পুতুলের মত চালান। ভুল হোক শুদ্ধ হোক, ওই সাক্ষাৎকার থেকে আমি এ সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম যে, তাঁর কাছে কোন সহায়তা চাইব না, কারণ বিনা শর্তে

তুচ্ছতম সহায়তাও তিনি দেন না।

অসৎ লোক হলেও খেলার কায়দা-কানুন জানতেন প্রোন্নিকভ। উদার, দিলখোলা, দয়ালু কিংবা কঠোর, ক্ষমাহীন ও নির্মম—যে কোন ভাব অবলম্বন করতে পারতেন তিনি। কখনও হয়ে উঠতেন কোমল, কখনও নম্র, কিংবা কর্কশ ও অমার্জিত। যেভাবই দেখান না কেন, তার ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন। প্রয়োজনের খাতিরে গিরগিটির মত ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাতেন। কিংকে রিক্রুট করার পরে যাঁরা আমাকে প্রথমে অভিনন্দন জানান তাঁদের মধ্যে প্রোন্নিকভ ছিলেন অন্যতম। কিন্তু এমন ভাষায় প্রশংসা করলেন যাতে মনে হলো আমার পিঠের বদলে তিনি নিজের পিঠ চাপড়ালেন।

'চমৎকার কাজ' বললেন তিনি, 'আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে। তোমাকে সাহায্য করতে পেরেছি বলে আমি আনন্দিত। এ কেস এ তোমাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়েছি। তুমি আমার ধারণা সত্য প্রমাণ করেছ।'

আমাদের সম্পর্কটা শত্রুতামূলক হলেও তার ব্যবহার সব সময় ছিল পেশাদারসুলভ। আমার ধারণা তিনি আমাকে একটু আলাদা ধাতুতে গড়া লোক বিবেচনা করতেন এবং সেটা কোন্ ধাতু তা বুঝতে পারতেন না।

আমি দেখেছি কী নিপুণতার সাথে তিনি রেসিডেন্ট ইয়েরোখিনকে ধ্বংস করেন। নয়াদিল্লীতে অত্যন্ত সফলভাবে দায়িত্ব পালনের পরে ইয়েরোখিনকে টোকিয়ো দূতাবাসে পাঠানো হয়। রেসিডেন্ট হিসাবে ইয়েরোখিনের নিয়োগ লাভের মুহূর্ত থেকেই প্রোন্নিকভ তাঁকে নিজের উচ্চাভিলাষের প্রতি হুমকি বলে গণ্য করতে থাকেন। তিনি ছিলেন প্রোন্নিকভের চেয়ে কম বয়সী। এতে প্রোন্নিকভ আশঙ্কা করেন যে, ইয়েরোখিন অনেক দিন ধরে রেসিডেন্ট পদটা জুড়ে বসে থাকবেন এবং প্রোন্নিকভ ওই পদে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে করতে হয়ে যাবেন বুড়ো।

ইয়েরোখিন নিজের এক বিশ্বস্ত সহকারীকে নিয়ে এসেছিলেন নয়াদিল্লী থেকে। তাঁর নাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়েভস্তাফিয়েভ। একটা প্রমোশনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি এনেছিলেন তাঁকে। প্রমোশন পেতে দেরি হচ্ছে দেখে ইয়েভস্তাফিয়েভ দৃশ্যত চঞ্চল হয়ে ওঠেন। এ সুযোগটা গ্রহণ করলেন প্রোন্নিকভ। প্রথমে তিনি আভাসে-ইঙ্গিতে ইয়েভস্তাফিয়েভকে জানালেন যে, ইয়েরোখিন অপর একজনকে প্রমোশন দিয়ে তাঁর ওপরে বসিয়ে দেবেন। তার পরে ইয়েরোখিনের কাছে গিয়ে বললেন যে, ইয়েভস্তাফিয়েভ তাঁর বদনাম করে বেড়াচ্ছেন। একবার এর কাছে, একবার ওর কাছে বারে বারে গিয়ে প্রোন্নিকভ উভয়ের কান ভারি করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে ইয়েরোখিনের মনে তিনি এ

বিশ্বাস উৎপাদন করলেন যে, ইয়েভস্তাফিয়েভের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একই সময়ে ইয়েভস্তাফিয়েভকে খেপিয়ে তোলেন ইয়েরোখিনের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে।

নাটকের দুই মূল চরিত্র যে একবারও সামনা-সামনি বসে খোলাখুলি আলোচনা করেননি এটা হচ্ছে সোভিয়েতদের আচরণের এক চিরাচরিত রীতি। সোভিয়েতরা সব সময় পরস্পরকে ভয় ও অবিশ্বাস করে। জাতীয় মানসিকতারই অংশ এটা।

রেসিডেন্ট ইয়েরোখিন শেষ পর্যন্ত তাঁর মস্কোস্থ ওপরওয়ালাদের অনুরোধ করলেন 'পাগল ইয়েভস্তাফিয়েভটাকে সরিয়ে নেয়ার' জন্য। মানসিক অনুপযুক্ততার দরুন ইয়েভস্তাফিয়েভকে মস্কোতে ডেকে নিয়ে যাবার পরে দেখা গেল যে দু'চারটা চালাকি তিনিও জানেন। বিমান বন্দর থেকে তিনি সোজা চলে যান কেজিবির এক হাসপাতালে। দাবি করেন যে তাঁকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পুরোপুরি পরীক্ষা করা হোক। পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা রায় দিলেন যে, মানসিকভাবে তিনি সুস্থ এবং স্বাভাবিক। ডাক্তারদের সেই রায় তিনি পেশ করলেন কেজিবি হেডকোয়ার্টারে। সেই সাথে পেশ করলেন ইয়েরোখিনের বিরুদ্ধে সযত্নে রচিত নিজের অভিযোগটি।

কমিউনিস্ট পার্টির একটি কমিশন ইয়েরোখিনের বিরুদ্ধে 'একজন ভ্রাতৃপ্রতিম অফিসারের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার' অভিযোগ উত্থাপন করে। ইয়েরোখিনকে তলব করা হয় মস্কোতে। অস্থায়ী রেসিডেন্ট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন প্রোন্নিকভ। মামলার তদন্তকালে প্রোন্নিকভ ইয়েরোখিন আর ইয়েভস্তাফিয়েভ উভয়ের প্রশংসা করে চিঠি লেখেন, কিন্তু চিঠিতে ইয়েভস্তাফিয়েভ এর বক্তব্য সমর্থন করেন। ইয়েরোখিনকে চুপচাপ বদলি করে দেয়া হয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে। ইয়েভস্তাফিয়েভ চলে যান জাতিসংঘে, সেক্রেটারি জেনারেলের একজন সহকারী হিসাবে। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন।

এ রকম পন্থায় ইয়েরোখিনকে সরানোটা আমার মনে হয়েছিল অত্যন্ত হীন ও ন্যক্কারজনক। মনোভাবটা চেপে রাখতে পারিনি।

'প্রোন্নিকভ যত শিগগির মস্কো ফিরে যায় ততই মঙ্গল আমাদের' বলে ফেলি অন্যদের শুনিয়ে। পরদিন প্রোন্নিকভের অফিসের সামনে দিয়ে যাবার সময় আমাকে ডেকে তিনি বলেন, 'কাল তুমি কি বলেছ, শুনলাম। লেভচেঙ্কো, ওই কথাগুলোর জন্য তোমাকে আমি কোনদিন ক্ষমা করব না। এখন থেকে মাথাটা ঘাড়ের ওপর বজায় রাখতে চাইলে সাবধানে চলো' কথাগুলো তিনি বললেন

বিপজ্জনকভাবে চাপা গলায়। আমি জবাব দেইনি।

একটি কথাও মিথ্যা বলেননি তিনি। যা বলেছেন তাই করবেন। সেদিন থেকে তাঁর সাথে আমার কমই দেখা হয়েছে। কিছুদিন পরে ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেট-এর সপ্তম বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর হয়ে মস্কো চলে যান তিনি। তাঁর বিদায়কালে ফেয়ারওয়েল পার্টিতে আমি যোগ দেইনি।

আমি চেয়েছিলাম জাপানের বন্ধু হতে। কিন্তু এতগুলো বছর ওখানে থেকেও পারলাম না। এটা আমাকে আজও দুঃখ দেয়। কত পড়াশুনা করেছি জাপান সম্পর্কে। যত পড়েছি তত বেশি ভালবেসেছি। কিন্তু বেদনাকর সত্য হচ্ছে এই যে, জাপান বিষয়ে অর্জিত এই জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে আমি কেজিবি অফিসারের ভূমিকায় জাপানের পিঠে ছুরি মারার কাজে ব্যবহার করেছি।

আমার জীবনটা ছিল চারটি পৃথক এবং অসঙ্গতিপূর্ণ অংশে বিভক্ত। প্রথম এবং প্রধান অংশ আমি কাটিয়েছি কেজিবি'র টোকিও রেসিডেন্সিতে। অফিসের কোন্দল, সামরিক শৃঙ্খলা, ফাইল আর কাগজের স্তূপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে। দ্বিতীয় অংশ ব্যয়িত হয়েছে এজেন্ট বানানোর চেষ্টা ও তাদেরকে নিজ দেশের বিরুদ্ধে কাজ করার প্ররোচনাদানে। তৃতীয় অংশ ছিল নিজের ছদ্ম পরিচয়টা অটুট রাখার জন্য সাংবাদিকের কাজ। নিউ টাইমস-এর হয়ে জাপানী রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার নেয়ার সময়ই না একটু মানুষের মত লাগত নিজেকে। এ কাজটা ছিল সোজা-সরল। আমার গোয়েন্দাগিরির সাথে সম্পর্কহীন।

চতুর্থ অংশটা কেটেছে বাড়িতে, পরিবারের সাথে। কিন্তু এ সময়টায় ব্যস্ত থাকতাম ভাঙনোন্মুখ পারিবারিক জীবনটাকে জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায়, জাপানী প্রতিগোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ার বিভীষিকা দেখে।

মাঝে মাঝে মস্কো যেতাম ছুটিতে। দেশের অবস্থা দেখে বেড়ানোর সুখ আর রইল না। প্রতিবার দেশে গেলে আমাকে কেজিবি হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ওপরঅলাদের কাছে রিপোর্ট করতে হতো। প্রতিবারই একই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতাম ঃ 'আরও বেশি রিক্রুট করতে পারো না কেন? অমুক অমুক তথ্য সংগ্রহ করতে পারো না কেন? ফিরে গিয়ে এটা করো, ওটা করো ইত্যাদি।'

কেজিবি হেডকোয়ার্টারের বাইরের জীবন আরও অন্ধকার এবং নিরানন্দ বোধ হত। পথচারীদের মুখের দিকে তাকালে দেখতাম বিষণ্নতা, উদ্বেগ আর ক্রোধের ছাপ। জাপানীদের হাসিভরা মুখ আর উত্তেজক হাসির সাথে তুলনা না করে পারতাম না। আর সে কি দুর্নীতি সোভিয়েট ইউনিয়নে! প্রতিবার গিয়ে

মনে হত অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। দুর্নীতি ক্যান্সারের মতই চলে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

নাতালিয়া একবার কিছু উল কিনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল টোকিওতে। বোনকে জিজ্ঞেস করল দাম কি রকম পড়বে। ওর বোন বলল, 'দাম বেশি না, তবে কেরানিকে ঘুষ দিতে হবে এবং তাতে দামটা বেশিই পড়ে যাবে। ঘুষ না দিলে সে শপথ করে বলবে যে উল ওদের কাছে নেই। সব জায়গায় ঘুষ। ঘুষ না দিলে রুটি পাবে না, মাংস পাবে না। কসাইরাও ঘুষ খায়।'

মস্কোয় ঘুরতে গিয়ে ব্যাপারটা আমিও টের পেলাম। সামান্য ট্রাফিক আইন লংঘনের দায়ে পুলিশ আমাকে থামাল। এ রকম অপরাধের জন্য সে আমাকে কেবল হুঁশিয়ারি দিয়েই ছেড়ে দিতে পারত। তাকে বললাম, "আরে ভাই, আমি জাপানে ছিলাম অনেক বছর, আপনাদের এ নতুন আইন জানতাম না। একটা হুঁশিয়ারি দিয়েই তো যেতে দিতে পারেন আমাকে?' 'যেতে দিলে জাপান থেকে আনা কি দেবেন আমাকে?' প্রশ্ন করল সে। ওভারকোটের পকেট হাতড়ে জাপানী বার-কাফের কিছু রঙিন বিজ্ঞাপনের কার্ড দিলাম। খুশি হয়ে লোকটা ভুলে গেল আমার ট্রাফিক আইন ভঙের অপরাধ।

সোভিয়েত নেতৃত্ব সচ্ছলতার নামমাত্রও আনতে পারেনি দেশে। গণতন্ত্র তো তারা দেবেই না। মুক্ত দুনিয়ার মানুষদের প্রতি সোভিয়েত জনগণকে বিরূপ করে তোলার জন্য তারা সারাক্ষণ জঘন্য প্রচারণায় ব্যস্ত। তাদের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে গেল মনটা। টোকিওর মাটিতে পা দিতেই বুঝতাম মুক্ত সমাজে ফিরে এসেছি। নিজের দেশের কথা ভেবে আরও দুঃখ পেতাম। ঘৃণা লাগতো নিজের কাজকে।

নিজের কাছে স্বীকার করলাম, মিথ্যার জালেঘেরা যে জীবন কাটাচ্ছি তা থেকে বের হতে হবে। আজ না হয় কাল মুখোমুখি হতে হবে সত্যের। আমি ছিলাম কাজপাগল মানুষ। কাজ করতাম নিখুঁতভাবে এবং অবিরাম। প্রথম দিকে বেশি পরিশ্রম করতাম এই ভেবে যে আমার কাজের দ্বারা দেশের জনগণ উপকৃত হবে। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম যে উপকারের বদলে আমার কাজের দ্বারা জনগণকে আমি সোভিয়েত ব্যবস্থার দাসত্ব শৃঙ্খলে আরও কঠিনভাবে বাঁধতে সাহায্য করছি। এ বোধটা যখন এল, ততদিনে আমি চাকরির শৃঙ্খলে জড়িয়ে পড়েছি। কাজ করে গেছি রোবটের মত।

চাকরিতে আমার উন্নতি হয়েছে এটা সত্য, তবে জাপানে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরের পরে যেকোন সময় আমার মস্কো ফিরে যাবার কথা। মস্কোতে রয়েছে সেই সব লোক, আমার প্রতি যাদের মনোভাব

ভাল নয়। প্রথমত, আমাকে নেয়া হবে কেজিবি'র ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেটের সপ্তম বিভাগে। সেই বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর হলেন ভ্লাদিমির প্রোন্নিকভ—আমার ঘোষিত ও বিপজ্জনক শত্রু। তিনি মনে করেন কেজিবি'র অন্য অফিসারদের চাইতে আমি আলাদা ধরনের। এ কারণে টোকিও থাকাকালে আমার পদোন্নতি বিলম্বিত করার চেষ্টা করেন। মস্কোয় ফিরে আবার তাঁর অধীনে পড়লে তিনি যে সেই চেষ্টা আবারও করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরও খারাপ কিছু করার চেষ্টাও করতে পারেন।

কেজিবি'র চাকরিতে আমি প্রতিষ্ঠিত। আমার পেশাগত রেকর্ড দৃষ্টান্তমূলক। তবু ১৯৭৭ সাল নাগাদ কেজিবি'তে যোগ দিয়েছি বলে নিজের ওপর ঘৃণা জন্মাতে থাকে। ৩৭ বছর বয়সে পুরোপুরি বুঝতে পারি যে, আমি ভুল পক্ষে, অর্থাৎ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছি। ভাল করে বুঝে যাই যে, সোভিয়েত ব্যবস্থা জনগণের জন্য মঙ্গলজনক নয়। এ ব্যবস্থায়—অন্তত কেজিবি আর কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর কাছে জনগণ দাবার ঘুঁটি ছাড়া আর কিছুই নয়। চোখের সামনে থেকে মিথ্যার কালো পর্দা সরে যেতেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেল, যে কাজ করছি তা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে কি করব সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সেই কাজ করতে বেশ দেরি হয়ে গেল। 'স্তানিশ্লাভ লেভচেঙ্কো, তোমাকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে হবে,' একথাগুলো মনে মনে বলাও সহজ লাগছিল না। সবার ক্ষেত্রে যা হয় আমারও তাই হলো। দেশের প্রতি আনুগত্য আর সরকারের প্রতি আনুগত্য দুটোকে জড়িয়ে ফেলতে লাগলাম। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা নিজের দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কিনা তা নিয়ে সংশয়ে পড়ে গেলাম। এ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পাবার আগে আর কিছু করা অসম্ভব হয়ে উঠল।

প্রথমে ভেবেছিলাম ভিতরে থেকেই লড়বো, ভিন্ন মতাবলম্বীদের মত। কিন্তু আমি একজন কেজিবি অফিসার। ভাল করেই জানি যে, ভিন্ন মতের একটি শব্দ উচ্চারণ করলেই আমার কপালে কি ঘটবে। আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে কিংবা আটকে রাখা হবে কোন মানসিক হাসপাতালে। সোভিয়েত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারা মুখ খোলে তাদের ব্যাপারে তাই করা হয়। ওদের যুক্তি হলো, সোভিয়েত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলাটাই প্রমাণ করে যে, মানুষটা উন্মাদ। মানসিক হাসপাতালে যাবার পরেই শুরু হয় ভিন্নমতাবলম্বীর চিকিৎসা—মগজ ধোলাই। এতে কাজ না হলে ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, লোকটাকে ভাল করা যাবে না। মগজ ধোলাই চিকিৎসায় যাদের ভিন্ন মত দূর

করা যায় না, তাদের জন্য রয়েছে এমন সব ওষুধ যা মানুষকে নির্বোধ জড় পদার্থে পরিণত করে।

অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরে শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, 'না, বিশ্বাসঘাতক আমি নই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে অন্য কোথাও বাস করতে গেলে আমি বিশ্বাসঘাতক হবো না। রুশ জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে কমিউনিস্ট পার্টি আর পার্টির সৃষ্ট সুবিধাভোগীরা।'

জীবনের এক সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ওই সময় আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা। নিজের জন্মস্থান ছেড়ে বিদেশে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কাউকে বলতে পারিনি মনের কথা, চাইতে পারিনি কোন উপদেশ। জানতাম যে, এ পথ গ্রহণ করলে করতে হবে একা এবং থাকতে হবে একা। প্রিয়জনদের সাথে আর কখনও দেখা হবে না। এটা জানার ফলে মানসিক যন্ত্রণাটা হয়ে ওঠে অত্যন্ত তীব্র। ফলে প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে, নিজের স্বাধীনতার জন্য যে মূল্যটা দিতে হবে তা অত্যন্ত চড়া।

আমার আলেকজাণ্ডার তখন মস্কোর স্কুলে পড়ে। বৌকে যে নিজের অনুভূতির কথা জানাব সেই সাহস আমার নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সে যে রকম অনুরক্ত তাতে জানানোটা নিরাপদ হবে না। আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ অনিবার্য। কাজেই আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে, অত্যন্ত প্রবল দেশপ্রেম না থাকলেও নাতালিয়া আমার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে কখনও রাজি হতো না। আমার সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ছিল নাতালিয়া আর আলেকজাণ্ডারের নিরাপত্তার জন্য।

পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দুটি বিষয় বিবেচনা করলাম। আলেকজাণ্ডার একটা শিশু। 'শিশুদের ওপর জুলুম কেজিবিও করে না,' বললাম নিজেকে। তারপর রয়েছে নাতালিয়া। তার পরিবারের পূর্ণ আনুগত্যের দীর্ঘ ইতিহাস এবং তার নিজের রেকর্ড পার্টি জানে। কেজিবিও জানে।

হ্যাঁ, 'নাতালিয়া আর আলেকজাণ্ডার নিরাপদেই থাকবে,' বোঝালাম নিজেকে। এখানে অকপটে বলছি, যখন মনে মনে এরকম যুক্তি আঁটছি তখন ওদের জীবনে যা যা ঘটেছে সে সব ঘটবে জানলে দেশত্যাগের সিদ্ধান্তটা নিতাম কিনা সন্দেহ।

এদিকে আমার পেশাদার জীবন চলছিল গতানুগতিক ধারায়। প্রোন্নিকভ মস্কো চলে যান ১৯৭৭ সালে। তাঁর বিদায়ের পর রেসিডেন্সিতে অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র কমে যায়। সবাই আশা করতে থাকি যে, উচ্চতর পদে উন্নীত হবার ফলে তাঁর মনোযোগ মস্কোতেই কেন্দ্রীভূত থাকবে। ফলে টোকিওতে আমরা একটু

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারব। কিন্তু পরে জানলাম যে, না, তাঁর আগ্রহ আর মনোযোগ সর্বত্র। আমাদেরকে তিনি ভোলেননি মোটেও। প্রোন্নিকভের সাথে সমস্যার ব্যাপারে আমার একটি সন্তুষ্টির বিষয় হচ্ছে এই যে, তাঁর ওপরওয়ালা, ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেটের ডেপুটি ডাইরেক্টর মেজর জেনারেল পপোভ আমাকে খুব ভাল নজরে দেখতেন এবং একজন চৌকস গোয়েন্দা অফিসার বলে বিবেচনা করতেন।

১৯৭৮ সালে আমি টোকিও রেসিডেন্সির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী চার-পাঁচজনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হই। জাপানে আমার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার কথা ছিল ১৯৭৯ সালে। কিন্তু আমি জানতাম, কাজের ক্ষেত্রে সামান্য হোঁচট খেলে বা কোন রাজনৈতিক ভুল করে বসলে মুহূর্তের নোটিসে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে মস্কোতে। আরও জানতাম যে, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, অথচ আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত হতে পারিনি। এ সময় একটা ঘটনা ঘটে যা আমাকে বুঝিয়ে দেয় যে, আর দেরি করার উপায় নেই। রেসিডেন্টের অফিসে ছিলাম একদিন সকালে। তাঁর সেক্রেটারি ইন্টারকমে কিছু বলল।

শুনে রেসিডেন্ট বললেন, 'পাঠিয়ে দাও।'

'আমি চলে যাব?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'না, এটা মাত্র এক মুহূর্তের ব্যাপার।'

দরজা খুলে প্রবেশ করলেন এক অফিসার। মুখচেনা।

'এসো, এসো,' বললেন রেসিডেন্ট। আমার মনে হলো, কৃত্রিম উষ্ণতার সাথে। 'আমরা এই মাত্র মস্কো থেকে একটা বিশেষ বার্তা পেয়েছি। তোমাকে ওদের বড় দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে পাঠাতে বলা হয়েছে। এই নাও প্লেনের টিকিট। নিচে ড্রাইভার বসে আছে তোমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্য।'

'আমার পরিবারের কি হবে? আবার ফিরে আসব তো? কি এমন···?' তাকে বাধা দিয়ে রেসিডেন্ট বললেন, 'বৌকে ফোন করে বলো যে, তুমি মস্কোতে রওয়ানা হয়েছ। সে-ও যাবে বাচ্চাদের নিয়ে দু'চারদিন পরে। তোমার গৃহস্থালির জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা আর ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা সব আমরা করব। জলদি করো। নাকি এখানে না করে এয়ারপোর্টে গিয়ে ফোন করবে? তোমার এ ফ্লাইটটা মিস করা চলবে না।'

দ্রুতপায়ে লোকটা বেরিয়ে যাবার পর জানতে চাইলাম, 'পদোন্নতি?'

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, 'না। বেচারা কোন-এক ধরনের গোলমালে পড়েছে। হেডকোয়ার্টারে পা দিলেই বুঝবে।'

এক মুহূর্তের নোটিসে আমাকেও ফেরত পাঠানো হতে পারে মস্কোতে। নিজের চোখেই তো দেখলাম ব্যাপারটা কিভাবে ঘটে। নিজের কাজকর্মের উঁচুমান বজায় রাখার জন্য তৎপর হলাম। ডেমোক্লিসের তরবারির নিচে মাথা। ঝুঁকি নেয়া চলবে না। ওদিকে মস্কোয় বসে প্রোন্নিকভ যে তাঁর লম্বা হাত বাড়িয়ে এখানেও আমাদেরকে খোঁচা মারতে চাচ্ছেন তা আমরা টের পাচ্ছি।

এর অর্থ পরিষ্কার। এখানকার দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালনের পরে স্বাভাবিক পরিবর্তনের নিয়মেই যদি মস্কো ফিরে যাই তাহলেও পড়ব প্রোন্নিকভের খপ্পরে। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যে তিনি ওত পেতে আছেন তা ক্রমেই বেশি করে টের পাচ্ছিলাম।

প্রোন্নিকভ যে আমার দুশমন এর চূড়ান্ত প্রমাণ হলো এজেন্ট টমাসের ঘটনা। টমাস ছিলেন জাপানের বৃহত্তম সংবাদপত্রের সিনিয়র সংবাদদাতা, সফল গ্রন্থকার এবং জনপ্রিয় রাজনৈতিক ভাষ্যকার। তাঁকে পটিয়ে এজেন্ট হিসাবে রিক্রুট করার জন্য কেজিবি'র অনেক অফিসার প্রায় আঠারো বছর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তারপর কাজটা তুলে দেয়া হয় আমার হাতে। আমি দেখলাম যে, জাপানের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবাইকে তিনি জানেন। আরও দেখলাম, মানুষটা দারুণ সদালাপী, মার্জিত, রসবোধসম্পন্ন, সংস্কৃতিবান ও উদার। ভাল বাড়িতে থাকেন, দামী পোশাক পরেন, ব্যয়বহুল রেস্তরাঁয় খান। আমার ধারণা হলো টমাস কিছু উপরি আয় হলে খুশিই হবেন। তাই এক অস্তিত্বহীন সোভিয়েত সাময়িকীর জন্য তাঁকে লেখা দেয়ার অনুরোধ করলাম। বললাম, অবশ্য সম্মানীর বিনিময়ে। আমরা আপনার মত বিজ্ঞ সাংবাদিকের লেখা চাই। এ কৌশলটা অন্য সম্ভাব্য এজেন্টের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছি।

তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। অথচ লোকটা আগে অন্য অনেক কেজিবি অফিসারের প্রস্তাবে সাড়া দেননি। আমার প্রস্তাব গ্রহণের মানে সম্ভবত এই যে, প্রস্তাবটা দিয়েছি এমন মুহূর্তে যখন তিনি অর্থকষ্টে ছিলেন। (অর্থই সকল নষ্টের মূল—মাইস-এর প্রথম শব্দ মানি)। তখনও নিশ্চিত ছিলাম না টমাস পুরোপুরি যোগ দিবেন কিনা আমাদের সঙ্গে। তাই বললাম স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় একটি বিশেষ খবর ছাপিয়ে দিতে। বিনা প্রশ্নে তিনি তা করলেন। এভাবে যতই সাহায্য করতে লাগলেন আমাদেরকে ততই আমার সন্দেহ হতে লাগল। তিনি জানেন সোভিয়েত গোয়েন্দাদের সাথে সহযোগিতা করছেন। এর পরে টমাস আমাকে এমন একটা কথা বললেন, যা রীতিমত চাঞ্চল্যকর। 'যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঘোষণা করতে যাচ্ছে যে, লকহীড এয়ারক্র্যাফট কর্পোরেশন জাপানী কন্ট্রাক্ট পাওয়া

নিশ্চিত করার জন্য উচ্চপদস্থ জাপানী কর্মকর্তাদের বিপুল অঙ্কের অর্থ ঘুষ দিয়েছে।'

টমাসের কথাটা জানালাম উপরঅলাদের। তাঁরা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। 'ওটা সত্য হতে পারে না' বললেন একজন। 'এটা বড় বেশি চাঞ্চল্যকর। সত্য হতেই পারে না,' বললেন আরেকজন। 'সত্য হলে টোকিওতে অনেকের গর্দান যাবে।'

সপ্তাহ কয়েক পরে লকহীড কেলেঙ্কারি কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ায় টমাসের কথা সত্য প্রমাণিত হয়। এ কেলেঙ্কারি জাপানের রাজনীতিতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং যুক্তরাষ্ট্রেও এর প্রচণ্ড প্রভাব অনুভূত হয়। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার লকহীড এয়ারক্রাফট কর্পোরেশনকে দেউলিয়াত্ব থেকে বাঁচাবার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, লকহীড কোম্পানি মুনাফার লোভে আমেরিকান করদাতাদের দেয়া অর্থ জাপানী কর্মকর্তাদের ঘুষ দেয়ার কাজে ব্যবহার করছে। আরও পরিষ্কার করে বললে কথাটা দাঁড়ায় এ রকম ঃ আমেরিকান করদাতারা জাপানী কর্মকর্তাদের ঘুষ দিচ্ছে, লকহীড কেবল দালালের কাজটি করেছে।

রেগে টং হয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্র সরকার। জাপান সরকার হলো দারুণ বিব্রত। আর সোভিয়েতরা? টমাসের কথা বিশ্বাস না করায় তারা কেলেঙ্কারিটা থেকে ফায়দা লোটার সুযোগ হারালো।

আমার ইতোমধ্যেই বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, টমাস একটা জিনিয়াস এবং তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ হতে পারে। এ ঘটনার পরে আমি টমাসকে দূতাবাসের গোয়েন্দা চক্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিলাম। নতুন রেসিডেন্ট সমর্থন করলেন আমাকে। আমি এ মর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে এক সুপারিশ পেশ করলাম। এটা পাঠিয়ে দেয়া হলো মস্কোতে। প্রোন্নিকভ মস্কো চলে যাবার পর নতুন রেসিডেন্ট কর্নেল ওলেগ গুরিয়ানভ টোকিও রেসিডেন্সির দায়িত্ব নেন। তিনি সপ্তম ডিপার্টমেন্টের লোক ছিলেন না। এর আগে রেসিডেন্ট ছিলেন নেদারল্যান্ডস-এ। পরে হাভানায় সিনিয়র অফিসার। আমি পছন্দ করতাম লোকটাকে। ভদ্র, চতুর এবং যোগ্য। আমাদের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই বেশ একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুললেন তিনি, যা প্রোন্নিকভের সময় ছিল না। ইয়েরোখিন আর ইয়েভস্তাফিয়েভের ব্যাপার নিয়ে মস্কোতে যে আলোড়ন হয়েছে সে বিষয়ে কিছুই বললেন না তিনি। আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে গুরিয়ানভ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে জানেন। আসতে না আসতেই রেসিডেন্সির সব অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা দূর করলেন তিনি। আমরা সবাই মিলে কাজ করতে লাগলাম নির্বিঘ্নে।

*

টমাসের ব্যাপারে সুপারিশটি পাঠানোর সপ্তাহ কয়েক পরে গুরিয়ানভ আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন, 'এসো, স্তানিস্লাভ। দুঃসংবাদ আছে। মেজাজ খারাপ করো না।'

'কি ঘটেছে?'

'টমাসকে নেটওয়ার্কে নেয়ার যে সুপারিশ তুমি করেছিলে ওটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে,' বললেন তিনি। 'এবং শুধু প্রত্যাখ্যান নয়—প্রত্যাখ্যানপত্রের সঙ্গে ছত্রিশ পৃষ্ঠার এক সমালোচনাও আছে তোমার সুপারিশের।'

'সই করেছে কে?'

'ভ্লাদিমির প্রোন্নিকভ।'

'সে রকমই ভেবেছিলাম।'

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। কুত্তির বাচ্চা জানে যে আমার বিবেচনাই ঠিক।

'মন খারাপ করো না, আমাদের সময়ও আসবে? বললেন গুরিয়ানভ।'

এ ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই ফার্স্ট ডাইরেক্টরেটের ডেপুটি ডাইরেক্টর মেজর জেনারেল পপোভ টোকিও রেসিডেন্সি দেখতে এলেন। এই উচ্চপদস্থ লোকটি ছিলেন আমার গুণগ্রাহী। মস্কোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। তিনি আমাকে ভুলে যাননি দেখে এবং রেসিডেন্সিতে এসে আমাকে ডাকলেন বলে কৃতজ্ঞবোধ করলাম। মিনিট কয়েক খুচরো আলাপের পর গম্ভীর হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম যে টমাসের প্রসঙ্গটা তুলব। 'স্যার, একটা ব্যাপার আমার বোধগম্য হচ্ছে না,' বলে টমাস সংক্রান্ত পুরো ঘটনা টমাস কি ধরনের তথ্য সরবরাহ করেন, তাঁর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা, সবই খুলে বললাম। সবশেষে প্রোন্নিকভের জবাবটা তাঁকে দেখালাম।

প্রোন্নিকভের জবাবটি পপোভের পড়া শেষ হলে বললাম, 'রেসিডেন্ট গুরিয়ানভ টমাসের দেয়া তথ্যাদির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। টমাসের সরবরাহকৃত গোয়েন্দা তথ্যের প্রায় অর্ধেকই এত মূল্যবান ও নির্ভুল যে, কেন্দ্র ওগুলো সরাসরি পলিট ব্যুরোতে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'ওই বদমাশ প্রোন্নিকভটা!' বললেন পপোভ। 'এক রাতে আমি বড় ক্লান্ত ছিলাম। ওই সময় সে আমাকে এ কাগজটা সই করতে দেয়। আমি সাধারণত যা করি না—সেদিন ক্লান্তির বশে তাই করি। না পড়ে সই করে ফেলি। এটা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। আমি এটা শুধরে দেব, স্তানিস্লাভ।'

জেনারেল পপোভের সঙ্গে সাক্ষাতের এ বিবরণটা গুরিয়ানভকে জানালাম। শুনে তিনি বললেন, 'মস্কো ফিরে যাবার পর প্রোন্নিকভ তাঁর মতটা আবার ঘুরিয়ে না দিলেই হয়।'

'আমার মনে হয় পারবেন না, স্যার।'

'কেন পারবেন না?'

'পপোভকে আমি জানি, স্যার। এক কথার মানুষ। কথা দিলে নড়চড় করেন না।'

আসলে ঘটলও তাই। পপোভের মস্কো ফেরার মাত্র দিন কয়েক পরেই কেন্দ্র জানাল যে, টমাসকে নেটওয়ার্কে নেয়ার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে এবং এজন্য আমাকে অভিনন্দিত করা হচ্ছে।

এটা ঘটে ১৯৭৮ সালের গ্রীষ্মের শুরুতে। ১৯৭৯ সালে জাপানে আমার কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে প্রাপ্ত সর্বশেষ ছুটিতে আমাদের মস্কো যাবার পরে। মস্কো গিয়েই প্রথম কাজ উপরঅলাদের কাছে রিপোর্ট করা।

ফার্স্ট ডাইরেক্টরেট ভবনে গেলাম দুরুদুরু বুকে। জানতাম এজেন্ট টমাস সংক্রান্ত ঘটনাটা প্রোন্নিকভ ভোলেননি। মুশকিল হচ্ছে, তাঁর সাথেই প্রথমে দেখা করতে হবে আমাকে।

যা ধারণা করেছিলাম তাই। প্রোন্নিকভ খুবই শান্তভাবে মাপা কথায় আলাপ করলেন আমার সাথে। আলাপের শেষ দিকে আমার দিকে ঝুঁকে খুব নরম স্বরে বললেন, 'তুমি যে এত চালাক তা ভাবিনি। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেয়েছ, পপোভকে বলে ঠিক করোনি তুমি। শুধু ওই কারণেই আমার পাল্টা আঘাত হানা উচিত। তবে তোমার তুলনায় আমি অনেক বড়। তাই আক্রোশ পুষে রাখব না মনে। যাও ছুটি উপভোগ করোগে।'

তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে ভাবলাম—বেঁচে গেছি এ যাত্রায়। এবার ফিরে যাব জাপানে। কিন্তু শীঘ্রই আমাকে বদলি করা হবে মস্কোতে। সেখানে মাকড়সার মত জাল পেতে বসে আছেন প্রোন্নিকভ। নিজেকে মাছি হিসাবে কল্পনা করতে মোটেই ভাল লাগল না।

প্রায়ই ভাবি প্রোন্নিকভ সম্পর্কে। ওর টাইপটা সাধারণ। এ টাইপের লোকের অস্তিত্ব কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নেই সীমাবদ্ধ নয়। সে যে প্রতিভাবান এবং নিজের কাজে দক্ষ এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, অধীনস্থ লোকরা তার কাছে শুধু আরও উপরে উঠার মই মাত্র। অধীনস্থ লোকদের কাজ ভাল হলে সে ভাবে যে তার সঠিক নির্দেশনার ফলেই কাজটা ভাল হয়েছে। অধীনস্থ লোক যদি মাথা খাটাতে, চিন্তাভাবনা করতে বা

স্বাধীনভাবে কাজ করতে যায় তাহলে সে ওদেরকে হুমকি মনে করে। তার আর আমার মধ্যে রেষারেষির এটাই কারণ। সে মনে করত আমি আলাদা ধরনের, কারণ আমি বড় বেশি চিন্তা করি। তার কাছে আমি ছিলাম এমন এক প্রহেলিকা যাকে বোঝা বা ধ্বংস করা অসম্ভব তার পক্ষে।

এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছিল দ্রুতগতিতে। খেটে যাচ্ছিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পরিশ্রম, ক্লান্তি আর মনের অশান্তি মিলে দিনের পর দিন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম।

এখন এতদিন পরেও জানি না ঠিক কোন্ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের কথাটা মনে এসেছিল। হঠাৎ অনুভব করি যে, ইচ্ছাটা অনেক দিন ধরেই ছিল আমার মনের মধ্যে। সিদ্ধান্তটা গ্রহণের পরেই স্বাস্থ্য ভাল হতে শুরু করে। আরও বুঝি যে, আদর্শগত কারণেই রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে যাচ্ছি আমেরিকার কাছে। নিজে নিজে শপথ গ্রহণ করি যে, যুক্তরাষ্ট্র আমাকে আশ্রয় দিলে সোভিয়েত সমাজবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করব। আমাদের দেশ ও জনগণের মুক্তির জন্য লড়াই করব।

জানতাম যে, সময় এলে সিদ্ধান্তটা কার্যকর করার পদক্ষেপটি নিতে হবে দ্রুত এবং আকস্মিকভাবে। একদিন ভোরে জেগে উঠে জানব 'আজই সেই দিন!' সেই দিনটি এল ১৯৭৯ সালের ২৪ অক্টোবর।

আর মাত্র কয়েক পা
টোকিও, অক্টোবর ১৯৭৯

১৯৭৯ সালের কথা মনে পড়লে এখনও অনুভব করি সেই সার্বক্ষণিক ক্লান্তি, নাতালিয়া আর আমার মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের সুতীব্র বেদনা আর চব্বিশ ঘণ্টা লেগে থাকা দুশ্চিন্তা ঃ 'যাব? নাকি থাকব? এ দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা তো সহ্য করতে পারছি না। যেতেই হবে আমাকে!' কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্তটা একবার নিয়ে ফেলার পর আমি আবার একজন খাঁটি কেজিবি অফিসার হয়ে যাই। খাঁটি কেজিবি অফিসারের মতই ঠাণ্ডা মাথায় চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের বিপজ্জনক প্রস্তুতি নিতে থাকি।

অনেকদিন থেকেই ১৯৭৯ সালটি ছিল কেজিবির জন্য আমার সবচেয়ে

ফলপ্রসূ বছর। তবু প্রোন্নিকভের বদৌলতে এ বছরই আমি সবচেয়ে কম প্রশংসা বা পুরস্কার পেয়েছি। প্রোন্নিকভ এরকম আচরণই করবে জানতাম, যদিও মস্কোতে শেষ ছুটির মেয়াদ পূর্ণ হবার দু'দিন আগে তাঁর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেছিলাম। সে সময় তাঁকে বন্ধুভাবাপন্ন মনে হয়েছিল।

'তোমার জন্য আমি চিন্তিত' বলেছিলেন তিনি। 'তোমার ওপর দায়িত্বের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয়েছে। এত বোঝা চাপালে ভুলভ্রান্তি না হয়ে পারে না। একটা কথা বলি তোমাকে, স্তানিস্লাভ, মাঝেমধ্যে আমাকে এক আধটু লেখো না কেন? শুধু জানাবে তুমি কেমন আছ, কেমন চলছে তোমার দিন। লিখবে তো?'

'অবশ্যই লিখব' বললাম জবাবে। 'আপনি আমার জন্য ভাবেন জেনে সুখী হলাম।'এটাই হলো সোভিয়েত ভণ্ডামি। প্রোন্নিকভ মিথ্যা বললেন আমাকে (আমি তোমার জন্য চিন্তিত), আমিও মিথ্যা বললাম। তিনি যে আমার জন্য মোটেই চিন্তিত নন এবং আমি যে তা জানি, সেকথা তিনি জানেন। তাঁর কথায় আমি খুশি হইনি এবং তা যে তিনি জানেন আমিও তা জানি।

দু'জন মূল্যবান এজেন্ট রিক্রুট করেছি আমি। কিন্তু তার জন্য যে স্বীকৃতি প্রাপ্য ছিল তা থেকে তিনিই আমাকে বঞ্চিত করেন। এই হচ্ছে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব, আমার জন্য চিন্তা ইত্যাদির ফল। অবশ্য তখন আর ওসবে আমার তেমন কিছু যায় আসে না। রেসিডেন্ট গুরিয়ানভ খুবই দুঃখ পেলেন আমার ব্যাপারে। তাঁকে বললাম, ওতে আমার যায়-আসে না কিছুই।

তিনি মনে হয় বিশ্বাস করেননি আমার কথা। তবে আমি তাঁকে সত্য কথাই বলেছি। কেজিবির দুর্নীতির নতুন কোন প্রমাণের দরকার ছিল না আমার। ওরকম দুর্নীতিকে অনেকদিন আগে থেকেই সোভিয়েত ব্যবস্থার অংশ হিসাবে মেনে নিয়েছি। মস্কোর ট্রাফিক পুলিশটার সাথে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সে কাহিনী শুনে মস্কোতে নিযুক্ত কয়েকজন কেজিবি অফিসার আমাকে বলেছিলেন, 'আপনি যখন এখানে কাজ করতেন তখন নিশ্চয়ই শোনেননি যে, কেজিবি অফিসাররা কালোবাজারের মাল নিয়ে ব্যবসা করে। কেনার কথা বলছি না। বলছি কালোবাজারে মাল বিক্রির কথা' মন্তব্য করেন এক অফিসার।

আরে, সেদিনই তো এক কেজিবি অফিসার রাস্তায় জাপানী ক্যাসেট বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ল, বললেন, আরেকজন। 'লোকটা একজন কর্নেল' 'আমি অন্য রকম শুনেছি' বলেন আরেকজন। 'বড় কর্তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এটা নিয়ে। দুর্নীতির এ জোয়ার দেখে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা বড় চিন্তায় পড়ে গেছেন। সিআইএ নাকি তাঁদের বিভাগের অনেক লোককে কিনে

ফেলছে।'

শেষবার মস্কো ছাড়ার আগে গির্জায় যাই প্রকাশ্যে এবং সৎভাবে। কে দেখল, না দেখল, পরোয়া না করে প্রার্থনা করি সহজেই মোকাবিলায় সাহায্য ও শক্তি পাবার জন্য।

টোকিওতে ফিরে আসার পর নিজের কাজকর্মের বাইরে অন্য কাজে জড়িয়ে পড়ি বেশি। অনেকটা আমার ওপর রেসিডেন্ট গুরিয়ানভের অতিরিক্ত আস্থার কারণে। কাজের চাপটা সহন ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। দায়িত্বের সীমানার এই সম্প্রসারণের ফলে কেজিবি অফিসার হিসাবে আমার জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক ঘটনাটি ঘটে।

'নাজার' সাঙ্কেতিক নামের এক এজেন্ট ছিল আমাদের। তার অস্তিত্বের ব্যাপারটি রেসিডেন্সি অত্যন্ত যত্নের সাথে গোপন রাখত। নাজার ছিল জাপানের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের একজন কোড-ক্লার্ক। খুব কম লোকই জানতেন তাকে। রেসিডেন্ট নিজে এবং আর দু'জন যাঁরা ওর সাথে যোগাযোগ রাখতেন—মেজর ভ্যালেরি ইভানোভিচ উমানস্কি, তার পরে মেজর ভ্যালেন্টিন নিকোলায়েভিচ রেলোভ এবং সর্বশেষে আমি। আমি অবশ্য তাঁর আসল নাম জানতাম না। নাজার এর সাথে কেজিবি অফিসাররা খুব কমই দেখা করতেন। কেজিবিকে কিছু দেয়ার থাকলে তিনি তা রেখে দিতেন কোন নির্ধারিত গোপন স্থানে। কেজিবি সেই স্থান থেকে ওটা তুলে নিত। ওয়াশিংটন ডিসিসহ দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের জাপানী দূতাবাসগুলো যেসব বার্তা পাঠাত জাপানী বিদেশ মন্ত্রণালয়ে সেসব গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সোভিয়েত ইউনিয়ন পেয়ে যেত নাজার এর মাধ্যমে। নাজার এত বার্তা পাঠাত যে, সেগুলোর দ্রুত অনুবাদ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অনুবাদক হিসাবে আমার ডাক পড়ে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত এ সময় একদিন রেসিডেন্ট গুলিয়ানভ তলব করেন আমাকে। গিয়ে দেখি তিনি ভীষণ উত্তেজিত। আমাকে বললেন, 'স্তানিস্লাভ, একটা কাজ করার জন্য বলতে হচ্ছে তোমাকে। কাজটা খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো; তোমাকে কাজটার বিষয়ে কিছু জানানো যাবে না। কাজটা শুনতে খুবই সোজা। তোমাকে একটা বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে এবং বলতে হবে ওটা পুরানো না নতুন।'

'আমার কোন কেস-এর সাথে জড়িত?'

'না।'

বাড়িটা কোথায়?'

'সেটাই তো সমস্যা। ওটা এমন এক শহরতলীতে যেখানে বিদেশীদের

যাতায়াত প্রায় নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেলাম। সত্যিকার অর্থেই বিপজ্জনক হতে পারে ওরকম জায়গায় যাওয়া। বিদেশীর সাথে যোগাযোগ নগরবাসী জাপানীদের জন্য অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু শহরতলীর লোকরা মাঝে মধ্যে বিদেশীদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ প্রকাশ করে। সেখানে সবাই জাপানী। বিদেশী লোক গেলেই সহজে নজরে পড়বে।

'এজেন্ট এক্স-কে পাঠান না কেন? যার কথা বললাম তিনি একজন ফ্রী ল্যান্স ফটোগ্রাফার। সোভিয়েতপন্থী বলে জাপানী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত এ লোকটি অবিচল মার্কসবাদী। অনেকবার বেশ কাজে লেগেছেন কেজিবির।

'না, এটা অত্যন্ত কঠিন, গোপনীয় এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ,' বললেন রেসিডেন্ট।

'ওহো, এটা ফলস্ ফ্ল্যাগ অপারেশন!' মানে, এবার কেজিবির শিকারটা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে স্বেচ্ছায় বা জেনেশুনে সোভিয়েতের সাথে কখনও সহযোগিতা করবেন না। ওর সঙ্গে দেখা করবেন একজন অফিসার—যিনি অন্য জাতির ও অন্য দেশের সরকারের লোক বলে পরিচয় দেবেন। সুতরাং আমার কাজ হবে শুধু বিদেশীবিরোধী শহরতলীর মানুষদের নজর এড়িয়ে বাড়িটি চিনে আসাই নয়—যে কোন মূল্যে রুশ বা সোভিয়েত অফিসার হিসাবে আত্মপরিচয় গোপন রেখে মিশনটা সেরে আসা।

'তোমাকে বেছে নিয়েছি যেহেতু তুমি জরুরী পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারো। তোমাকে যেতে হবে সেখানে, বাড়িটার ছবি গেঁথে নিতে হবে মনের মধ্যে এবং ধরা না পড়ে ফিরে আসতে হবে। এ অপারেশনের নিরাপত্তা নির্ভর করছে তোমার ওপর।'

'একা যাব?'

'না, মেজর আলেকজাণ্ডার বিরয়ুকভের সাথে যাবে,' বললেন তিনি।

জানতাম তিনি উদ্বিগ্ন। মেজর বিরয়ুকভকেও চিনতাম। কমসোমলস্কায়া প্রাভদার প্রতিনিধি।

'ঠিক আছে, যাব,' বললাম। 'রবিবার সকালে যাওয়াই ভাল হবে। ও সময় জাপানী প্রতিগোয়েন্দারা থাকবে ঘুমিয়ে।'

পরবর্তী রবিবার খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে যাত্রা করলাম আমরা। কেউ যে পিছু নেয়নি সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক ড্রাইভ করে শেষ পর্যন্ত চললাম টোকিওর শহরতলীর দিকে। প্রায় দুপুর নাগাদ পৌঁছলাম আমাদের অভীষ্ট সেই সঙ্কীর্ণ এবং জনাকীর্ণ রাস্তায়। রাস্তাটা এত সঙ্কীর্ণ যে, একটা মাত্র

গাড়িই চলতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যে বোঝা গেল যে, গাড়ি খুব কমই আসে ওদিকে। বাচ্চারা দল বেঁধে খেলছে রাস্তায়। আমাদের গাড়ি আসছে দেখে ওরা ওদের পরিবারের লোকদের ডাকতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের চারদিকে লোকের এমন ভিড় জমে গেল যে, গাড়ি কার্যত থেমেই পড়ল। হঠাৎ কারও নজরে পড়ে গেল যে, আমরা জাপানী নই। অমনি দমাদ্দম কিল পড়তে লাগল গাড়ির ওপর। চিৎকার শুরু হলো 'বিদেশী! বিদেশী!'

বিরয়ুকভকে বললাম, 'ভান করো যে ওদের ভাষা আমরা জানি না। আর যাই করো, থামবে না। যেমন করেই হোক গাড়ি চালাতে থাকো।'

এরই মধ্যে আমাদের 'টার্গেট' অর্থাৎ সেই বাড়িটি আমরা অতিক্রম করে গেলাম। তবে ভাল করে দেখে নিয়েছি। রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে পুরোপুরি থেমে যেতে হলো। একদল তরুণ আর বয়স্ক লোক পথ আটকে ফেলল।

'আমি কথা বলে দেখি ওদের সাথে। বেরিয়ে যাচ্ছি গাড়ি থেকে,' বললাম বিরয়ুকভকে। 'একটি কথাও বলো না। রুশ ভাষার একটি শব্দও যেন ওরা না শোনে।' জানতাম এই জাপানীগুলো হয়তো আমাদেরকে রুশ না ভেবে আমেরিকানই ভাববে। আমিও চাইলাম যে তাই ভাবুক ওরা। আরও জানতাম যে, অনেক জাপানীর কাছে ইংরেজী হচ্ছে স্রেফ ইংরেজী। উচ্চারণের হেরফের ওরা লক্ষ্য করে না। গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম জনতার দিকে। এক গাল হেসে বললাম, 'হাই দেয়ার! ইংরেজী জানো কেউ?'

এক বুড়ো এগিয়ে এসে 'বাউ' (মাথা নত করা) করল।

'দেখুন, আমি আর আমার বন্ধু অমুক জায়গাটা খুঁজছি,' যে জায়গাটার নাম বললাম, ওটা প্রায় মাইল খানেক দূরে। বুড়ো আমাকে পথ বাতলে দিল্ল। আমি 'বাউ' করলাম। বুড়ো 'বাউ' করল। যেন দুনিয়া জয় করেছি এমন ভঙ্গিতে ফিরে গেলাম গাড়িতে। ম্যাজিকের মত পথ খুলে গেল। জনতা সরে দাঁড়াল দু'পাশে। বাইরে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'থ্যাঙ্কস আ বাঞ্চ, পাপা-সান।'

বিরয়ুকভের হাত কাঁপছিল থরথর করে। গিয়ার বদলাতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। নীরবে সারাটা পথ ড্রাইভ করে ফিরে এলাম দূতাবাসে।

বেজায় খুশি হলেন গুরিয়ানভ। বললেন, 'পুরো ঘটনাটাই ভুলে যাও। দেশে ফিরে গেলে কাউকে বলো না কখনও।'

ব্যাপারটার পিছনে কি রহস্য ছিল কিংবা বাড়িটা নতুন হওয়া কেন অত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা জানতে পারিনি কোনদিন। তবে গুরিয়ানভ ভুলে যেতে বললেও মারমুখী জনতার দ্বারা পরিবেষ্টিত সেই মুহূর্তটির কথা ভুলতে পারি না। আরও সমস্যা ছিল এই যে, আমরা জাপানী পুলিশের সাথে কোন ঘটনায়

জড়াতে চাইনি।

আমাকে স্বীকৃতি বা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হলেও গুরিয়ানভ নিজে যথেষ্ট সমীহ করতেন। তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে সকল গোপন তৎপরতার তালিকা হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে তুমি সর্বক্ষণের জন্য অ্যাকটিভ মেঝারস্ অফিসার হলে।' এভাবে তিনি বুঝিয়ে দিলেন আমার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ কত উঁচু। আমি বিস্মিত ও খুশি হলাম।

'এখন কিছু পরিকল্পনা করা যাক,' বললেন তিনি। 'তোমার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। কাজেই সময় এসেছে তোমার এজেন্টদের অন্য অফিসারদের হাতে তুলে দেয়ার। নিউটাইমস-এর কাজকর্মও কমিয়ে দাও। এতে অ্যাকটিভ মেঝারস্-এর কাজে মনোনিবেশ করার সময় পাবে।'

জাপানে থাকাকালে বিশেষ বিশেষ প্রকল্পে অ্যাকটিভ মেঝারস্ বিভাগের সাথে কাজ করেছি এবং জানতাম যে, অ্যাকটিভ মেঝারস অফিসার হবার মানে হচ্ছে সর্বক্ষণের চাকরির চাইতে বেশি কাজ করা। এখন একটা গোপন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি বলে আমি চাইলাম প্রাপ্ত সুযোগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহারের পরিকল্পনা করতে।

মস্কো থেকে জাপান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা চালাবার জন্য প্রতিদিন নির্দেশ পেতাম। প্রতিটা নির্দেশ পালনের জন্য আমাকে অ্যাকটিভ মেঝারস্-এর প্রতিটি এজেন্ট আর কনট্রাক্ট-এর গোটা তালিকা ও কাজের প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ করতে হত। এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট, কাকে দিয়ে কাজটা করানো যাবে তা খুঁজে বের করা। রেসিডেন্সির সমগ্র গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক পর্যালোচনা করার নিজস্ব ব্যক্তিগত কারণও আমার ছিল, কেজিবি টোকিওস্থ আমেরিকান গোয়েন্দা ব্যবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছে কিনা তা জেনে নেয়া। সে রকম অনুপ্রবেশের কোন প্রমাণ পাইনি।

আমার এজেন্টদের হস্তান্তর করলাম অন্য অফিসারদের কাছে। অবশ্য ঘটনাক্রমে অক্টোবরের মাঝামাঝি আরেকটা বড় ধরনের অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। লাইন কে আর-এর প্রধান য়ুরি দুভোরিয়ানচিকভ ছুটিতে যান এবং রেসিডেন্টের হুকুমে আমাকে আবারও এজেন্ট আরেস-এর ভার নিতে হয় অস্থায়ীভাবে (লাইন কে-আর বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থায় অনুপ্রবেশ, নিরাপত্তা বাহিনীতে অনুপ্রবেশ, বিদেশে অবস্থিত সোভিয়েত নাগরিকদের মধ্যে মতাদর্শগত ভিত্তি অটুট রাখা এবং সোভিয়েত দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত)।

আরেস-এর সাথে আবার দেখা হওয়া পুরানো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলনের

মত। উচ্ছ্বাসে ভরে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে তিনি বললেন, 'কি ভাল লাগল আপনাকে আবার দেখে। আবার একত্রে কাজ করব তো?'

'না, আমি দায়িত্ব নিয়েছি অস্থায়ীভাবে। দেশে ফিরে যাব অল্প কিছুদিনের মধ্যে।'

'দুঃখিত, লেভচেঙ্কো সান। কখন যাবেন?'

'যে কোন দিন। মাস শেষ হবার আগেই।'

'আপনি চলে গেলে খারাপ লাগবে,' বললেন তিনি। 'প্রথমদিকে ভাল লাগেনি আপনাকে। তারপর তো বন্ধু হয়ে গেলাম। দুই বন্ধুর মতই বিপদের মোকাবিলা করলাম। অনেক কাজ করেছি আমরা, তাই না? হ্যাঁ, সত্যি খারাপ লাগবে আপনি চলে গেলে।'

'গোয়েন্দা অফিসারের জীবন এ রকমই,' বললাম তাঁকে। 'অনেকের সাথে দেখা হয়। কাউকে কাউকে সত্যিকারভাবে ভাল লেগে যায়। তারপর এসে পড়ে বিদায়ের সময়, বন্ধুরা হয়ে যায় স্মৃতি। বড় বেদনাকর এ ব্যাপারটি।'

'আপনার সাথে যোগাযোগ করা যাবে তো?'

উচিত ছিল গতানুগতিক জবাব দিয়ে বলা যে, আমার জায়গায় যিনি আসবেন তাঁর মাধ্যমে যে কোন সময়ে যোগাযোগ করা যাবে। কিন্তু ভিতর থেকে কিসে যেন বাধা দিল। মিথ্যা বলতে পারলাম না লোকটার সাথে। তাই জবাব দিলাম, 'না, যাবে না। জাপান থেকে আমার বিদায় নেয়ার সাথে সাথে এ পর্বের শেষ। তবে এখনি বিদায় নেয়ার দরকার নেই। যাবার আগে আরও কয়েকবার দেখা হবে আমাদের।'

'দুঃখিত, লেভচেঙ্কো-সান,' বললেন তিনি। তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, 'আপনাকে এমন কিছু দিতে পারি যা আপনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করবেন বিদায় উপহার হিসাবে।'

'সেটা কি?'

'ডাইরেক্টরী'।

নিজের কানকেই বিশ্বাস হলো না! বলে কি লোকটা!

ডাইরেক্টরী হচ্ছে সাতশো পৃষ্ঠার একটা রোস্টার। ওতে রয়েছে বেশিরভাগ জাপানী নিরাপত্তা অফিসারের নাম, ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর। আমার জাপানে অবস্থানকালে (এবং তারও আগ থেকে) সোভিয়েতরা ডাইরেক্টরীর একটা কপি হস্তগত করার চেষ্টা করে এসেছে। জাপানী নিরাপত্তা অফিসাররা কে কোথায় থাকে এবং চাকরির ক্ষেত্রে কার কি অবস্থান জানার জন্য ওটা যে কি প্রয়োজনীয় বস্তু হতে পারে তা সোভিয়েতরা জানত।

আরেস-এর খবরটা শুনে রেসিডেন্ট গুরিয়ানভ আমার মতই উত্তেজিত হলেন। আমাকে বললেন হস্তান্তরের অপারেশনটা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত আমি যেন আরেস-এর ওপরই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখি। দিন কয়েক পরে আবার দেখা করলাম আরেস-এর সাথে।

'ডাইরেক্টরী আনতে পারি আপনার জন্য, কিন্তু আমি ওটা রাখতে পারব মাত্র দু'ঘন্টা—বেলা ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত।'

'ওইটুকুন সময়ের মধ্যে আমি-আপনি যে ওটার ফটো নিতে পারব তার কোন উপায় নেই' বলাম, তাঁকে। 'ওটা কপি করার সমস্যাটি সমাধান করতে হবে রেসিডেন্সিতে। রাজি?'

'রাজি। কিন্তু ওরা খুব অল্প সময়ের জন্য পাবে। কারণ ডাইরেক্টরীটা আমার কাছে ফিরে আসতে হবে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি যাতে ৩টার আগে আমার কন্ট্যাক্টকে ফেরত দিতে পারি।'

'খুব কঠিন ব্যাপার। তবে একটু সময় দিন আমাকে। দেখি কিভাবে কাজটা করা যায়' বললাম তাঁকে।

পরবর্তী সাক্ষাতে তাঁকে বললাম, হস্তান্তরের দিন বেলা ১টা ১৫ মিনিটে আপনি জাপান-ফরাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সামনে দিয়ে যাবেন। ওই সময় জিনিসটা গুঁজে দেবেন আমার হাতে। বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে একই স্থানে একই পন্থায় আমি ওটা ফেরত দেব।'

দু'জনেই জানতাম যে, কেজিবি'র হাতে ডাইরেক্টরীটা থাকবে মাত্র দেড় ঘন্টা এবং তারও কিছু অংশ যাবে আনা-নেয়া করতে।

'ঠিক আছে, কোন গোলমাল দেখা দিলে কোড ব্যবহার করে টেলিফোন করব' বললেন আরেস।

নির্ধারিত দিনে জাপান-ফরাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের দিকে যাবার সময় মনে হলো আমার পদক্ষেপের শব্দ বড় বেশি হচ্ছে। দেখলাম বিপরীত দিক থেকে আরেস হেঁটে আসছে আমার দিকে। এগিয়ে গেলাম। হোঁচট খেয়ে তাঁর গায়ে পড়লাম।

'খুবই দুঃখিত।'

'মাফ করবেন, দোষটা আমারই,' বললেন তিনি বিনীতভাবে।

কাজ হয়ে গেল। প্যাকেটটি চলে এসেছে আমার হাতে। আমি ওটা তুলে দিলাম অপেক্ষমাণ এক ড্রাইভারের হাতে। দ্রুত পায়ে গিয়ে ঢুকলাম এক রেস্তরাঁয়। প্যাকেটটি চলে গেল এক মাইল দূরে কেজিবি'র এক অফিসারের হাতে। সে ওটা নিয়ে গেল রেসিডেন্সিতে। সেখানে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে

ওটার কপি করা হলো পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। ২টা ৪০ মিনিটে জিনিসটি ফিরিয়ে দেয়া হলো আমাকে। ওটা নিয়ে আবার হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম জাপান-ফরাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সামনে। পরিহাসের বিষয় হচ্ছে গোয়েন্দাবৃত্তির এ ক্যুদেতাটি আমি করলাম আমার সপক্ষত্যাগের ঠিক প্রাক্কালে। এটা করলাম যাতে আমার নিজস্ব প্ল্যানটি কারও চোখে ধরা না পড়ে।

আরেস-এর দিকে এগিয়ে যেতে আবেগে গলা বুজে এল আমার। ডাইরেক্টরীটা গুঁজে দিলাম তাঁর হাতে। ফিরে চললাম। আর কখনও দেখা হবে না লোকটার সাথে। হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলেন আরেস। পেশাদারী অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ডাক দিলেন আমাকে। এটা বিপজ্জনক এবং শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ। আমার হাত ধরে তিনি বললেন, 'বিদায় আমার রুশ বন্ধু।'

অতিকষ্টে আবেগ চেপে জবাব দিলাম, 'ধন্যবাদ, আরেস, বিদায়।'

ফিরে চললাম। আমি বিদায় নিয়েছি শুধু এক বন্ধুর কাছ থেকেই নয়, বিদায় নিচ্ছি আমার প্রিয় জাপানের কাছ থেকে, শান্ত নম্র জাপানী জনগণের কাছ থেকে।

মনে মনে প্রার্থনা করলাম, 'ঈশ্বর সাহায্য করুন আমাকে। সময় এসেছে।'

২৪ অক্টোবর। ঘুম এল না রাত ৪টা পর্যন্ত। নাতালিয়া ঘুমাচ্ছে অন্য এক ঘরে। যদ্দূর জানি, আমার ফিরে আসাও টের পায়নি সে। বিছানা ছেড়ে উঠলাম সকাল সাড়ে আটটায়। নাতালিয়া তার আগেই চলে গেছে দূতাবাসে। আমার জন্য চমৎকার ব্রেকফাস্ট রেখে গেছে। খেলাম, যদিও খাবার গলা দিয়ে নামাতে কষ্ট হলো।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যথাসম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলাম। ব্রেকফাস্টের পর একটু ভাবনা-চিন্তা করতে বসলাম।

কয়েকটি বিষয় অনিশ্চিত রয়ে গেছে। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব পাইনি। জবাব না পাওয়া প্রশ্নগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঃ কেজিবি যদি আমেরিকান গোয়েন্দা নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করেই থাকে তবে সেটা কি এতই উচ্চস্তরে যে, আমি চলে যেতে চাইলে আমাকে আবার ধরে ফেলতে দেবে? আমি এখন মরণকে ভয় করি না। মরণের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছার আগে সোভিয়েতরা কি করে বসবে সেটাকে শুধু আমার ভয়। আমার মত 'বিশ্বাসঘাতকদের' ওপর মস্কোর লেফোর্তোভো কারাগারে যে অত্যাচার চালানো হয় তা আমার জানা। ট্রেনিং-এর সময় আমাদের কেজিবি'র এক কর্নেলের ছবি দেখানো হয়েছিল। লোকটাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে স্ট্রেট-জ্যাকিট পরিয়ে প্লেনে টেনে তোলা হচ্ছিল ইস্তাম্বুলে। কারণ তিনি দলত্যাগের চেষ্টা করেছিলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা

বিভাগের সোভিয়েত এজেন্ট কিম ফিলবি কর্নেলটির কথা জানিয়ে দিয়েছিল ওদেরকে। এভাবেই ধরা পড়ে যান কর্নেলটি। ওরকম আবারও ঘটতে পারে। আমিও ধরা পড়তে পারি, যদি সোভিয়েতরা আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থায় অনুপ্রবেশ করে থাকে।

রেসিডেন্সির নেটওয়ার্কে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমি জাপানে ওরকম কোন এজেন্টের সন্ধান পাইনি। ওরকম কেউ আছে বলে বিশ্বাস হয় না আমার। তবে ভার্জিনিয়ার সিআইএ হেডকোয়ার্টারে কেউ আছে কি-না জানি না।

এর পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আমেরিকানরা কি আমাকে চটপট গ্রহণ করা, আমার বক্তব্যের যথার্থতা যাচাইকালে আমাকে রক্ষা করা এবং আমাকে জাপান থেকে দ্রুত বের করে নেয়ার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারবে? এ প্রশ্নের জবাবে শুধু বলতে পারি, 'সেটা দেখা যাবে সহসা।'

অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করেছি যে, হোটেল স্যানোতে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের লোকজন, সামরিক অফিসার আর অন্য উচ্চপদস্থরা প্রায়ই আসেন। ওখানে নানা সামাজিক অনুষ্ঠান, অভ্যর্থনা, ডিনার, লাঞ্চ ইত্যাদি হয়। অনেকদিন আগেই ভেবে রেখেছি যে, হোটেল স্যানোতেই যেতে হবে।

সকাল এগারোটায় অন্যদিন যেভাবে কাজে যাই ঠিক সেভাবে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে প্রেসক্লাবে গেলাম। তারপরে যানবাহনের ভিড়ের মধ্যে ড্রাইভ করে এঁকেবেঁকে চলে গেলাম শহরতলীতে। মাঝে মাঝে পাশের রাস্তায় ঢুকে লক্ষ্য করলাম কেউ আমাকে অনুসরণ করছে কি-না। করছে না দেখে আরও এগিয়ে গাড়ি পার্ক করলাম। হাঁটলাম কিছুক্ষণ। কয়েকটা বইয়ের দোকানে গেলাম। একটা ছোট্ট রেস্তরাঁয় ঢুকে চা খেলাম এক কাপ, স্নায়ুর উত্তেজনা কমাবার জন্য।

অবশেষে রাত ৮টায় গিয়ে ঢুকলাম হোটেল স্যানোতে। লবীতে ডেস্কের পিছনের লোকটাকে বললাম, 'রিসেপশনটা কোন্‌দিকে?'

লোকটা আমাকে এগিয়ে যেতে বলল হলের দিকে। সেখানে একটা বড় রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন সেন্ট্রি। লোকের ভিড়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর একজন কম্যাণ্ডারকে দেখতে পেয়ে তাঁকেই আমার লক্ষ্য বলে স্থির করলাম। সেন্ট্রিটাকে বললাম, 'ওই কম্যাণ্ডারকে বলবেন কি যে আমি তাঁর সাথে একটু আলাপ করতে চাই?'

'নিশ্চয়ই, স্যার,' বলে স্যালুট করে সে চলে গেল বড় রুমটার মধ্যে। দেখলাম সে কম্যাণ্ডারকে কিছু বলছে ফিসফিস করে। শুনে কম্যাণ্ডার কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। এরপর আমার কাছে তিনি বিনীতভাবে

বললেন, 'কিছু করতে পারি আপনার জন্য?'

'আমার নাম স্তানিশ্লাভ লেভচেঙ্কো। সোভিয়েত সাময়িকী নিউটাইমস-এর টোকিওস্থ প্রতিনিধি। একজন আমেরিকান গোয়েন্দা অফিসারের সঙ্গে এখনি আলাপ করতে চাই।'

দ্বিধা করে কম্যাণ্ডার শান্তস্বরে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন একটা খালি ঘরে। বেরিয়ে যাবার আগে বললেন, 'আপনি অপেক্ষা করতে পারেন এখানে।' ঠিক দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যে দু'জন মিলিটারির লোক এসে দরজার দু'পাশে প্রহরী হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল। আমি অপেক্ষায় রইলাম। প্রতিটি মুহূর্ত মনে হতে লাগল অসম্ভব দীর্ঘ।

প্রায় আধঘন্টা পরে দরজা খুলে গেল। অভিজাত চেহারার এক ভদ্রলোক এসে প্রহরীদের বললেন, 'বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, একটু।' তারপর ফিরলেন আমার দিকে। বিনম্র হাসি হেসে বললেন, 'আমার নাম রবার্ট। কি করতে পারি আপনার জন্য বলুন?'

'মাফ করবেন, আপনাকে অসম্মান করছি না, কিন্তু আপনার কোন পরিচয়পত্র বা আই. ডি. না দেখলে কেমন করে বুঝব যে ঠিক লোকের সঙ্গে কথা বলছি?'

ওয়ালেট খুলে তিনি আই. ডি. দেখালেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বহুবার মনে মনে আউড়ে রিহার্স্যাল দিয়ে তৈরি করা কথাগুলো বলে ফেললাম, 'আমি শুধু নিউটাইমস-এর প্রতিনিধি নই, কেজিবি'র একজন মেজরও বটে। আমি যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করছি।'

'কি আশ্চর্য!' চমকে উঠলেন রবার্টস। 'আপনার নাম অবশ্য শুনেছি, কিন্তু আপনি যে কেজিবি'র লোক তা ভাবতেও পারিনি! অথচ আমার কিনা টোকিওতে যত কেজিবি'র লোক আছে সবার সম্পর্কেই জানার কথা!' থ' খেয়ে স্রেফ দাঁড়িয়ে রইলেন রবার্টস কিছুক্ষণ। শেষে বললেন, 'মি. লেভচেঙ্কো, আপনি যা বলছেন তার প্রমাণ দিতে পারবেন?'

'আমার সঙ্গে কোন দলিল নেই,' বললাম তাঁকে। নিজের কানেই কথাগুলো বেখাপ্পা শোনাল। 'এবং আমার হাতে সময়ও নেই। আমি বিপন্ন। আমরা দু'জনেই জানি যে, প্রতি মুহূর্তে বিপদটা বেড়ে চলেছে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক···ওয়াশিংটনকে অবশ্য জানাতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে আমাদেরকে, বোঝেন তো আপনি। এখন আমাকে একটু সাহায্য করুন। বলুন তো সোভিয়েত রেসিডেন্ট কে?'

'ওলেগ গুরিয়ানভ।'

'তাঁর আগে কে ছিলেন?'
'দ্‌মিত্রি ইয়েরোখিন।'
'লাইন পিআর-এর প্রধান কে এ মুহূর্তে?'
'কে কনস্তানতিনোভিচ সেভাস্তিয়ানভ।'
'তাঁর কোন ডাকনাম আছে?'
'হ্যাঁ, বন্ধুদের বলেন, তাঁকে রোমান নামে ডাকতে।'
'কেন?'
'কেন তা জানি না।'
'ভ্লাদিমির প্রোন্নিকভকে জানেন?'
'জানি।'
'কেমন লোক? একটা বর্ণনা দিন।'
'কেজিবি'র মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক।'
'ভালই বলেছেন,' হেসে মন্তব্য করলেন রবার্টস। 'আপনাকে এখানে রেখে আমাকে এখন ছুটে যেতে হবে দূতাবাসে। একটুক্ষণের জন্য। চিন্তার কিছুই নেই। এখনই ফিরে আসছি।'

এবার অপেক্ষা করে থাকাটা আরও কষ্টকর মনে হলো। এখন আমি টের পাব মার্কিন গোয়েন্দা ব্যবস্থার মধ্যে সোভিয়েতদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কি না। এই রবার্টস যদি ডাবল এজেন্ট হয় তাহলে সে আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে সরাসরি তুলে দেবে কেজিবি'র হাতে। এ সম্ভাবনার কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করিনি এমন দাবি করা মিথ্যাচার হবে।

মিনিট পঁচিশের মধ্যে যা যা করার করে ফিরে এল রবার্টস। সঙ্গে আরেকজন আমেরিকান। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম ওদের মুখের দিকে। কিছুই বুঝলাম না। রবার্টস প্রহরী দুটোকে আবার বলল করিডরে অপেক্ষা করতে। দরজা বন্ধ করে গম্ভীরভাবে আমাকে বলল, 'আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক-ভাবে আপনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলাম। তবে উদ্বিগ্নও হলাম বটে। আমরা দু'জনেই জানি যে, জাপানীরা ইচ্ছা করলে কেমন গোলমাল পাকাতে পারে। আমি যে গায়েব হয়ে গেছি এটা কেজিবি টের পাবার আগে আমাকে জাপান থেকে বের করা না গেলে সোভিয়েতরা জাপান সরকারের ওপর অবর্ণনীয় চাপ সৃষ্টি করবে। আমাকে দ্রুত সরিয়ে ফেলা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাকে অদৃশ্য করে ফেলুন। আপনাদের আতসুগি বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যান। প্লেনে তুলে জাপানের বাইরে যেকোন জায়গায় সরিয়ে দিন।'

'ঠিক ওটাই যাতে করা হয় সে চেষ্টা করব। কিন্তু, বোঝেন তো, সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক আমি নই। এখন চলুন এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

হোটেল স্যানো থেকে বেরিয়ে গেলাম কোনরকম বাধা বিপত্তি ছাড়াই। একটা অতি সাধারণ চিহ্নহীন গাড়িতে উঠে বসলাম। চালকের আসনে রবার্ট। তিনি চারদিক দেখেশুনে সতর্ক পেশাদারী ভঙ্গিতে ড্রাইভ করে চললেন। অবশেষে এক অভিজাত শহরতলী এলাকায় গিয়ে গাড়ি পার্ক করলেন। চার পাঁচ ব্লক হেঁটে গিয়ে বাগানের পিছনে এক বড় বাড়িতে উপস্থিত হলাম। অনির্দিষ্ট বয়সের এক আকর্ষণীয় মহিলা বললেন, 'ভিতরে এসো রবার্ট, অনেক দিন আসোনি এদিকে।'

'এবার এলাম এক বন্ধুকে নিয়ে,' বললেন, রবার্ট। আমাকে বললেন, 'এ মহিলাটি আমাদের বন্ধু।'

রবার্টের বন্ধু আমাদেরকে বললেন, 'ডিনার প্রায় তৈরি। হাত-মুখ ধুয়ে একটা ড্রিঙ্ক নাও। এসো আমার সঙ্গে। তোমাদেরকে রুম দেখিয়ে দিচ্ছি।'

তিনি আমাদেরকে বাথযুক্ত একটা আরামদায়ক ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখলাম যে, আমাদের জন্য তোয়ালেও রয়েছে। আমাদেরকে তৈরি হয়ে নিচে আসতে বলে চলে গেলেন মহিলা।

পরে আমাদেরকে একটা চমৎকার ডিনার পরিবেশন করে মহিলা অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁকে আর দেখিনি।

রবার্টের সাথে যে আমেরিকানটি হোটেল স্যানোতে গিয়েছিলেন তিনি আসলেন। আমাকে বললেন, 'আপনার গাড়িটি লুকিয়ে রেখে এসেছি অনেক দূরে টোকিওর আরেক প্রান্তে। চাবিগুলো দেব?'

'লাগবে না।'

দুই আমেরিকানই হেসে উঠলেন। 'ঠিকই আছ, স্তানিশ্লাভ,' বললেন, দ্বিতীয় আমেরিকানটি। তারপর রবার্টকে বললেন, 'সব কিছু ঠিক মতই এগুচ্ছে।'

সে ছিল এক উত্তেজনাময় রাত। রবার্ট অনবরত কথা বলেছে টেলিফানে, আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে সাংকেতিক ভাষায়। আমি হেলান দিয়ে বসেছিলাম একটা চেয়ারে। রাত তিনটার দিকে আমার কাছে এসে রবার্ট বললেন, 'কিছুক্ষণের জন্য আমাকে দূতাবাসে যেতে হচ্ছে। জানি না কেন ডেকে পাঠাল। হয়তো এমন কথা বলবে যা সাংকেতিক ভাষাতেও ফোনে বলা যায় না।' আমার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল দেখে আবার তাড়াতাড়ি বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি এখন আমাদের বন্ধু। আমরা আপনাকে আর

ফেরত দেব না। কক্ষণো না। কথা দিলাম!'

সকালবেলায় ফিরে এলেন রবার্ট। যে খবর আনলেন তা আমার জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর। 'আপনাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমানে তুলে জাপান থেকে সরানোর প্রস্তাব ওয়াশিংটন প্রত্যাখ্যান করেছে।'

মনটা দমে গেল। আমি এখনও নিরাপদ নই। কেজিবি তার অক্টোপাস বাহু বিস্তার করে এখনও টেনে নিয়ে যেতে পারে আমাকে।

'কেজিবি সম্পর্কে যতটা অবহিত থাকা দরকার ততটা যদি থাকতেন তাহলে তাঁরা বুঝতেন এ প্রত্যাখ্যানের দ্বারা কি বিপদের মুখে ঠেলে দিলেন আমাকে,' বললাম রবার্টকে। 'আমার জাপান থেকে বেরিয়ে যাবার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হচ্ছে আমেরিকান বিমান। আমার উধাও হয়ে যাবার ওটাই পথ।'

'স্তান,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন রবার্ট। এ প্রথম আমার নামের এ আমেরিকান রূপান্তরটি শুনলাম। এখন এছাড়া অন্য নামে কেউ আর ডাকে না আমাকে। আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। 'শোনো, স্তান, কাজটা ঠিকভাবেই হবে। কোন গোলমাল হবে না। এখন দেখো ইতোমধ্যেই কি কি করা হয়েছে। এই হচ্ছে তোমার পাসপোর্ট। সরকারীভাবে সীলমারা তোমার ভিসা। এই নাও প্যানঅ্যাম-এর আজকের ফ্লাইটের ফার্স্টক্লাসের টিকিট। এই হচ্ছে আমার টিকিট। আমি তোমার সাথে যাচ্ছি। তোমার সফরসঙ্গী হয়ে সম্মানিত বোধ করছি আমি।'

'বিমানবন্দরে গোলমাল বাধবে। গোলমাল হবেই,' বললাম বিষণ্ণভাবে।

ঘণ্টা কয়েক পরে গেলাম বিমানবন্দরে। কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি হয়ে গেল নির্বিবাদে। ফার্স্টক্লাস ডিপারচার লাউঞ্জ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার আশঙ্কা অমূলক। ঠিক তখনই ব্যাপারটা ঘটল। মাত্র কয়েক ফুট যাওয়া বাকি থাকতে জাপানী প্রতিগোয়েন্দা বিভাগেরর দু'জন অফিসারের মুখোমুখি হলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিনলাম তাঁদেরকে, তাঁরাও নিশ্চয়ই চিনেছেন আমাকে। 'কর্ম সেরেছে,' বললাম রবার্টকে।

ওই দু'জন ওদের সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেবে। জানিয়ে দেবে ওদের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়কে। আর মন্ত্রণালয় জানা মাত্রই জেনে যাবে কেজিবিও। 'ঠিক আছে,' বলল রবার্ট। 'একটু গোলমালে পড়লাম বৈকি। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। আমরা এটা সামাল দেব। এর চাইতে খারাপ পরিস্থিতিও তো মোকাবিলা করেছ।' করেছি কি-না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। কেজিবি যদি

চাপ দিয়ে জাপানকে বাধ্য করে আমাকে ফেরত দিতে তা হলেই আমি খতম।

অল্পক্ষণের মধ্যে ফার্স্টক্লাস লাউঞ্জে প্রায় দেড় ডজন জাপানী এসে ভিড় জমিয়ে ফেলল। একজন সম্ভবত দলের সিনিয়র অফিসার। রবার্টের কাছে গিয়ে ইংরেজীতে বলল, 'আপনার সঙ্গের ভদ্রলোকটির সাথে একটু কথা আছে, স্যার।'

'দুঃখিত,' বলল রবার্ট, 'আমাদের সময় নেই। দশ মিনিটের মধ্যে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হয়ে যাচ্ছি।'

'আপনাদের যাবার আগেই এ ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে হবে আমাদেরকে,' আবার বললেন অফিসারটি।

'কেন?'

'সরকারী কাজের প্রয়োজনে,' জবাব দিলেন অফিসারটি।

'আমি বৈধ আমেরিকান পাসপোর্ট নিয়ে ভ্রমণ করছি। আমার বন্ধুর কাছে বৈধ আমেরিকান ভিসা রয়েছে। কোন অনিয়ম নেই, কাজেই আমাদের দেরি করারও কোন কারণ নেই।'

'খুবই দুঃখিত,' বিনীতভাবে মাথা নুইয়ে অফিসারটি বলল, 'স্যার, এটা যে জাপানী ভূখণ্ড এবং তা যে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমাকে এজন্যেও মাফ করবেন যে আমরা তাঁকে আলাদাভাবে প্রশ্ন করতে চাই। আপনি শুনতে বা জবাব দিতে পারবেন না।' কিভাবে কি ঘটল জানি না, তবে দেখলাম যে, আমাকে ঘিরে ফেলেছে জাপানীরা, আর রবার্ট ও অপর এক আমেরিকানকে ঠেলে লাউঞ্জের দূরতম এক কোণে নিয়ে গেছে।

'বসুন আপনি,' হুকুম দিলেন জাপানী অফিসারটি। বিনীতভাবে বললেও হুকুম হুকুমই।

'শুনুন,' বললাম ক্রুদ্ধস্বরে, 'আপনারা কে বা কারা তা জানার আগে আপনি বা অন্য কারও সঙ্গে কথা বলব না আমি।'

'আমাদের কেউ কেউ চিবা পুলিশ হেডকোয়ার্টারের লোক এবং এই অফিসাররা নিরাপত্তা বিভাগের। এঁদের দায়িত্ব আপনাকে রক্ষা করা।'

'আমাকে কি কোন অপরাধমূলক ঘটনার সাক্ষী হিসাবে আটক করা হচ্ছে?'

'আপনাকে মোটেই আটক করা হচ্ছে না। আমরা শুধু গুটিকয়েক প্রশ্ন করতে চাই।'

'আমি কি কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত?'

'না, না, অবশ্যই না।'

'কেউ কি আমার জীবনের প্রতি হুমকি দিয়েছে?'

'আমার জানা মতে নয়।' এবার অফিসারটির গলায় বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল।

যথাসম্ভব শান্তভাবে বললাম, 'সেক্ষেত্রে আপনাদের সঙ্গে আমার কথা বলার কোন কারণই তো নেই। আপনারা সবাই পুলিশের লোক কিংবা নিরাপত্তা অফিসার। ব্যক্তিগত কাজে ব্যাপৃত অবস্থায় আপনারা আমাকে বাধা দিয়েছেন। আমি কোন অপরাধী নই। কোন অপরাধ করিনি, কিংবা সংঘটিত হতে দেখিনি। এবং আপনারাই বলছেন যে, কেউ আমার প্রাণনাশের হুমকি দেয়নি। কাজেই নিজের হেফাজত আমি নিজেই করতে পারি।'

'এ অসুবিধা ঘটানোর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি,' বললেন অফিসারটি—তখনও ভদ্রতার সুর বজায় রেখে। 'তবে জাপান ছাড়তে চাইলে কথা বলতে হবে আমাদের সঙ্গে। বলুন তো আপনি কে?'

'আপনি জানেন আমি কে।'

'আপনি কি কাজ করেন?'

'আপনি তা-ও জানেন। আমি একজন সাংবাদিক। সোভিয়েত সাময়িকী নিউ টাইমস-এর প্রতিনিধি।'

'আপনি কি কেজিবি'র অফিসার?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'আমি একটা সাময়িক পত্রিকার প্রতিনিধি। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুমতি নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছি। আপনারা আমার প্লেন মিস করিয়েছেন। প্লেনটা এখনই ছেড়ে গেল।'

'দুঃখিত, কিন্তু আপনার কোনরকম কষ্ট হচ্ছে না। একটা বিলাসপূর্ণ লাউঞ্জে অত্যন্ত আরামে বসে আছেন। আমেরিকা যাবার আরও ফ্লাইট আছে আজ। কাজেই, চলুক আমাদের আলাপ। আপনি কে?'

এটাই ছিল জিজ্ঞাসাবাদের ধরন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারে একই প্রশ্ন। ইতোমধ্যে প্রথম প্লেন চলে গেছে, দ্বিতীয়টাও ছাড়বার উপক্রম। অবশেষে ফেটে পড়লাম।

'আমাকে হয় ছেড়ে দিন, নইলে গ্রেফতার করুন!'

'গ্রেফতারের কোন প্রশ্নই নেই এ কেস-এ,' আশ্বস্ত করা হলো আমাকে। 'তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে একটা কনসুলার চুক্তি রয়েছে আমাদের। আমরা ওদের অসন্তুষ্টি ঘটাতে পারি না। ওদেরকে জানাতে আমরা বাধ্য। আপনার চলে যাবার আগে দেখা করার ও কথা বলার সুযোগ ওদেরকে দিতেই

হবে।'

জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে লাউঞ্জে মানুষের ভিড় বেড়েই চলল। লক্ষ্য করলাম আমেরিকান ব্যবসায়ীদের একটি গ্রুপ অপেক্ষা করছে আমেরিকাগামী প্লেনের জন্য। আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছিল কিছুটা বিচ্ছিন্ন এক কোণে। কিন্তু ক্রমেই ভিড়ের চাপ সরে আসছে আমাদের কাছাকাছি। কেউ কেউ কান খাড়া করে শুনছে আমাদের কথাগুলো। এক জাপানী ভদ্রলোক তো এত কাছে বসেছেন যে, প্রতিটি শব্দই তাঁর কানে যাচ্ছে। কিন্তু সহজাত ভদ্রতাবশত তিনি ভাব দেখাচ্ছেন, যেন কিছুই শুনছেন না। সিনিয়র অফিসারটিকে বললাম যথাসম্ভব বিদ্রূপাত্মকভাবে, 'বড় মজার ব্যাপার তো! সোভিয়েতদের অনুভূতিতে যাতে আঘাত না লাগে সেটা দেখার দায়িত্ব যে পুলিশের তা তো জানতাম না। আমি সত্যি সত্যি ভাবতাম যে ও কাজটা জাপানের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের।'

মুখটা লাল হয়ে গেল অফিসারের। 'মন্ত্রণালয়ের লোক আসছেন,' বললেন মিনমিন করে।

'তাহলে ওদের প্রশ্ন ওদেরকেই করতে দিন। আমি বিশ্রামকক্ষে যাচ্ছি।'

চার-পাঁচজন জাপানী এসকর্ট ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। 'এ যে নারকীয় কাণ্ড দেখছি! আপনাদের কোন সাহায্যের দরকার নেই আমার। ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, প্রস্রাব করার কাজটা একাই সেরে ফেলবার ক্ষমতা আমার আছে বলে আমি মনে করি।'

তবুও তারা এল আমার সাথে। আমি ওখানে থাকতেই রবার্ট এসে হাজির হলো। রাগে ফুঁসছে সে। খোলাখুলি ঝগড়া বাধাতে চাচ্ছে জাপানীদের সঙ্গে।

'আমাদের দূতাবাস এ মুহূর্তে কথা বলছে জাপানের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে। ডাণ্ডার ভয় দেখাচ্ছেন। তুমি চালিয়ে যাও। দারুণ খেল দেখাচ্ছ বটে, স্তান!'

আমার নিজস্ব কায়দায় জাপানীগুলোর ওপর এক বিশ্রী প্রতিশোধ নিলাম। জানতাম ডিউটিরত অবস্থায় মদ খেতে পারবে না ওরা। তাই ওদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে স্যাম্পেনের অর্ডার দিলাম। এমন ভাব দেখাতে লাগলাম যে কি মজাই না পাচ্ছি স্যাম্পেন গিলে। আসলে মোটেই ভাল লাগছিল না আমার। মনের ভিতরে প্রচণ্ড উদ্বেগ। ওই সময় স্যাম্পেন আর ঠাণ্ডা চায়ে তফাত কি?

লাউঞ্জে ফিরে দেখি জাপানী বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে একদল লোক এসেছেন। তাঁদেরকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এতক্ষণ যে অফিসারটি প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন তিনি। 'আহ, এখন আর জিজ্ঞাসাবাদে আপত্তি করতে পারবেন না আপনি।' 'পারব না? বলে কি! আপত্তির চরম রূপ দেখিয়ে ছাড়ব,' ভাবলাম

মনে মনে।

আবারও সেই একই ধারার প্রশ্ন।

'আপনি কে?'

'আমি কে তা বলতে বলতে মুখে ফেনা ধরে গেছে। যা বলেছি তার নড়চড় ঘটাবার সাধ্য কারও নেই। নতুন কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতে পারি, কিন্তু পুরানো প্রশ্নের জবাব আর দেব না।'

'আপনি কি করবেন বা না করবেন সেটা আমাদেরকে বলে দেয়ার মত অবস্থানে আপনি নেই। এটা আমার দেশ, আপনার নয়। এখানকার নিয়মকানুন আপনি বানান না। কি করতে হবে না হবে তা-ও আপনি স্থির করেন না।' লোকটার কথার ধরন থেকে মনে হলো অশোভন ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়েছেন।

'জাপানের যেসব জিনিসের প্রশংসায় আমি সব সময় পঞ্চমুখ তার অন্যতম হচ্ছে এই যে আপনাদের এখানে আইন আছে। আপনি এ মুহূর্তে যা করছেন তা আইনসঙ্গত নয়। আগে যাঁরা প্রশ্ন করছিলেন তাঁরা অন্তত ভদ্রতা বজায় রেখেছেন। আপনার সম্পর্কে কথাটা বলতে পারলাম না,' জবাব দিলাম লোকটাকে।

এ সময় প্যানঅ্যাম-এর ডেস্ক থেকে এক মহিলা কর্মচারী আমার সর্বশেষ জেরাকারীকে নাম ধরে ডেকে বললেন, 'মাফ করবেন স্যার, আপনার ফোন···।'

টেলিফোনের দিকে হেঁটে নয়—প্রায় দৌড়ে গেলেন ভদ্রলোক। দেখলাম, শুনতে শুনতে চেহারাটা মলিন হয়ে গেল লোকটার। কে কি বলছে জানলাম না, তবে বুঝলাম কেউ যেন বেশ ঝেড়ে দিচ্ছে লোকটাকে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। পাশের অনুচরটাকে বিড়বিড় করে কি বললেন। তারপর আমার দিকে ফিরে প্রায় ঘেউ ঘেউ করার ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি যেতে পারেন।'

নম্রভাবে জবাব দিলাম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

বিশ-পঁচিশ জন জাপানী পুলিশ পরিবৃত হয়ে টার্মিনাল থেকে টারম্যাক-এর ওপর দিয়ে হেঁটে আমি আর রবার্ট গিয়ে উঠলাম অপেক্ষমাণ প্যানঅ্যাম ৭৪৭-এর ২য় ফ্লাইটে। লাউঞ্জ ছেড়ে আসার সময় লক্ষ করেছি আমেরিকান ব্যবসায়ীদের যে গ্রুপটি দল বেঁধে অপেক্ষা করছিল প্লেনের অপেক্ষায়, ওরা যেন প্লেনের অপেক্ষায় বসে থাকবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে সরে পড়েছে কোন ফাঁকে। দু'চার জন ভিড়ে গেছে আমাদেরকে ঘিরে থাকা জাপানীদের সাথে। ওরা কি আসলেই ব্যবসায়ী বা আমেরিকা যাত্রী ছিল?

বোর্ডিং প্ল্যাটফর্মের শেষ ধাপে পা দিয়ে অনুভব করলাম আমি চলেছি এক

নতুন দেশে, জীবনের সবকিছু পিছনে ফেলে। কিছু নেই আমার, গায়ের কাপড়গুলো ছাড়া। পকেটে আছে ৩০টি ডলারের জাপানী ইয়েন। ভিড় ঠেলে ছুটে আসা এক আমেরিকান জোর করে হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়েছিল ১০০ ডলার। সেই টাকাটাও আছে।

টারম্যাকের ওপর দিয়ে আসার সময় এক জাপানী পুলিশ বারে বারে বলছিল, 'প্লীজ স্যার, আমাকে না বলে যাবেন না, স্যার। প্লীজ, বলুন কোন্ কেজিবি অফিসারটা জাপানের বিরুদ্ধে কাজ করছে? প্লীজ···আমার ছোট্ট দেশটির বিরুদ্ধে বড় হুমকি হয়ে উঠেছে কোন্ লোকটা? বলুন না, স্যার, প্লীজ···'

প্লেনের দরজা বন্ধ হবার পূর্ব মুহূর্তে সামনে ঝুঁকে দেখলাম লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

হাঁক দিয়ে বললাম, 'জাপানের প্রতি বড় হুমকি যে লোকটা তার নাম জানতে চাও? সে হারামজাদার নাম ভ্লাদিমির প্রোন্নিকভ!'

প্লেনের মধ্যে দাঁড়িয়ে রবার্টের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিস্তি ডুবেছিল আর কি!'

'হ্যাঁ, স্যার, গুলিটা একেবারে কানের কাছ দিয়ে চলে গেছে!' বলে হাসল রবার্ট পুরানো বন্ধুর মত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
১৯৭৯–১৯৮১

প্যান অ্যামের ২ নম্বর ফ্লাইটে যখন ক্যালিফোর্নিয়ায় নামলাম তখন আমি নিদ্রাহীনতা আর পথশ্রমে শ্রান্ত, ক্লান্ত। দিনটা ছিল ১৯৭৯ সালের ২৬ অক্টোবর। স্থানীয় সময় সকাল সোয়া এগারোটা। তাড়াহুড়ো করে যুক্তরাষ্ট্র আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করার এবং আমার জাপানকে বিদায় জানাবার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে। আসলে, গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় প্লেনে মিনিট কয়েক ঝিমানো ছাড়া আমার একবিন্দু ঘুম হয়নি। মাথাটা ঘুরছে, কানে বোঁ বোঁ শব্দ হচ্ছে। আমি বিভ্রান্ত বোধ করছি প্লেন থেকে নামার পর। অনেক কিছু ঘটে গেছে।

অনেক পরীক্ষা অতিক্রম করতে হয়েছে।

কিন্তু মাথা ঘোরা আর অবাস্তবতার অনুভূতি সত্ত্বেও খুশি লাগছে আমার। ভাবলাম, অবশেষে মুক্ত জীবনে এলাম। ভাবতে ভাল লাগল। তবে সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি সংশয়ও জাগল মনে। এ নতুন দেশে আমি গৃহীত হব কি? আমাকে বিশ্বাস করা হবে তো? আস্থা স্থাপন করা হবে তো আমার ওপর? এ নতুন দেশে অপরিচিত সমাজে মানিয়ে নিতে পারব কি নিজেকে? উত্তেজনা, আনন্দ আর ভীতি একসাথে অনুভব করলাম মনের মধ্যে। সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠল ক্লান্তি। ইচ্ছে হলো কোথাও শুয়ে পড়ি হাত-পা মেলে, ঘুমিয়ে পড়ি অনন্তকালের জন্য।

প্লেন থেকে আমরাই নেমেছি সবার শেষে। আমাদের সামনে টোকিও থেকে যে পাঁচজন আমেরিকান ব্যবসায়ী প্লেনে উঠেছিল তাদের চারজন। কাস্টমস-এর লাউঞ্জ এলাকার দিকে যেতে দেখলাম তাদের কয়েকজন গল্পগুজব করছে, খবরের কাগজ কিনছে। কেউ কেউ অপেক্ষা করছে ফোন বুথ খালি হবার জন্য। কাস্টমস লাউঞ্জের দরজা দিয়ে বের হবার পর দেখলাম সাজানো সারিবদ্ধ চেয়ারগুলো থেকে উঠে একজন এগিয়ে এল আমাদের দিকে। প্রথমে রবার্টের, পরে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'রবার্ট? মিঃ লেভচেঙ্কো?' রবার্ট আর তিনি আইডেন্টিটি কার্ড দেখালেন একে অপরকে। 'আমি ম্যাক। আপনাকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানিয়ে আনন্দ বোধ করছি, মি. লেভচেঙ্কো,' বললেন তিনি।

ম্যাক যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মচারী। তাঁর সহজ ব্যবহার আর বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি আমাকে মুগ্ধ করল। ওই মুহূর্ত থেকে সব সময় বিবেচনাপূর্ণ ও ভদ্র ব্যবহারই পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে।

কাস্টমস-এর দিকে দেখিয়ে রবার্ট জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের ওখানে ঢুকতে হবে নাকি?'

'না, ওসব ঝামেলা আমাদের নেই। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের দু'জনকে হোটেলে তোলা। মি. লেভচেঙ্কো, আপনাকে খুবই অবসন্ন দেখাচ্ছে।'

'আমাকে স্তান ডাকুন। রবার্ট তাই ডাকে,' বললাম ম্যাককে।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন লস এঞ্জেলেস-এর এক বড় হোটেলে। রবার্ট আর ম্যাক আমার রুমে এল রুমটা আরামদায়ক কি-না দেখার জন্য।

'স্তান, তুমি ইচ্ছা মত চলতে পারো। কোন কর্মসূচীই নেই তোমার জন্য। খিদে পেলে বা ড্রিংক চাইলে রুম সার্ভিসকে ডাকবে। স্নান করে নাও আরাম

করে। ঘুমাও। বেরিয়ে গিয়ে হেঁটে বেড়াও। যা ইচ্ছা হয় করো। তোমার সময়ের মালিক তুমি। কোন কিছুর দরকার হলে রবার্ট কিংবা আমাকে ডাকবে। ভুলে যেয়ো না,' বলল ম্যাক হাসিমুখে।

'তোমার দরকারটা যদি আগামী পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে হয়, ম্যাককে ডাকবে। আমি বস্তায় যাব,' বলল রবার্ট হাই তুলে।

'কোথায় যাবে বলল রবার্ট?' জিজ্ঞেস করলাম ম্যাককে।

'বিছানায় যাবে, মানে ঘুমাবে,' বলল ম্যাক।

'আমিও বস্তায় যাব।' হাসল ওরা দু'জন। চলে গেল নিজ নিজ রুমে। তিনদিনের মধ্যে এই প্রথম একা হলাম। একটা কুইক লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে গরম পানিতে স্নান করে নিলাম। রুম সার্ভিস লাঞ্চটা দিয়ে গেল। খেতে লাগলাম রুমের মধ্যে হেঁটে হেঁটে। জানালা দিয়ে দেখতে লাগলাম দুনিয়া বিখ্যাত এ শহরটাকে। খাওয়া শেষে ট্রে-টা রেখে দিলাম দরজার বাইরে। ঝুলিয়ে দিলাম 'বিরক্ত কোরো না' সাইনবোর্ড। ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিছানায়। পড়া মাত্রই তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। বিছানার চাদর লেপ্টে গেছে গায়ে। কিছুক্ষণ পরে। বুঝলাম কোথায় আছি। আছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, লস এঞ্জেলেস শহরে, এক বিলাসবহুল হোটেলে। আতঙ্ক সরে গেল দূরে। মাথাটা ভারী হয়ে আছে। ব্যথা করছে। সিদ্ধান্ত নিলাম একটু হেঁটে আসব। তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নেব। ব্যায়াম করব একটু। আমাকে বলা হয়েছে, যা ইচ্ছা তাই করার স্বাধীনতা আমার আছে। কিন্তু হোটেল থেকে বের হবার সময় এ সন্দেহটা ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না যে, আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণকারীকে ধোঁকা দেয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করলাম। মিনিট দশেক পরেই সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম যে, কেউ আমার পিছু নেয়নি। দারুণ খুশি লাগল। ইচ্ছা হলো নাচি, গান গাই, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠি 'আমি অবাঞ্ছিত নই।'

কেউ কিছু বলল না আমাকে। হোটেলের বাইরে হাঁটতে হাঁটতে কিছু কাপড়, একটা টুথব্রাশ, আরও কিছু দরকারী জিনিস কিনে নিলাম।

যেখানেই গেলাম, দেখলাম দোকানিদের, সেলসম্যানদের হাসিমুখ। প্রতিটি কেনাকাটার পরেই ওরা বলল, 'দিনটা তোমার সুন্দর কাটুক'। এরকম কথা আগে কখনও শুনিনি। বড় ভাল লাগল। দীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষার ধকল থেকে এখনও মুক্ত হইনি। আমার জন্য এসব ব্যস্ত হাসি-খুশি মানুষকে দেখা এক নতুন অভিজ্ঞতাই বটে।

রবার্ট আর ম্যাক তাদের রুম নম্বর দিয়েছে আমাকে। এ ছাড়া কোন খবরদারি বা কোন রকমের তত্ত্বাবধানের চেষ্টা করেনি। ডিনারে দেখা হয় তিনজনের। তবে কথাবার্তা রসালাপের পর্যায়ে থাকে। ওরা জানে আমার আবেগ অনুভূতিকে একটু ধাতস্থ হবার সময় দেয়া দরকার। রবার্ট কিংবা আমার নতুন বন্ধু কিছু বলার জন্য আমাকে চাপ দেয়নি। প্রশ্নও করেনি খুঁটিয়ে। সে রাতে উদ্বেগমুক্ত মন নিয়েই শুতে গেলাম এবং ঘুমালাম একটানা।

অক্টোবরের ২৭ তারিখে রবার্ট আর আমি টিডব্লিউএ'র ফ্লাইটে গিয়ে নামলাম ওয়াশিংটন ডিসি'র ডালেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। এবার আমাদের দেখা হলো তিন অফিসারের সাথে। তাঁরা আমাদের নিয়ে গেলেন ওয়াশিংটনের একেবারে কাছে ভার্জিনিয়ার এক বড় আবাসিক কমপ্লেক্স-এ। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো তিন রুমের এক সাজানো-গোছানো অ্যাপার্টমেন্টে। বলা হলো আরামে থাকতে। তারপর জানানো হলো পরবর্তী কয়েকদিনের কর্মসূচী।

রবার্ট তিনদিন থাকবে ওয়াশিংটন এলাকায়। তার নিজের কিছু সরকারী কাজ সেরে নেবে, আর আমার যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। যে তিনজন আমাদের সাথে দেখা করেছে এয়ারপোর্টে তাদের দু'জন থাকবে আমার সাথে। তৃতীয় জন হবে আমার বার্তাবাহক।

'অ্যাপার্টমেন্টটা আপনার,' বলল তৃতীয় জন, আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে। 'যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সাময়িকভাবে এটা ভাড়া করেছে বিশেষভাবে আপনার জন্য।'

ওদের একজন বলল তার নাম জন। সে বলল, 'জেফ আর আমি আপাতত এখানে আপনার সাথেই থাকব। ভাববেন না যে, আপনার ওপর নজর রাখা বা আপনার ওপর কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য।'

দু'জনকেই পছন্দ হলো আমার। জনের বয়স বছর পঁয়ত্রিশেক হবে। সুরসিক এবং বুদ্ধিমান। জেফ-এর বয়স একটু বেশি—পঞ্চাশের ওপর। তার রসবোধ একটু শুকনো ধরনের।

জেফ বলল, 'আমাদের থাকার একমাত্র কারণ হলো আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আমাদের বন্ধুজনোচিত বডিগার্ড সার্ভিস ভাবলেই চলবে।'

'আমাদের সন্দেহ হচ্ছে কেজিবি হন্যে হয়ে চেষ্টা করবে আপনার অবস্থান জানার জন্য,' বলল জন।

রবার্ট ফিরে গেল জাপানে তার কর্মস্থলে, তাকে বিদায় দিতে বেশ কষ্ট লাগল। অল্প দিনের জানাজানি। এরই মধ্যে আমরা বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যিকারভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম তার ওপর। জেফ আর জন পরে আমাকে বলে যে ওরকম নির্ভরশীলতার অনুভূতি জাগা অস্বাভাবিক নয়। জীবনের পরিচিত সব কিছু ছেড়ে অজানা কোন দেশে যেতে হলে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে সময় কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করে যে লোকটি, সে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রথম ক'দিন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তেমন বের হলাম না। বিশ্রাম নিলাম। খাওয়া-দাওয়া করলাম। ঘুমালাম। শক্তি ফিরে পেলাম দিনের পর দিন। আমার অবস্থা ছিল ঠিক দীর্ঘদিন জ্বরভোগের পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর মত। জেফ, জন আর আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে শুয়ে কেবল কথা বলেই কাটিয়েছি। জানতাম ওরা আমাকে পরিচিত করাতে চাচ্ছে আমেরিকার সাথে। যতটা সম্ভব খুঁটিনাটি সব জানাচ্ছে। গোগ্রাসে গিলছিলাম সব বিবরণ। প্রশ্ন করছিলাম একের পর এক। আমেরিকার মানুষের জীবনযাত্রার সব দিক সম্পর্কে—সামাজিক নিরাপত্তা থেকে দোকানে কেনাকাটা পর্যন্ত সব কিছুর ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করলাম।

আমার রুমমেট দু'জন শান্তশিষ্ট মানুষ। দীর্ঘদিন গোয়েন্দা অফিসার থাকার ফলে আমার মধ্যে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় গড়ে উঠেছে। ঘণ্টা কয়েক মেলামেশার পরেই বুঝতে পারি একটা লোক আন্তরিক কি-না। জেফ আর জন দু'জনই খাঁটি এবং সহৃদয় লোক। জেফকে নিয়ে মাঝে-মধ্যে চলে যাই কোন বার-এ, কাছাকাছি কোন সিনেমায়, কিংবা ওয়াশিংটনের কোন থিয়েটারে। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে আমাদের মধ্যে। ভয় ছিল আমেরিকা আবিষ্কার কঠিন এবং বেদনাদায়ক হবে, কিন্তু তা হয়নি। সবকিছু নতুন, আলাদা রকমের। যা দেখি তাতেই মুগ্ধ হই। ডিপার্টমেন্ট স্টোর, সুপারমার্কেট, রাস্তায় চলমান যানবাহন—সবকিছুই দেখি মুগ্ধদৃষ্টিতে। সপ্তাহের শেষে চলে যাই, আমেরিকার আশ্চর্য জাতীয় চিড়িয়াখানায়।

'এ বছরের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে চীনের পাণ্ডা। সবাই যায় ওদের দেখতে। বাজি ধরে লিং-লিং-এর বাচ্চা হবে কিনা তা নিয়ে,' বলে জন। সুন্দর প্রাণী ওই পাণ্ডা। প্রকাণ্ড ফোলানো খেলনা পুতুলের মত। কিন্তু আমি দেখি মানুষ। সুখী, হাসি-খুশি শিশুরা, ওদের মা-বাবারা আমোদ করছে। আমেরিকান পরিবার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা বোধ হয় আমি পেয়েছি চিড়িয়াখানায় গিয়ে।

রবিবারে জেফ আর জন আমাকে নিয়ে যেত ওয়াশিংটনের বিভিন্ন গির্জায়। প্রোটেস্ট্যান্ট এবং রোমান ক্যাথলিক সব গির্জাতেই প্রার্থনা করেছি। ন্যাশন্যাল ক্যাথেড্রেল আর গ্রীক অর্থোডক্স ক্যাথেড্রালেও যাই। ওখানে যারা যায় তাদেরকে মনে হয়েছে মস্কোর অর্থোডক্স ক্যাথেড্রালের লোকদের মতই।

রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে আমার অবস্থাটা নিয়ে ভাবার সময় এল। বুঝলাম যে, আশ্রয় লাভের প্রতিদানে এবং নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আমার জীবন, আমার চাকরি জীবন, আমার রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার হেতু ইত্যাদি সম্পর্কে সকল প্রশ্নের সত্য জবাব দিতে হবে। তার জন্য আমি প্রস্তুত। তবে একটা সীমা বজায় রেখে। ভার্জিনিয়ায় পৌছার প্রথম দিনই আমি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি সেই সীমাটা কি।

'আমার আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার কারণ হলো এই যে, সোভিয়েত সমাজবাদী রাষ্ট্রের নীতিগুলো আমি আর সহ্য করতে পারছি না,' বলেছি সরকারী কর্মকর্তাকে—যিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন ক্যুরিয়ার হিসাবে। 'যে সব সৎ অফিসারের সাথে আমি কাজ করেছি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। টোকিও রেসিডেন্সিতে যারা আমার এজেন্ট ছিল তাদের কথাও বলব না। সিআই-এর কাছ থেকে টাকাও নেব না।'

'আপনি সোভিয়েত ব্যবস্থা ও নীতির কট্টর বিরোধী হয়েও প্রশংসনীয় আনুগত্যের পরিচয় দিলেন,' মন্তব্য করেছিলেন কর্মকর্তাটি।

'না, ওদের সাথে আমি বেঈমানী করতে পারি না। ওদের কাছে ব্যক্তিগত ও নৈতিকভাবে আমি ঋণী। তাই সরকারীভাবে এ প্রতিশ্রুতি দাবি করি যে, আমার দেয়া কোন তথ্য কখনও ওদের কারও বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হবে না।'

জবাবে ক্যুরিয়ার ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, 'আপনার কথা বুঝেছি, স্তান। আপনাকে স্তান বলতে পারি তো? আমাকে বব ডাকতে পারেন।'

'প্রতিশ্রুতিটা আমার চাই, বব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাকে সে প্রতিশ্রুতি না দেয় বা দিতে না পারে তাহলে আমি জাতিসংঘের কাছে আবেদন করব এবং আমাকে অন্য কোন অকমিউনিস্ট দেশে পাঠাবার অনুরোধ জানাব।'

'আর কিছু বলতে হবে অফিসকে?'

'হ্যাঁ। রুশ অর্থোডক্স চার্চের একজন পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করতে চাই। খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিলেও আমার দীক্ষা হয়নি।'

'অবশ্যই। আজই একজন পুরোহিত নিয়ে আসব এখানে।'

একজন পুরোহিত এসেছিলেন। তিনি আমাকে দীক্ষা দেন এবং প্রার্থনার

নিয়মাদি বলে।

যথাসময়ে জেফ আর জন আমার কাছে মার্কিন সরকারের কয়েকজন কর্মচারীর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি তুলল। আমি রাজি হলাম।

'যদি কিছু মনে না করো, স্তান, ওরা তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

ওরা এমন ভাব দেখাতে চাইল যেন ব্যাপারটা আমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু আমি জানতাম আসলে তা নয়। তবে ওদের চেষ্টাটা দেখে মনে বল পেলাম। বললাম, 'হ্যাঁ, সাক্ষাৎকারের সময় হয়েছে বৈকি।'

সপ্তাহ কয়েক ধরে চলল জিজ্ঞাসাবাদ আর আলোচনা। প্রশ্নকর্তাদের কারও মধ্যে আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ বা বিরূপতা লক্ষ করিনি। বুঝলাম যে, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তাঁরা বিশ্বাস করেছেন। পেশাগতভাবে বুঝলাম তাঁদের কিছু কিছু প্রশ্ন এমন হয়েছে যাতে জবাবগুলো পরে একাধিকবার যাচাই ও পরীক্ষা করে দেখা যায়। এর যে প্রয়োজন ছিল তা-ও বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমার।

মনে হয় প্রশ্নকর্তা অফিসাররা আমার অবস্থানকে অতিরিক্ত আদর্শবাদী, এমনকি হয়তো অতিসরলও ভেবেছেন। কেজিবির প্রতি এবং সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতি আমার ঘৃণা, আর কেজিবি ও ওই ব্যবস্থার কিছু লোককে রক্ষার জন্য আমার দৃঢ় সংকল্প, এ দুয়ের মধ্যে তাঁরা কোন মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

জিজ্ঞাসাবাদটা যতদূর সম্ভব কৌশলের সাথেই চালানো হয়। যদিও কোন কোন দিক থেকে ওটা আমার ও তাঁদের উভয়ের জন্যই ছিল অরুচিকর। যেমন, দিন কয়েকের ব্যবধানে দু'বার আমার পলিগ্রাফ টেস্ট নেয়া হয়। আমি যা যা বলেছি তা সত্য কিনা সেটা পরীক্ষা ও যাচাই করে দেখার জন্য এটার অবশ্য প্রয়োজন ছিল। আমার খারাপ লেগেছে পলিগ্রাফ টেস্ট-এর ব্যাপারটা। পরে অবশ্য খুশিই হয়েছি। টেস্ট নেয়ার পরে পরীক্ষক বলেন, 'আপনি যে সত্য বলেছেন তা প্রমাণিত হয়েছে।'

আমাকে অনেকভাবে পরীক্ষা করা হলো। অনেক রকম টেস্ট নেয়া হলো। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা, এমনকি, আইকিউ টেস্ট পর্যন্ত।

সব রকম জিজ্ঞাসাবাদ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে একজন বললেন, 'নিজের ক্যারিয়ার বাছতে গিয়ে কি ভুল করেছেন জানেন? আপনার হওয়া উচিত শিক্ষক কিংবা পুরোহিত, কেজিবি অফিসার নয়।'

শেষ পর্যন্ত আমাকে বলা হলো, 'স্তান, তোমার কাছ থেকে কোন সাহায্য পেলে আমরা গ্রহণ করব। তোমার বিবেকের নির্দেশে যত বেশি কার্যত কম বলতে চাইবে, বলবে। আমরা কোন চাপ দেব না।' ওরা বুঝেছে যে, চাপ দিলে

আমি বিদ্রোহ করব। আমার পুরো সহযোগিতা দিতে হলে দেব স্বেচ্ছায়।

ওয়াশিংটন ডি সি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল এলাকা। সেখানে বাস করার দৈনন্দিন সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠল। আমি বললাম যে, ওয়াশিংটন ডি সি আর ভার্জিনিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে যে সব অফিসার আর দেহরক্ষী আমার সাথে থাকে তাদেরকে প্রত্যাহার করা হোক। সরকারের তা করতে অনিচ্ছা। কিন্তু আমার জন্য স্বাধীনভাবে থাকা ও চলাফেরা করাটা কত জরুরী তা জানত বলে সরকার শেষ পর্যন্ত রাজি হয়। টাকাকড়ি সংক্রান্ত সমস্যাটি রয়ে গেল। ওরা অ্যাপার্টমেন্ট দিতে পারে। সেখানে খাবার, পানীয়, সংবাদপত্র, রেকর্ড, টয়লেটের জিনিসপত্র ইত্যাদি মজুদ করতে পারে, কিন্তু আমার নিজস্ব টাকাকড়ি দিতে পারে না। আমি এখন কার্যত বন্দী। গৃহবন্দী লোকের মত।

একদিন একজন বলল, 'স্তান, বেশি গোঁয়ার্তুমি কোরো না। যুক্তরাষ্ট্র সরকার দিনে ৫০ ডলার থেকে ২০০ ডলারে কনসালট্যান্ট রাখে সব সময়। তুমি চাইলে তা হতে পারো। তা ছাড়া, এখুনি বা তুমি কি করছ? কনসালট্যান্ট-এর কাজই তো করছ। অনেকের চাইতে ভালভাবেই করছ। তাহলে ফি নেবে না কেন?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ৫০ ডলার হিসাবে ফি নিতে রাজি হলাম।

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আমার জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্য প্রদানের পালা শেষ হয়ে আসে। আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগের চাকাগুলো তখন ঘুরতে শুরু করেছে। পরীক্ষা করছে, যাচাই করছে, মিলিয়ে দেখছে আমার দেয়া সব তথ্য ও বিবরণ। আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম চলে যেতে, একটা কাজ যোগাড় করে নিয়ে কোথাও নতুন জীবন শুরু করতে। প্রাক্তন কেজিবি অফিসার স্তানিস্লাভ লেভচেঙ্কোর কেচ্ছা এখন খতম, ভাবলাম আমি।

কিন্তু ওয়াশিংটনস্থ সোভিয়েত দূতাবাস এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কারণে তা হতে পারল না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পদার্পণের সময় আমাকে বলা হয়েছিল যে, সোভিয়েত দূতাবাসের কারও সাথে আমার দেখা করতে হবে না।

'তুমি একজন মুক্ত মানুষ,' বলেছিলেন জনৈক সরকারী কর্মকর্তা। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত কোন সোভিয়েত কর্মচারীর সাথে দেখা করার কোন বাধ্যবাধকতা তোমার নেই।'

'কিন্তু অন্যান্য দেশে তো সে রকম নিয়ম আছে, তাই না?' প্রশ্ন করেছিলাম।

'হ্যাঁ, কোন কোন দেশে নিয়ম আছে যে, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীকে তার নিজ দেশের প্রতিনিধির সাথে দেখা করতে হবে। কিন্তু এদেশে আমরা দেখা

করার সুযোগ দেই বটে, তবে সেটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক। তুমি যদি সিদ্ধান্ত নাও যে, ওদের সাথে দেখা করবে না, তাহলে দেখা করতে হবে না তোমাকে।'

'সে ক্ষেত্রে সোভিয়েত দূতাবাসের কারও সাথে দেখা করতে আমি অস্বীকার করছি। কেজিবি'র কারও সাথে এ জীবনে দেখা করার ইচ্ছা আমার নেই। সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমার হলে আমি অবশ্যই অস্বীকৃতি জানাচ্ছি।'

পরে যা ঘটল তাতে বিস্মিত হয়ে যাই। আমি নিজেকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবিনি যে আমার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দ্বারস্থ হবে। কিন্তু কার্যত প্রায় তাই ঘটল। রাষ্ট্রদূত আনাতোলি দব্রিনিন প্রথমে গেলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্সের কাছে আমার সাক্ষাৎ পাবার আনুষ্ঠানিক দাবি পেশ করলেন (দব্রিনিন পঁচিশ বছরের বেশিকাল সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬১ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত)। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলার সময় দব্রিনিন প্রায় খোলাখুলি ইঙ্গিত দেন যে, ভ্যান্স আমার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ না দিলে তিনি প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের কাছে যাবেন সরাসরি।

সাইরাস ভ্যান্সের সাথে দব্রিনিনের সাক্ষাতের অল্প কিছুদিন পরে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় পররাষ্ট্র দফতরে। একজন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারটা কি। তিনি ব্যঙ্গাত্মকভাবে বললেন, 'ব্যাপারটা আমন্ত্রণই বটে, ভাষার দিক থেকে। তবে ওটার মধ্যে আদেশও লুকিয়ে আছে।'

'বুঝলাম না।'

'রাজা-রানীরা যখন থিয়েটার দেখতে চায় তখন কি করে? থিয়েটার দলকে আমন্ত্রণ জানায়। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বুঝে নেয় যে, তাদের যেতে হবে, অভিনয় করে দেখাতে হবে। এখানে অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'আমি না বলতে পারি?'

'পারো, তবে সেটা বড় রূঢ় শোনাবে।'

'তাহলে যেতেই হবে আমাকে?'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়,' বলে হাসলেন তিনি।

কাজেই গ্রহণ করলাম আমন্ত্রণটা। সেই অফিসারটির সাথে গেলাম স্টেট ডিপার্টমেন্টে। আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো এক ডেপুটি আণ্ডার-সেক্রেটারি অফিসে। তিনি বয়সে তরুণ, মার্জিত পোশাকধারী, উঠতি আমলা। রুক্ষভাবে আমাকে বললেন, 'লেভচেঙ্কো, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে তোমার দেখা করার অনিচ্ছার কথা জানানো হয়েছে আমাদের। জিজ্ঞাসা

করতে পারি কেন দেখা করতে চাও না?'

লোকটার রূঢ়তা এবং ঔদ্ধত্য লক্ষ করলাম। তিনি আরও বললেন, 'এর অর্থ বুঝতে পারো তুমি? সোভিয়েতরা পাল্টা আঘাত হানবে। ওরা বসে বসে এটা হজম করবে না। তোমার জন্য, তোমার অসহযোগিতার কারণে মস্কোস্থ আমেরিকানরা এ মুহূর্তে নানা ধরনের পাল্টা আঘাতের সম্মুখীন।'

রেগে আগুন হয়ে গেলাম। কথা এলো না মুখে। ইচ্ছা হলো টেবিলের ওপর ডাইভ দিয়ে ঘুসি লাগাই লোকটার মুখে।

ইতোমধ্যে হামবড়া তরুণ ডেপুটি আণ্ডার-সেক্রেটারিটি আমার ওপর চাপ প্রয়োগের কাজটি চালিয়ে যেতে লাগলেন, 'মস্কোতে আমেরিকানরা পিটুনি খাবে, জেলে যাবে, অকথ্য অপমান করা হবে তাদের এবং এসব কিছুই ঘটবে একমাত্র তোমার কারণে, তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্য। ওদের ওপর যা যা ঘটবে সব কিছুর জন্য নৈতিকভাবে দায়ী হবে তুমি। মোটেও ধারণা কোরো না যে, আমরা তা ভুলে যাব।'

'দোহাই খ্রীস্টের!' ফেটে পড়লাম আমি। 'আপনি কি সত্যি ভাবেন যে, সোভিয়েতদের আমি জানি না? ওদেরকে হাড়ে হাড়ে চিনি বলেই তো আমি রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলাম। পাল্টা আঘাত? অবশ্যই ওরা হানবে। কেজিবি অফিসার স্তানিস্লাভ লেভচেঙ্কো সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে এর চাইতে বড় কোন অজুহাতের দরকার নেই ওদের। সোভিয়েত ইউনিয়নে আমেরিকানদের ওপর কি ঘটবে তার নৈতিক দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছেন আপনি? আপনাকে শুধু এটুকু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তারা সেখানে আছে স্বেচ্ছায়, আর আমার পরিবার রয়ে গেছে মস্কোতে। আমি চলে যাচ্ছি, আপনার অফিস থেকে। এখানে আসার আর কোন আমন্ত্রণ গ্রহণ করব না।'

বিদায় নিলাম।

গাড়িতে উঠে নীরবে চললাম ফিরে। এক পর্যায়ে সঙ্গী অফিসারটি আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'স্তান, আমি দুঃখিত। তোমাকে অন্তর থেকে একটা কথা বলতে চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও বসবাসের জন্য দুনিয়ার সেরা দেশ। দোষত্রুটি সত্ত্বেও মার্কিন গণতন্ত্র এখনও সক্রিয়। তবে সর্বাঙ্গ সুন্দর নয়। নিজেই তো দেখলে, কুত্তির বাচ্চারা এদেশেও আছে।'

'হ্যাঁ, আছে সোভিয়েত ইউনিয়নেও। একজনকে জানতাম। নাম প্রোন্নিকভ।'

সেদিনই ঘটনাটির একটা রিপোর্ট গেল সিআইএ-র তদানীন্তন ডেপুটি

ডাইরেক্টর ফ্রাঙ্ক কারলুকসির কাছে।

১৯৮৭-তে তিনি প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার হয়েছিলেন। কারলুকসি সাথে সাথে এই মর্মে এক সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেন যে, অতঃপর রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী স্তানিস্লাভ লেভচেঙ্কোর ওপর আমলাতন্ত্রের কোন শাখা থেকে কোন রকম চাপ প্রয়োগ করা যাবে না।

নিজের উদ্যোগে আমি শেষ পর্যন্ত সোভিয়েতদের সাথে দেখা করি। স্ত্রী আর ছেলের ভাগ্য নিয়ে ক্রমেই আমার উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছিল। আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে, আমি যে আর কখনও সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে যাব না সে বিষয়ে সোভিয়েতদের নিশ্চিত করা দরকার। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা বৃথাই চেষ্টা করছে তাও বুঝিয়ে দেয়া দরকার। তাই জানুয়ারিতে আমার যুক্তরাষ্ট্রে পৌছার দশ কি এগারো সপ্তাহ পরে, প্রথমবারের মত আমি সোভিয়েত দূতাবাসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করলাম। স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিচতলার এক রুমে হলো দেখাটা। মনে করেছিলাম, কেজিবির কোন শক্ত অফিসার আমাকে জেরা করবে। তা হলো না। ওরা পাঠাল দূতাবাসের মিনিস্টার-কাউন্সিলর মসৃণ-মার্জিত আলেকজাণ্ডার বেসার্টনিককে। ভদ্রলোক ১৯৮৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। সাক্ষাৎকারটি ছিল ঘটনাহীন এবং সংক্ষিপ্ত। মি. বেসার্টনিক আমাকে ভয় দেখাতে বা হুমকি দিতে চেষ্টা করেননি।

মি. বেসার্টনিক দু'টি চিঠি দেন আমাকে। মুখ খোলা চিঠি আমার স্ত্রী নাতালিয়ার। দুই চিঠিই নাতালিয়া আর আমাদের ছেলের দুঃখ-কষ্টের বিবরণে ভরা। বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে আমার প্রতি অবিলম্বে ফিরে যাবার অনুরোধ। বুঝতে মোটেও কষ্ট হলো না যে, কেজিবির চাপেই লেখা হয়েছে চিঠিগুলো।

চিঠিগুলো পড়ে একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলামঃ

আমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমনের কারণ কিংবা আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ কোথাও না থাকে সে উদ্দেশ্যে এ বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি ব্যক্তিগত কারণে। আমাকে বল প্রয়োগে এখানে আনা হয়নি। নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় এবং স্বেচ্ছায় আসতে চেয়েছি বলে এসেছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার কর্মকর্তাদের আমি জানাতে চাই যে, আমার সিদ্ধান্তটা অপরিবর্তনীয় এবং আমার মন পরিবর্তন কিংবা সিদ্ধান্ত বদলানোর জন্য তাদের করার কিছুই নেই।

মি. বেসার্টনিক নীরবে শুনলেন আমার বিবৃতি। এরপর সাক্ষাৎকার

তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

এ সাক্ষাৎকারের পর পরই আরও দুটো চিঠি পাই নাতালিয়ার কাছ থেকে। এগুলো স্পষ্টত সে পাঠিয়েছে কেজিবির অজান্তে। এর পরে যে বার্তা আর দু'টি টেলিগ্রাম আসে তাতে আমার স্ত্রী আর সন্তানের ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা জানতে পারি। ভীষণ চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি ওদের জন্য। প্রথম চিঠিতে আলেকজাণ্ডারের কথা লিখেছে নাতালিয়া।

'বেচারা আলেক্স, কি দুরবস্থা তার। কি দুর্ভোগ তাকে ভোগ করতে হয় স্কুলে। কেজিবি নিশ্চয়ই বলে দিয়েছে শিক্ষকদের। নইলে কেমন করে তারা এত নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন হতে পারে? সেদিন সে স্কুল থেকে এসে ছুটে গেল বাথরুমে। ছিটকিনি এঁটে দিয়ে কাঁদতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দরজা খোলানোর পর তার বিবর্ণ চেহারা দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। দরজা কি সহজে খোলে! আধঘণ্টা বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে অনেক অনুনয় করে খোলালাম। সেই রাতে ছেলে আমাকে বলল যে, টিচাররা প্রতিদিন তাকে বাধ্য করে দেশত্যাগীদের সম্পর্কে তার মনোভাব বর্ণনা করে রচনা লিখতে...'

দ্বিতীয়পত্রে সে লিখেছে যে, কেজিবির জ্বালায় অস্থির হয়ে আলেকজাণ্ডারকে অন্য স্কুলে বদলি করেছে। কিন্তু নতুন স্কুলটি আগের চাইতেও খারাপ। কেজিবি ওখানেও সক্রিয়। পরিবেশ এতই বিরূপ যে, বাচ্চাটা কতদিন সেখানে টিকতে পারবে বলা যায় না।

নিজের সম্পর্কে লিখেছে, 'স্তাস, পরিস্থিতি অবর্ণনীয়। কেজিবি সবখানে। বাড়ি থেকে বের হলেই কেজিবি পিছু নেয়। সপ্তায় অন্তত দু'বার যেতে হয় লেফোর্তভো জেলখানায়, জেরার সম্মুখীন হবার জন্য। ভয় হচ্ছে একদিন হয়তো তারা আমাকে আর বের হয়ে যেতে দেবে না। তখন আলেকজাণ্ডারের কি হবে?'

দুটি টেলিগ্রামের একই বক্তব্য, 'আমরা তোমার কাছে চলে আসতে চাই। লক্ষে পৌঁছতে ভুল কোরো না। নাতাশা এবং আলেকজাণ্ডার।'

আমি কি ওদের সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলাম?

ওদেরকে ফেলে এখানে চলে আসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় পরে কি কি ঘটতে পারে সবই বিবেচনা করেছিলাম। ভেবেছিলাম—যে পথ গ্রহণ করলে ওদের সবচেয়ে কম ক্ষতি হবে তাই গ্রহণ করেছিলাম। ওরা আমার এখানে চলে আসার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। নাতালিয়া আমার সাথে আসতে কখনোই রাজি হত না। তাই বিষয়টা নিয়ে ওর সাথে কখনও আলোচনা করিনি। সে বড় বেশি দেশপ্রেমিক। তাই আমার সাথে যোগ দেয়ার কথা

বিবেচনাও করত না। তাছাড়া ওকে বললে কেবল শোনার জন্যই নাতালিয়া অপরাধী বলে গণ্য হত। আমি এটা জানতাম। আইন অনুযায়ী আমাকে ধরিয়ে দেয়া হত তার কর্তব্য। সে কখনও তা করত না। তাকে যতটা জানি, তাতে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত। আমি মনে করেছিলাম যে, তদন্তকালে কেজিবি যখন জানবে যে আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না এবং আমরা বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তখন তারা আমার কার্যকলাপের জন্য নাতালিয়াকে আর দোষী করবে না।

আরও জানতাম যে, কেজিবির সাথে যারা সহযোগিতা করে তাদের সাথে কেজিবি ততটা কঠোর ব্যবহার করে না। ভেবেছিলাম নাতালিয়া আমার নিন্দা করে রেহাই পেয়ে যাবে। আমার মতলব সম্পর্কে নাতালিয়া আর আলেকজাণ্ডার কিছুই জানত না। আমার আদর্শগত বিদ্রোহের সাথে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। এসব জানলে কেজিবি ওদেরকে আর ঘাঁটাবে না বলেও আমি নিশ্চিত ছিলাম।

আমার ভুল হয়েছিল। ভুল করে ভেবেছিলাম যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্তালিন মনোবৃত্তি উৎখাত হয়ে গেছে এবং নির্দোষ হলেই ওই মনোবৃত্তির অশুভ হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আমার ভুল চিন্তার দরুন নাতালিয়া আর আলেকজাণ্ডার কষ্ট পেয়েছে এ ভাবনা আমাকে বাকি জীবন পীড়িত করবে। সোভিয়েতদের অশুভ কর্মের ক্ষমতাকে খাটো করে দেখব না আর কোনদিন।

১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে একদিন অতি ভোরে নাতালিয়ার সাথে টেলিফোন যোগাযোগ করতে পারলাম। অত ভোরে কেজিবির তৎপরতা তেমন থাকে না। ওর সাথে আলাপে বুঝলাম যে, মস্কোতে স্তালিনীয় বর্বরতা এখনও বহাল আছে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে আমার বৌ-ছেলে। নাতালিয়াকে চাকরি দেয়া হচ্ছে না। অতি সামান্য বেতনে সে আংশিক সময়ে একটা মাস্টারির কাজ করে। আমাদের ছেলে সংগঠিত হয়রানির শিকার। উচ্চ রক্ত চাপে ভুগছে। পেটে গোলমাল। হয়তো আলসার।

'স্তাস, সত্যি তুমি? আহ কি ভাল লাগছে তোমার কণ্ঠ শুনে,' বলল নাতালিয়া আমার গলার আওয়াজ চিনতে পেরে। 'স্তাস, আমরা বড় একা। সবাইকে হারিয়েছি···ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে আছি···আমার বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ কথা বলে না আমাদের সঙ্গে। কি বললে?' ···না, না, কিছুই আমরা পাইনি···না, কোন চিঠি, প্যাকেট বা মনি-অর্ডার পাইনি···ওরা বলে আমরা তিনজনই নাকি

আইন অনুযায়ী দোষী।'

ফোন তুলে রেখে কাঁদলাম। বাবার মৃত্যুর পর এই প্রথম অশ্রু গড়িয়ে পড়ল চোখ থেকে। অশ্রু মুছে ফেললাম। বুঝলাম যে, এখনও অনেক কিছুই করার রয়েছে আমার। আমার পরিবারের ওপর জুলুমের প্রতিশোধ নেবার জন্য সব কিছু করব। যা জানি সবই বলে দেব।

নাতালিয়ার সাথে আলাপের পরে মনের অবস্থা যখন খুবই খারাপ তখন আমেরিকান সরকারের এক অফিসার আমাকে একদিন বললেন, 'ভিক্টর বেলেঙ্কোর সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'না তো, সে যখন তার মিগ-২৫ নিয়ে হোক্কাইডোতে নামে তখন আমি জাপানে ছিলাম।'

'তার সাথে দেখা করিয়ে দেব,' বলে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক। তার সাহায্যে আমার দেখা হলো ভিক্টরের সাথে।

প্রথম নজরেই ভাল লাগল ভিক্টরকে। চমৎকার ব্যক্তিত্ব—বুদ্ধিমান, হাসিখুশি, সাহসী এবং অদম্য। আমেরিকান জীবনের সাথে পুরোপুরি মিশে গেছে। তার সাথে মিশে বড় আনন্দ পেলাম। কয়েকদিন ঘুরলাম তাকে নিয়ে আমেরিকার নানা জায়গায়। দেখলাম জনজীবন, খামার, ফসল, আঙুর বাগান, ফুল-ফল, পশুসম্পদ। দু'চোখ জুড়িয়ে গেল।

কিন্তু নাতালিয়া আর ছেলের চিন্তা মন থেকে দূরে সরাতে পারলাম না। আরেকদিন রাত দুটায়, কেজিবির সক্রিয়তা যখন কম থাকে তখন আবার কল করলাম নাতালিয়াকে।

'অবস্থা একই রকম,' বলল সে। 'উন্নতির কোন লক্ষণ নেই।'

'আলেকজাণ্ডার ভাল তো?'

'না, স্তাস। মারামারি করার অজুহাতে তাকে বের করে দেয়া হয়েছে স্কুল থেকে। তার রক্তচাপ এখনও অত্যন্ত বেশি। পেটের অবস্থা খুবই খারাপ। দিনে দু'তিন বার বমি করে।'

'তুমি কেমন আছ, নাতাশা? তোমার খবর কি?'

অনেকক্ষণ জবাব দিল না সে। হয়তো ভাবছে কতটা বলবে।

'নাতাশা, কি হয়েছে তোমার?'

'ভাল আছি···হ্যাঁ, তাই মনে হয়···ওজন কিছু কমেছে।'

'কতটা কমেছে, নাতাশা? সত্য কথা বলো।'

'আমার ওজন নব্বুই পাউণ্ড, স্তাস!'

'হায় ঈশ্বর!' নাতাশার ওজন ১৩০ পাউণ্ড ছিল।

'আমাকে এখনও কোন ভাল চাকরি দেয়া হয়নি। কেজিবি সব সময় পিছনে ঘোরে। ক'দিন আগে একদল গুণ্ডার কবলে পড়ি। আমার ধারণা ওরা গুণ্ডা নয়; কেজিবির লোক।'

'নাতাশা, তোমাকে ওরা মেরেছে?'

'বেশি না। কয়েকটা ঘুসি দিয়েছে। পড়ে যাবার পর লাথি মেরেছে। আমার অবস্থা খুব সঙ্গিন। মরণ বুঝি ঘনিয়ে এসেছে। আমার আর কোন আশা নেই।'

ভিক্টরকে বললাম নাতাশার কথা। 'নাতাশার ব্যাপারে কেমন করে বড় ভুল করলাম? কিভাবে করলাম অমন বোকামি? কেমন করে ভাবলাম যে, কেজিবি'র মধ্যেও সামান্যতম মানবতাবোধ থাকতে পারে?'

'কেজিবি কি জিনিস তা তো তোমারই সবচেয়ে ভাল জানা থাকার কথা,' জবাব দিল সে। 'অন্য রকম ভাবলে বলতে হবে তুমি বোকার স্বর্গেই বাস করছিলে। ভাল করেই জানো যে, কেজিবি'র সাথে শান্তি স্থাপন করতে পারবে না। তোমার একমাত্র করণীয় হচ্ছে লড়াই।'

ঠিকই বলছে সে। তখনই শপথ নিলাম বাকি জীবন আমি লড়ব সোভিয়েত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, নাতালিয়া, আলেকজাণ্ডার এবং সকল সোভিয়েত নরনারীর মুক্তির জন্য। যতদিন লাগে লাগুক এবং যত কঠিনই হোক সে লড়াই।

স্টেট ডিপার্টমেন্টে গেলাম। কয়েকটি 'আমন্ত্রণ' ফরম পূরণ করলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নে যাদের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে তারা এগুলো পাঠাতে পারে। এগুলো পেলে আত্মীয়রা দেশত্যাগের ভিসার জন্য আবেদন পেশ করতে পারে। কিন্তু আমার 'আমন্ত্রণ'গুলোর কি হলো তা জানা গেল না কারও কাছ থেকে।

সোভিয়েত দূতাবাসের প্রতিনিধিদের সাথে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৮০ সালের বসন্তে। এ যাবত আমি আমার প্রাথমিক সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম ঃ এমন কিছু বলব না যার ফলে জাপানে বা সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন ব্যক্তিবিশেষ বিপদে পড়ে। সোভিয়েতদের জানালাম যে, আমার পরিবারের প্রতি দুর্ব্যবহার বন্ধ হলে আমি ওই অবস্থান বজায় রাখব। স্ত্রী আর ছেলের জন্য দু'টি 'আমন্ত্রণপত্র' তুলে দিলাম ওদের হাতে। ওরা প্রতিশ্রুতি দিল যে, ওগুলো পৌঁছিয়ে দেবে। ওরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নাতালিয়া বা আলেকজাণ্ডার কেউই পায়নি ওই 'আমন্ত্রণপত্র'।

এরপর চেষ্টা করি নিজের ব্যক্তিগত চ্যানেলে 'আমন্ত্রণ' ফরম পাঠাতে। আমার বৌ ওগুলো ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সামনে পেশ করে। কর্তব্যরত অফিসার ওগুলো নিতে অস্বীকার করে পরিষ্কার বলে দেন, 'ম্যাডাম, সোভিয়েত

ইউনিয়ন ছেড়ে যাবার আশা ত্যাগ করুন।'

১৯৮০-৮১ সালে বৌ-ছেলের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল। ওদের কথায় জানতে পারি যে, আমার পরিবারের ওপর কেজিবি'র জুলুম বন্ধ হয়নি। আমার মনে হলো তারা আমাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, আমি কি ক্ষতি তাদের করতে পারি তা দেখতে চাচ্ছে। চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করি আমি। পরে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝতে পারি যে, হুল ঠিকই ফোটাতে পেরেছি।

১৯৮০ সালের শেষ দিকে একদিন টেলিফোনে আলাপকালে নাতালিয়া বলে, 'জানো, তোমার অনুপস্থিতিতে ওরা তোমার বিচারের প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'সেটা যে করবে তা বুঝতে পারছিলাম।'

'বিচার হবে সামরিক ট্রাইব্যুনালে,' বলল সে। 'আমার কাছে কয়েকজন এসেছে তোমার বিপক্ষে সাক্ষী দিতে, আমাকে রাজি করানোর জন্য।'

'শেষবার কবে এসেছিল? প্রত্যেকবারই কি দুর্ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে?' প্রশ্ন করলাম তাকে।

'তিনদিন আগে। হ্যাঁ, ওরা দুর্ব্যবহার করছে। আমি কর্নেলকে বলে দিয়েছি যে, আমাকে পীড়াপীড়ি করে লাভ নেই। তোমার বিরুদ্ধে খারাপ কিছু আমি বলতে পারি না। তোমাকে অভিযুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে!'

'নাতালিয়া,' বললাম অনুনয় করে, 'আমাকে ডাইভোর্স করো। সহযোগিতা কর কেজিবি'র সাথে। ওরা যা বলে তাই করো। তোমাদের ওপর যে জুলুম ওরা করছে তা সহ্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'না। ওটা আমি করতে পারব না,' জবাব দিল সে।

ওরা চাইল নাতালিয়া আর আমার ছেলেকে দিয়ে জোর করে একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিষোদগার করাতে। নাতালিয়া আবারও সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে।

এই হলো অবস্থা। কেজিবি আর সোভিয়েতরা আমার স্ত্রী-পুত্রকে জিম্মি করে রেখেছে আমাকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে যেতে বাধ্য করার জন্য।

১৯৮১ সালের গ্রীষ্মে সোভিয়েত কর্মকর্তাদের সাথে আমার তৃতীয় ও শেষ সাক্ষাৎকারটি অনুষ্ঠিত হয় স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেই আগের রুমটাতে। সোভিয়েত গ্রুপের প্রধান ছিলেন কেজিবি প্রতিগোয়েন্দা অফিসার ইয়েভগেনি পোনোমারিয়ভ। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবার আগেই বললাম, 'কারও কাছ থেকে আর কোন বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্য শুনতে আমি রাজি নই। আমার একটি লিখিত বিবৃতি আছে। ওটা পড়া হলেই মনে করব এ সাক্ষাৎকার শেষ।

বিবৃতিটি হচ্ছে এইঃ

সোভিয়েত নেতাদের প্রতিঃ সোভিয়েত সরকারকে আমি ঘৃণা করি। নৈতিকভাবে দুর্নীতিপরায়ণ এবং সম্প্রসারণবাদী সোভিয়েত ব্যবস্থাকেও আমি ঘৃণা করি। একটা নির্দোষ শিশু আমার ছেলে, আর আমার স্ত্রীর প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে তার জন্য সোভিয়েত সরকার ও নেতাদের আমি ধিক্কার দিচ্ছি। এ মুহূর্ত থেকে সোভিয়েত সরকার ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। সোভিয়েত ব্যবস্থা, তার নেতৃত্ব ও কেজিবি'র বিরুদ্ধে এটা আমার আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিগত যুদ্ধ ঘোষণা।

পোনোমারিয়ভের মূর্ছা যাবার মত অবস্থা হলো আমার বিবৃতি শুনে। তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে গেল টমেটোর মত। চেঁচিয়ে উঠে তিনি বললেন, 'লেভচেঙ্কোর দেশদ্রোহিতার ঘোষণা শুনতে আমি আসিনি এখানে…'

তাঁর চিৎকার শেষ হবার আগেই রুম থেকে বেরিয়ে যাই আমি।

জানি, যা বলে এলাম তা পুরোপুরি সত্য। আমি পৌঁছে গেছি যাত্রার শেষ মঞ্জিলে। জাতি যেমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তেমনি আমিও করেছি। আমি এক প্রকৃত যুদ্ধে রত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য পাল্টা আঘাত হানে। আমার জাপান ত্যাগের তিন বছর পরে এক সামরিক ট্রাইব্যুনাল আমার বিচার করে। রায়? মৃত্যুদণ্ড।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
১৯৮০'র দশক

কেজিবি আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত যুদ্ধ ঘোষণার পরেও আমার মানসিক বিপর্যয় শেষ হয়নি। আমার সবচেয়ে প্রিয় দু'জনের ভাগ্যে কি ঘটছে সে দুশ্চিন্তায় আমি সর্বক্ষণ অস্থির। জানি না নাতালিয়া আর আলেকজাণ্ডারকে তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে বাধ্য করার জন্য কেজিবি কখন কি করে বসে। ওদেরকে কোন খবর পাঠানো বা ওদের কাছ থেকে কোন খবর পাওয়াও প্রায় অসম্ভব। ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করলাম যে, জন্মভূমির সাথে আমার যে নাড়ির বন্ধন ছিল তা চট করে কাটা হয়নি এবং বাঁধাও হয়নি

নিরাপদভাবে। পক্ষান্তরে, ক্ষতমুখটা কাঁচা রয়ে গেছে এবং তা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ভিক্টর বেলেঙ্কোকে বললাম আমার সার্বক্ষণিক যন্ত্রণা আর উদ্বেগের কথা।

'জানি,' বলল সে। 'পশ্চিমীদের ভাষায়, ওভাবেই পিটিয়ে তোমাকে ওরা কোর‍্যালে ঢোকাতে চায়।'

'তোমার এবং তোমার পরিবারের সাথেও কি এরকম করেছে?' জানতে চাইলাম।

'নিশ্চয়ই করেছে। এটাই ওদের কায়দা।'

'কিভাবে সামলে উঠেছ?'

'সামলে উঠিনি, স্তান, সামলে ওঠা যায় না। সইতে হয়। যেমন করে লোকে দাঁতের ব্যথা সয়।'

ভিক্টর বেলেঙ্কো আর আমার মধ্যে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য রয়েছে। সে হোক্কাইডোতে অবতরণ করার পরে কেজিবি অফিসার হিসাবে যে ভূমিকা পালন করেছি তার জন্য আমি গর্বিত নই। যে প্লেনটি সে নিয়ে এসেছিল, মিগ-২৫ ইন্টারসেপটার, ওতে দু'টি অতি গোপনীয় ইলেকট্রনিক যন্ত্র ছিল। টোকিও রেসিডেন্সি বিমানটি সম্পর্কে প্রথম বার্তা পায় মস্কো থেকে। মস্কো আমাদের কাছে জানতে চাইল বেলেঙ্কো ওই যন্ত্র দু'টি বিনষ্ট করার বোতামটি টিপেছে কিনা। মস্কো তখন উত্তেজনায় দিশাহারা। রেসিডেন্সির অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। আমরা জানালাম যে, ওগুলো অক্ষত আছে এবং আমেরিকানদের একদল ইলেকট্রনিকস বিশেষজ্ঞ ওগুলো পরীক্ষা করে দেখছে। কি করবে ভেবে পেল না মস্কো। রেসিডেন্সিরও নিজেদের মাথার চুল নিজেরা ছেঁড়ার মত অবস্থা। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে একজন বিশেষ ক্যুরিয়ার এসে নামল মস্কো থেকে। সঙ্গে নিয়ে এল কেজিবি'র তৈরি করা বেলেঙ্কোর স্ত্রীর একটা চিঠি। চিঠিতে বেলেঙ্কোকে অনুরোধ করা হয়েছে সে যেন ফিরে গিয়ে তার পরিবারকে উদ্ধার করে। বেলেঙ্কোর ক্রন্দনরত স্ত্রী আর তিন বছরের বাচ্চার ছবিও আছে চিঠির সঙ্গে। ছবির নিচে ক্যাপশনঃ দেশত্যাগী বেলেঙ্কোর শোকার্ত স্ত্রী ও বাচ্চা ছেলে। লাইন পিআর-এর রোমান সেবাস্তিয়ানভ আমাকে চিঠি ও ফটো দেন পশ্চিমী সংবাদপত্রে ছাপবার জন্য। 'কিভাবে ছাপাবে জানি না, তবে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমী পত্র-পত্রিকায় এ ছবি দেখতে চাই।'

হ্যাঁ, কাজটা আমারই ছিল বৈকি। একেই বলে 'অ্যাকটিভ মেঝার'—খবর ছাপানো, মিথ্যা তথ্য ছড়ানো, জাল দলিলপত্র প্রচার করা, প্রয়োজন হলে নাশকতামূলক কাজ করা এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ—জনমত তৈরি

করা বা ঘুরিয়ে দেয়া। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাথে যুক্ত এক তরুণ আমেরিকানকে ডাকলাম। জানতাম যে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একজন নিয়মিত স্টাফ মেম্বর হবার জন্য সবকিছুই সে করবে। এক কফি শপে তার সাথে দেখা করে চিঠিটা অনুবাদ করে দিলাম এবং ফটোও দেখালাম।

'এসব তো রদ্দি মাল,' বলল সে ভেবেচিন্তে।

'তা ঠিক,' বললাম তার কথায় সায় দিয়ে। 'কিন্তু এ রদ্দি মালটার খবর আর কেউ জানে না।'

পরদিন জাপান আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাগজগুলোতে ফটোসহ ওই জাল চিঠিটার কয়েকটি উদ্ধৃতিযুক্ত একটি এপি রিপোর্ট ছাপা হয়ে গেল। সন্দেহ নেই, খবরটি পড়ে অনেক পাঠকই বেলেঙ্কোর দুঃখী বৌ আর ছেলেটির জন্য সমবেদনা অনুভব করেছে। কিন্তু এপি'র রিপোর্টে ওদের দুঃখের যে চিত্র ফুটে উঠেছিল বাস্তবে তা ছিল অন্য রকম।

'আমার বৌ পুরোপুরি ঘৃণা করত আমার সামরিক চাকরিকে,' বলল বেলেঙ্কো। 'আমার বিমান চালনাকে ঘৃণা ও অপছন্দ করত সে। প্রতিবারই কোন ফ্লাইং মিশনে যাবার আগে ঝগড়া বাধিয়ে দিত সে। জাপানে এসে নামার অল্প ক'দিন আগেই একটা লম্বা মিশন থেকে ফিরে এসেছিলাম। সে আমাকে বলে যে, বিমানে উড়াই যখন আমার এত প্রিয়, বৌ-ছেলেকে উপেক্ষা করতে যখন আমার বাধে না, তখন আমি যেন তাই করি। সে শোধ নেবে এ অবহেলার। সত্যিই তাই করে বসে সে। বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে যায় তার মা-বাপের কাছে, আমার কর্মস্থল থেকে হাজার মাইল দূরে। আমি আর তাকে দেখিনি।'

ওয়াশিংটনে প্রথম দু'বছর অবস্থানকালে নাতালিয়ার কাছে কয়েকবার ফোন করতে পেরেছিলাম। প্রতিবার আলাপে তার আর আলেকজাণ্ডারের ওপর দিয়ে যা যাচ্ছে সেসব শুনে দারুণ আঘাত পেয়েছি মনে। সর্বশেষ আলাপের সময় নাতালিয়া বলেছে, 'স্তাস, তোমার বিচার হয়ে গেছে, জানো? যেমন ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। বিচার হয়েছে মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে এবং গোপনে।'

'কখন হলো?'

'১৯৮২ সালের আগস্টের শেষ দিকে। তুমি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবার পরে প্রায় তিনটি বছর ওরা অপেক্ষা করল কেন কে জানে!'

'আমিও জানি না নাতাশা। জানি না। হয়তো আমার বিরুদ্ধে খারাপ কোন তথ্য খুঁজে পাচ্ছিল না তাই।' হাসলাম নিজের রসিকতায়। তিনটা বছর ওদের লেগে গেল তথ্য প্রমাণ জোগাড় করতে? ওদের সত্যি কষ্ট হয়েছে। সোভিয়েত

ইউনিয়নে থাকার সময় আমি কখনও কাজে অবহেলা করেছি এমন কোন প্রমাণ ওরা বের করতে পারেনি। একমাত্র অভিযোগ ওরা যা আনতে পেরেছে সেটা হলো এই যে, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছি।

'রায় কি দিয়েছে, নাতাশা?'

'তুমি জানো, স্তাস। কি রায় ওরা দিতে পারত, বলো? ওরা তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছ বলে?'

সে অবশ্য সত্যিই বলেছে। এ ছাড়া আর কি রায়ই বা ওদের দেবার ছিল? ওরা সোজা-সরল রায়ই দিয়েছে। মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আমাকে পাবে কেমন করে? রায় কার্যকর করার জন্য প্রথমে তো ধরতে হবে আমাকে।'

না, ভয় পাইনি এ রায়ের কথা শুনে। বরং এ রায়ের কথা শুনে আমি আরও সক্রিয় হলাম। সোভিয়েত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমার সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করলাম। সোভিয়েত পলিট ব্যুরো আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ায় গর্ববোধও করলাম। কারণ এতে প্রমাণ হলো যে, ওদের চোখে আমি একজন বিপজ্জনক শত্রু।

১৯৮২ সালে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ হঠাৎ বিদেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সরাসরি টেলিফোন করার ব্যবস্থা বাতিল করে দেয় এবং বাইরের প্রতিটি ফোন কল অপারেটরের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করে। এর পরে যতবারই কল করেছি নাতালিয়াকে, অপারেটর সংযোগ দিতে অস্বীকার করেছে। পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম পরিবার থেকে। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমেরিকায় আনার সকল আশা ছাড়তে বাধ্য হলাম।

১৯৮৩ সালে আমি আমন্ত্রিত হলাম আমেরিকান হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এর ইনটেলিজেন্স কমিটির সামনে উপস্থিত হবার জন্য। আনন্দের সাথে গ্রহণ করলাম আমন্ত্রণটা। উচ্চপদস্থ সিআইএ কর্মকর্তা পোর্টম্যান কংগ্রেস সদস্যদের কাছে আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বললেনঃ

'তিনি (মি. লেভচেঙ্কো) আমাদেরকে যেসব তথ্য দিয়েছেন সেগুলো বিভিন্ন উপায়ে যাচাই করা হয়েছে। আমরা সন্তুষ্ট যে তিনি সত্য কথাই বলেছেন। আমরা কেবল তাঁর সত্যবাদিতার জন্যই সন্তুষ্ট নই। আমরা তাঁর কাছে এ জন্যও গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যে, তাঁর প্রদত্ত তথ্যগুলোর সম্ভাবনা ও ব্যাপ্তি অনেক। তাঁর প্রদত্ত তথ্যগুলো সোভিয়েতদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। এ অবস্থায় তিনি সোভিয়েত বা কেজিবি'র হাতে পড়বেন এটা কল্পনাও করা যায় না।'

কমিটির সাথে ১৩ ও ১৪ জুলাই আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁরা সোভিয়েত

অ্যাকটিভ মেঝার সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আমি তো ওই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। কংগ্রেস সদস্য ও হাউস ইনটেলিজেন্স কমিটির সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুশি হলাম। তাঁদের প্রশ্নেরও জবাব দিলাম আগ্রহের সাথে।

দু'দিন ধরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুনানি চলে।

কমিটির সামনে সাক্ষ্যদানের মাস দুই পরে আমি প্রকাশ্যে বের হলাম। রিডার্স ডাইজেস্ট প্রেসকে কথা দিয়েছিলাম জন ব্যারনের বই 'কেজিবি টুডেঃ দি হিডেন হ্যাণ্ড' সমাপ্ত হবার আগে আমার জীবন কাহিনী নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলব না। ব্যারন রিডার্স ডাইজেস্ট-এর একজন সিনিয়র এডিটর এবং কেজিবি বিষয়ে বিশ্বের একজন অগ্রণী বিশেষজ্ঞ। জাপানে থাকতে তাঁর 'কেজিবিঃ দি সিক্রেট ওয়ার্ক অব সোভিয়েত এজেন্টস' পড়েছিলাম। বইয়ের মলাটের লেখা দেখে জেনেছিলাম যে, ব্যারন ওয়াশিংটন এলাকায় থাকেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছার এক মাস পরে ডাইজেস্টের ওয়াশিংটন ব্যুরোতে টেলিফোন করে তাঁর সাথে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করি। সাথে সাথে টেলিফোন ধরে তিনি বিস্মিত করে দেন আমাকে। নিজের পরিচয় দিয়ে বলি, 'মি. ব্যারন, আপনার বই পড়েছি। আপনাকে শুধু বলতে চাই যে, বইটি চমৎকার হয়েছে। কেজিবি'র ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনার যে সুনাম রয়েছে আপনি তাঁর যোগ্য।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বলেন তিনি। 'আপনার যা ইতিহাস তাতে এটাকে আমি উচ্চ প্রশংসা হিসাবেই গ্রহণ করছি।'

'মি. ব্যারন, বুঝতে পারি যে, আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, তবু বলছি আমার অতীত জানে এমন কারও সাথে আলাপের বড় প্রয়োজন আমার।'

'বাড়াবাড়ি কিসের? আপনি এখনি, সম্ভব হলে আজ রাতেই চলে আসুন,' বলেন উৎসাহভরে।

একটা দিন ঠিক করলাম তাঁর ভার্জিনিয়া শহরতলীর বাড়িতে যাবার এবং ১৯৭৯ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে এক বৃষ্টিঝরা রাতে চলে গেলাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। প্রথমে তাঁকে মনে হয় একটু সতর্ক। ক্রমে জানাজানি হয় পরস্পর এবং বন্ধু হয়ে যাই আমরা। সে রাতে কেবল গল্পগুজব আর গান শোনা হলো। রাত একটা কি দু'টায় ফিরলাম সন্তুষ্ট মনে।

কোন কাজের কথা হয়নি আমাদের মধ্যে। তিনি শুধু বলেন যে, কেজিবি'র বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম সম্পর্কে আরেকটি নতুন বই লেখা প্রয়োজন। 'আপনার ভিতর থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা' কাজে লাগাতে হবে, বলেন জন। আমি যে

কোন সাহায্য দিতে রাজি হই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তথ্যাদি প্রদানের কাজ শেষ হবার পর জন আর আমি নতুন বই-এর কাজ শুরু করার জন্য আগ্রহী হলাম। সময় ক্ষেপণ না করে তিনি বললেন যে, অবিলম্বে একটা নিরালা জায়গা খুঁজে নেয়া দরকার যেখানে কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করবে না। জন প্রস্তাব দিলেন, 'চলুন হাওয়াই চলে যাই। আমার জানা একটা হোটেল আছে। সেখানে জমিয়ে বসে কাজ করা যাবে।' হাওয়াই দ্বীপের কথা শুনেছিলাম। প্রামাণ্য চিত্রে ছবিও দেখেছিলাম। কিন্তু চোখে দেখা হয়নি কোনদিন। এককথায় রাজি হয়ে গেলাম।

১৯৮০ সালের মে মাসে পৌঁছলাম হাওয়াইর অন্যতম সুন্দর দ্বীপ মাউইতে। হোটেলটাও জন যেমন বলেছিলেন তেমনি ভাল। এক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় হোটেলটা। সামনে প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল বিস্তার। লেখাপড়ার উপযুক্ত স্থান। সেই অনুপম সৌন্দর্যময় পরিবেশে শুরু হলো আমাদের কাজ।

জন আর আমার মিলিত পরিশ্রমে শুরু হলো লেখা। প্রায় তিন বছর কঠোর পরিশ্রমে বইটা শেষ করল জন ব্যারন। 'কেজিবি টুডে-দি হিডেন হ্যাণ্ড' নামে ওটা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। পরে ওটা জাপানীসহ অন্য অনেক ভাষায় প্রকাশিত হয়।

বইটা বাজারে ওঠার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম। ওতে বিশ্বব্যাপী কেজিবির তৎপরতা সম্পর্কে যে সব তথ্য ও বিবরণ রয়েছে তা পড়ে দুনিয়াবাসী থ' খেয়ে যাবে বলে আশা করেছি। কার্যত হয়েছেও তাই। বিশেষত, জাপানে তো প্রায় শোরগোল পড়ে যায়। এতে খুশি হই আমি। কারণ, আমি জাপানী জনগণকে বোঝাতে চেয়েছি যে, জাপানের ওপর সোভিয়েত হুমকি অত্যন্ত বাস্তব ও বিপজ্জনক। এটা বোঝাতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকজন জাপানী সোভিয়েত এজেন্টের নাম আমি প্রকাশ করি। জাপানী পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশনে আমার বই এবং প্রকাশিত তথ্যাদি বেশ প্রচার লাভ করে। তবে বিরূপ সমালোচনাও কিছু হয়। কোন কোন পত্রিকা এবং সাংবাদিকদের কেউ কেউ আমার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার জন্য জোর চেষ্টা চালায়। ওদের সবেচেয়ে কুৎসিত রটনা ছিল এই যে, জন ব্যারন ও আমার মধ্যে সমকামী সম্পর্ক ছিল এবং বইটি লেখার সময় আমরা লিভ টুগেদার করেছি। কৌশলটা আমার জানা। কেজিবিতে কাজ করার সময় জনমত ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য এ ধরনের মিথ্যা প্রচারে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম।

কিছু কিছু জাপানী সাংবাদিকের স্বীকার করার সাহস নেই যে, সোভিয়েতের প্রতি জাপানের মনোভাব দুর্বল এবং দাসসুলভ। ফলে ওরা

আমাকে বলির পাঁঠা বানায়। আমার কার্যকলাপের নিন্দা করে ওরা নিজেদের ক্রোধ আর অক্ষমতার জ্বালা মেটায়। এসব প্রতিক্রিয়া অপ্রত্যাশিত ছিল না। আমি জানতাম যে, ঠিক কাজই করছি। চিন্তাশীল জাপানী মাত্রই আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত আমার ধারণাই সত্য প্রমাণিত হয়। বইটাতে যা যা বলেছি তার প্রশংসা করেছেন জাপানী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এটা জেনে প্রীত হই আমি। জাপান মন্ত্রীসভার তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারি মাসাহারু গোতোহদা বলেছিলেন, 'সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।' তখনকার জাতীয় পুলিশ এজেন্সির জন নিরাপত্তা প্রধান আকিরা ইয়ামাদা বলেছিলেন, 'মি. লেভচেঙ্কোর বিবৃতিগুলো পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য।'

আমি যা ফাঁস করে দিয়েছি তার ফলে কেজিবি রেসিডেন্সি তার গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের একটা বড় অংশ হারায়। নতুন এজেন্ট রিক্রুট করে তা পুনর্নির্মাণ করতে তাদের অনেকদিন লেগে যাবার কথা। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, জাপানী জনগণ এখন সোভিয়েত গোয়েন্দা কার্যক্রমের পদ্ধতি এবং জাপানে তাদের রণ কৌশলগত লক্ষ সম্পর্কে অনেক বেশি অবহিত হয়েছে। জাপানে নতুন এজেন্ট পাওয়া অনেক বেশি কঠিন হবে তাদের জন্য। জাপানকে হুঁশিয়ার করার, বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পেরেছি জেনে আমি গর্বিত।

জাপানের কথা ভুলতে পারি না। জাপানের হ্রদ, পাহাড়, পার্ক, উদ্যান সবই মনে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে আমার ঘরের দেয়ালগুলো উতামারো আর হিরোশিগের চিত্রাবলীতে ঢাকা। সুন্দর কুতানি-ইয়াকি টি-পট এর জাপানী গ্রীন টি পান করি। সম্প্রতি জাপান ফেরত এক বন্ধুর দেয়া জাপানী কাপে। আমার উন্নতমানের প্যানাসোনিক রেডিওতে জাপানী স্টেশন ধরি, জাপানী গান শুনি। জাপানী কথ্যভাষা যাতে ভুলে না যাই সেজন্য প্রতিদিন অনুশীলন করি। অথচ আমি মিশে গেছি আমেরিকান জীবনের সঙ্গে। আট বছর হয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্রে আছি। আমেরিকা তার দত্তক সন্তানদের আশ্রয় দেয় নিজের উষ্ণ বুকে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, অংশত আমার তৎপরতার ফলে সকল মহাদেশের লোক ক্রমে অধিকতর সংখ্যায় সচেতন হচ্ছে বিশ্বব্যাপী কেজিবি পরিচালিত গোয়েন্দা কার্যক্রম সম্পর্কে। অতীতকে পেশারূপে ব্যবহারের কিংবা খ্যাতি লাভের ব্যাপারে আগ্রহী নই আমি। আমার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা যে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে তা আমার অগোচরে নেই। আমি এখন একজন গবেষক। দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সোভিয়েতের সম্পর্ক বিষয়ে একজন বিশ্লেষক। এ কাজে আমি আনন্দ পাই। এখনও আগের মতই

কাজপাগল রয়ে গেছি।

কেজিবি'র খুনীদের হাতে যে একদিন মারা পড়তে পারি সে সম্ভাবনাটাকে মনেই স্থান দিই না বললে মিথ্যা বলা হবে। নিজেদের কাজে ওরা দক্ষ। খুনের কোন চিহ্নই ওরা রেখে যায় না। কাজেই, কোন রহস্যজনক রোগে আমি হঠাৎ মারা গেলে কিংবা আমার মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে মনে হলে দয়া করে জানবেন যে কেজিবি শেষ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে পেয়েছে। কেজিবি'র নিয়ম অনুযায়ী দলত্যাগীকে দশ বছর পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে খোঁজা হয়। আট বছর বেঁচে আছি। আমেরিকান গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এখানে আমি অন্য যে কোন দেশ থেকে নিরাপদে আছি।

কেজিবি'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে যারা বিদেশে পালাতে সক্ষম হয়েছে তাদের ওপর নির্মম প্রতিশোধ নেয়া। একজন নাগরিকের দেশত্যাগকে সোভিয়েতরা বড় ধরনের অপমান মনে করে। ওরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করে লোকটার ওপর প্রতিশোধ নিতে।

সোভিয়েত পলিটব্যুরোর নির্দেশে কেজিবি প্রথমে চেষ্টা করে লোকটার অবস্থান খুঁজে বের করতে, পরে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে দিতে। যে সব ভিন্ন মতাবলম্বী মস্কোর হুমকি ও হয়রানিকে গ্রাহ্য করে না, কিংবা প্রকাশ্যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখ খোলে তাদের কেজিবি শেষ পর্যন্ত খুন করে। আমার কার্যকলাপের জন্য আমি নিশ্চয়ই একজন টার্গেট।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যারা ছেড়ে এসেছে তাদের জীবনের ওপর হুমকি সৃষ্টি এবং তাদের ফেলে আসা পরিবার-পরিজনের ওপর নির্যাতন চালিয়ে কেজিবি চায় তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে, তাদের আতঙ্কের মধ্যে রাখতে, নীরবে লুকিয়ে থাকার জন্য বাধ্য করতে। ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যার হুমকি দিয়ে, বিশেষ করে যারা একদিন কেজিবি অফিসার ছিল তাদের। কেজিবি চায় যারা এখনও কেজিবিতে রয়েছে তাদের দেশত্যাগ বা দলত্যাগের প্রলোভন থেকে দূরে রাখতে। একজন দলত্যাগীকে হত্যা করার অর্থ হচ্ছে এটা বলা, দেখলে তো? ও রকম করতে গেলে তোমার অবস্থা কি হবে?

সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগ করে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছে তাদের সংখ্যার দিকে তাকালে সহজে দেখা যায় যে, যারা পালায় তাদের সবাইকে হত্যা করা হয় না। আর কেজিবির খুনীরা সকল দেশে অবাধে তৎপরতা চালাতে পারে না। তাছাড়া, ভাগ্যক্রমে যারা দেশত্যাগ করেছে তাদের অনেকেই সাহসী লোক। হুমকি-ধমকিতে টলবার মত নয়। দেশত্যাগের পরিণাম কি হতে পারে তারা জানত এবং সব রকম বিপদে ঝুঁকি নিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবু

কেজিবি প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় সদা তৎপর। তাদের হত্যা ও হত্যা প্রচেষ্টার কিছু কিছু কাহিনী মুক্তবিশ্বে বিশেষ প্রচার লাভ করেছে।

পশ্চিম জার্মানিতে বসবাসকারী রুশ দেশত্যাগীদের সোভিয়েত বিরোধী সংগঠনের একজন সক্রিয় নেতা জর্জি ওকলোভিখ। ১৯৫৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি কেজিবি অফিসার ক্যাপটেন নিকোলাই হোকলভ তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে বললেন, 'মি. ওকলোভিখ আছেন?'

'হ্যাঁ আমিই ওকলোভিখ,' বললেন অ্যাপার্টমেন্টের মালিক।

'আমি কেজিবির ক্যাপটেন নিকোলাই হোকলভ।' সোভিয়েত ইউনিয়নের পলিটব্যুরো আপনাকে হত্যার আদেশ দিয়েছে। হত্যার দায়িত্বটা দিয়েছে আমার গ্রুপের ওপর। আমরা তিনজন, আমি নিজে আর অন্য দু'জন অবৈধভাবে জার্মানিতে প্রবেশ করেছি। ভিতরে আসব?'

'হা, ঈশ্বর!'

'না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না,' বললেন ক্যাপটেন হোকলভ। 'খুন আমি করতে পারি না। তবে ওরা কি করতে চায় আপনার ব্যাপারে, তা আপনার জানা দরকার। আর আমার নিজের কথা হচ্ছে, আমার ঘেন্না ধরে গেছে গোটা সোভিয়েত ব্যবস্থাটার ওপর। আমি বেরিয়ে আসতে চাই। পশ্চিম জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করব।' বন্ধু হয়ে গেলেন দু'জন। হোকলভ সক্রিয়ভাবে অংশ নিলেন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তৎপর সংগঠনটির কাজে। এ প্রাক্তন কেজিবি অফিসারটি বহু প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা করেন। মুক্তবিশ্বের বিরুদ্ধে কেজিবির অপরাধমূলক কার্যকলাপের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। সোভিয়েত নেতারা যে হোকলভকে হত্যার নির্দেশ দেন অল্পদিন পরেই, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

১৯৫৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর হোকলভ ফ্রাঙ্কফুর্টে রুশ দেশত্যাগীদের এক সম্মেলনে যোগ দেন। বিরতিকালে এক কাপ কফি খেয়েই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে যান তিনি। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তাঁর অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে, ডাক্তাররা মনে করেন বাঁচার কোন আশাই নেই। মুখ ফুলে গিয়েছিল। গায়ের চামড়ায় ফুটে উঠেছিল কালো আর নীল দাগ। তাঁর চুল ঝরে যায়। শেষ পর্যন্ত যে আমেরিকান ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন তাঁরা বলেন যে, হোকলভকে থালিয়াম বিষ খাওয়ানো হয়েছে। থালিয়াম একটি বিরল ধাতব বিষ। ওতে তীব্র আনবিক তেজস্ক্রিয়তা ছিল।

চিকিৎসকদের দক্ষতা এবং হোকলভের বাঁচার দৃঢ় ইচ্ছার জোরে বেঁচে যান ক্যাপটেন হোকলভ। বহু মাস ধরে বিশ্রামের পর তিনি আবার সোভিয়েত

বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিতে সক্ষম হন। কেজিবি'র হত্যা প্রচেষ্টা দমাতে পারেনি হোকলভকে। সেই ঘটনার পরে তিনি সরে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বর্তমানে একটা প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক। এখনও তিনি অত্যন্ত তৎপর এবং জনসভায় বক্তৃতা দিতে দ্বিধা করেন না। আমি তাঁর একজন গুণগ্রাহী। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারলে, কোথাও কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে পারলে খুশি হতাম। হোকলভ আমার চোখে একজন বীর। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারলে গৌরবই বোধ করতাম।

আরেকটি বিখ্যাত ঘটনা ঘটে লণ্ডনে, ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে। একজন নামজাদা বুলগেরীয় লেখক, জর্জি মার্কভ, গ্রেট ব্রিটেনে আশ্রয় নেন ১৯৬৯ সালে। ১৯৭৮ সাল নাগাদ তিনি ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানিতে (বিবিসি) একজন নিয়মিত লেখকে পরিণত হন। মার্কভ রেডিও ফ্রি ইউরোপেও কাজ করতেন। ওয়াটার্লু ব্রিজের কাছে নিয়মিত গাড়ি পার্ক করে তিনি হেঁটে যেতেন বিবিসি অফিসের দিকে। ১৯৭৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর গাড়ি পার্ক করে তাই করতে যাচ্ছিলেন তিনি। একটা ব্যস্ত চৌরাস্তা পার হয়ে চলে যান কোণের বাস স্টপের কাছে। সেখানে এক পথচারী ধাক্কা খায় তাঁর সঙ্গে এবং তার ভাঁজ করা ছাতার সূতীক্ষ্ণ আগাটি দিয়ে খোঁচা লাগায় মার্কভের উরুতে। এতে সামান্য ছড়ে যায় উরুর চামড়া। বিড়বিড় করে 'সরি' বলে লোকটা মিশে যায় ভিড়ের মধ্যে।

ঘণ্টা দুই পরে মার্কভ বলেন, তাঁর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জ্বর জ্বর লাগছে। এর পর ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁর বেশি বেশি খারাপ লাগতে থাকে। পরদিন তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং দু'দিন পরে মারা যান।

লণ্ডনের অপরাধ তদন্ত বিভাগের সদর দফতর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড মার্কভের মৃত্যুর ব্যাপারে একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চালায়। তারা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলে যে, বুলগেরীয় লেখকটিকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের সন্দেহ, কাজটা করেছে কোন সোভিয়েত এজেন্ট। মার্কভের উরু থেকে ময়না তদন্তকালে একটা সূক্ষ্ম ধাতব পাত উদ্ধার করা হয়। গোপন প্রতিরক্ষা বায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধরা পড়ে যে, ওটার মধ্যে রিচিন নামের এক ভয়ঙ্কর বিষ ছিল সায়ানাইডের চেয়েও মারাত্মক। ওটার কোন প্রতিষেধক নেই।

মার্কভ ইউরোপের সবচেয়ে মুখর দেশত্যাগী হয়ে পড়েছিলেন। সেজন্যই হত্যা করা হয় তাঁকে। তাঁর বুলগেরীয় ভাষায় প্রচারিত ভাষ্যে তিনি বুলগেরীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করতেন এবং বুলগেরীয় নেতাদের দুর্নীতির কথা ফাঁস করে দিতেন রেডিও ফ্রি ইউরোপের শ্রোতাদের কাছে। তাঁর ব্রডকাস্টগুলো

শুনে খেপে যান বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট তোদব ঝিভকভ। ঝিভকভের ভয় ছিল ওগুলো শুনে ভিন্নমতাবলম্বী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠবে বুলগেরিয়ায়। মার্কভকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয় সোফিয়া থেকে। ছাতার মধ্যে লুকানো একটি বিশেষ ধরনের শব্দহীন বন্দুক থেকে ধাতব পাতটি নিক্ষিপ্ত হয় মার্কভের উরুর মধ্যে।

হত্যাটি যে কেজিবি অনুমোদিত ও নির্দেশিত এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ছাতা-বন্দুকের মত সূক্ষ্ম অস্ত্র তৈরির কাজে কেজিবি'র অতি গোপন গবেষণাগারগুলো যে সারাক্ষণ ব্যস্ত এ-ও জানা কথা। এ রকম অস্ত্র যে ওরা আরও কয়েকটা উদ্ভাবন করেছে তা-ও আজ গোপন নেই। এক বুলগেরীয় লেখকের হত্যার সাথে কেজিবিকে জড়ানোর জন্য এটা জানাই যথেষ্ট যে, বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিটি সোভিয়েতদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণাধীন। ওরা একত্রে, হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে এবং কেজিবি উদ্ভাবিত অস্ত্র দ্বারাই মার্কভকে হত্যা করা হয়েছে।

ছাতা-বন্দুক একমাত্র মার্কভ হত্যাকাণ্ডেই ব্যবহৃত হয়নি। মার্কভ হত্যার দশদিন পরে ভ্লাদিমির কোস্তভ নামক আরেকজন বুলগেরিয়ানও প্যারিসে প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতিতে আক্রান্ত হন। এক পাতাল রেলের প্ল্যাটফর্মে তিনি অপেক্ষা করছিলেন ট্রেনের জন্য। ছাতা-বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয় তাঁকে পিছন থেকে। তাঁর পিঠ থেকে প্লাটিনাম ইরিডিয়ামের একটা অতি ক্ষুদ্র গুঁটলি বের করা হয়। ওটাতে রিসিন-এর মাত্রা বেশি রকম ছিল না। ফলে বেঁচে যান তিনি।

আমি কোথায় আছি জানতে পারলে কেজিবি চেষ্টা করবে কোথায় কোথায় আমি যাই সেসব জায়গা চিহ্নিত করতে। তারপর ওরা বিশেষ খুনি দলকে লাগিয়ে দেবে হত্যার প্রস্তুতি গ্রহণে। ওদের পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের। অপহরণ ও আত্মহত্যা বলে ভ্রম হয় এমনভাবে হত্যা। 'বুলগেরীয় ছাতা' কিংবা যানবাহন দুর্ঘটনা। হত্যার উপায় উদ্ভাবনে কেজিবি'র বিশেষজ্ঞদের কল্পনাশক্তির সীমা-পরিসীমা নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওরা বোধহয় ওদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের হত্যার কাজে ব্যবহার করবে না। কারণ সেটা হবে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। নোংরা কাজটির জন্য ওরা হয়তো কোন আমেরিকান অপরাধীকে নিয়োগ করবে। আরও সম্ভব যে, ওরা মস্কোর নির্দেশ পালনের জন্য কিউবান নিরাপত্তা সার্ভিসকে (ডিজিআই) হুকুম দেবে। কারণ ডিজিআই-এর খরচ যোগায় কেজিবি এবং ওটাকে নিয়ন্ত্রণও করে কেজিবি। আমি জানি যে, বছর কয়েক আগে ফিদেল ক্যাস্ট্রো আর প্রেসিডেন্ট কার্টারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী যে হাজার কয়েক কিউবানকে মায়ামিতে পাঠানো হয় তাদের মধ্যে ডিজিআই-এর

এজেন্টরাও ছিল। বিপুল সংখ্যক লাতিন আমেরিকানদের মধ্যে লুকিয়ে থেকে হাভানার আদেশের জন্য অপেক্ষা করা কত সহজ তাদের পক্ষে।

আমি অবশ্য খুনিদের জন্য সহজলভ্য টার্গেট নই। কয়েক বছর কাটিয়েছি ভিন্ন নামের আড়ালে। কোথায় থাকি তা খুঁজে বের করা সহজ নয় কারও পক্ষে। ঘন ঘন স্থান বদলাই। কেউ পিছনে লেগেছে কি-না তা টের পাবার এবং রাস্তা পরিষ্কার করার ক্ষমতা আমার আগের মতই আছে। মোটামুটি রক্ষা ব্যবস্থা আমার রয়েছে এবং জীবনের ওপর হুমকি সম্পর্কে অতিমাত্রায় চিন্তা করি না। পিছন ফিরে তাকাই না।

কেজিবি যে আমার সন্ধান করেছে কয়েকবার সেটা অবশ্য আমি জানি। ১৯৮৩ সালে ওরা আমার স্ত্রীর কয়েকটা চিঠি এমনভাবে ছেড়ে দেয় যাতে এগুলোর হদিস ওরা পায়। নিরাপত্তার কারণে আমি বলব না কিভাবে ওদের চালাকিটা ধরা পড়ে এবং তা ব্যর্থ করে দেয়া হয়। এটা বলাই যথেষ্ট যে, ওদের বিশদ পরিকল্পনাটা সফল হয়নি।

আমাকে খুঁজে বের করার জন্য ওদের পরবর্তী প্রচেষ্টাটা ছিল আরও নাটকীয়। ভাগ্য ভাল যে, ওটাও ব্যর্থ হয়। তবে আমার সন্দেহ নেই যে, কেজিবি আবারও চেষ্টা করবে। ওরা আমাকে খুন করতে চায়, আমি জানি। এদিকে জীবন আমার চলছে, মৃত্যুর চিন্তা আমি তেমন করি না আজকাল। কিন্তু আমার শ্রোতারা প্রায়ই এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে।

'আপনার ওপর মৃত্যুদণ্ড ঝুলছে এটা ভাবতে কেমন লাগে, মি. লেভচেঙ্কো?' বক্তৃতা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ ধরনের প্রশ্নই ছুড়ে মারা হয় আমার দিকে। শুনতে শুনতে একেক সময় বিরক্ত হয়ে যাই। বিরক্তিটা প্রকাশও করে ফেলি একদিন এক বান্ধবীর কাছে।

'একেক সময় মনে হয়, কোন কেজিবি এজেন্ট হঠাৎ এসে ওদের চোখের সামনে আমাকে হত্যা করছে এমন একটা দৃশ্য দেখলে এরা বেশ পুলকিত হবে।'

বান্ধবী বলল, 'স্তান, তোমার ধারণা পুরোপুরি ভুল। লোকে প্রশ্নটা করে এজন্য নয় যে, তারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে কিংবা তারা রক্তপিপাসু। তুমি বোঝ না যে, তাদের কাছে তুমি একজন সাহসী পুরুষ, যে জীবনের সর্বস্ব বাজি রেখেছে। তারা তোমার অনুভূতিটা জানতে চায়। জানতে চায় তোমার অনুভূতিটা তাদের মত সাধারণ মানুষের অনুভূতির মত কি-না।'

বান্ধবী ঠিকই বলেছে, আমার শ্রোতারা জানতে চায় আমি সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ, না-কি কোন অতিমানব।

*

সোভিয়েতরা টেলিফোন ব্যবস্থা বদলে ফেলার ফলে নাতালিয়া আর আলেকজাণ্ডারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর আমি ওদের সাথে যোগাযোগের একটা ব্যক্তিগত চ্যানেল খুঁজে বের করি। ১৯৮৪ সালে কেজিবি ওই চ্যানেলও প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছিল। শেষ দুই চিঠিতে নাতালিয়া আমাকে অনুরোধ করে যাতে প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত না হই। সে বলে যে, এতে তার এবং আলেকজাণ্ডারের ক্ষতি হয়। নাতালিয়া কেমন করে জানল যে, আমি প্রকাশ্যে সভায় বক্তৃতা করি? কেজিবি তাকে বলেছে? অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, কেজিবি তাকে বলে দিচ্ছে আমাকে কি লিখতে হবে। বুঝতে পারলাম যে, চিঠি লেখালেখি বন্ধ করতে হবে অবিলম্বে। শুধু নাতালিয়া আর আলেকজাণ্ডারের নিরাপত্তার জন্য নয়—তার চিঠি অনুসরণ করে আমার সন্ধান যাতে না পায় সেজন্যও।

কেজিবি ঘিরে রেখেছে নাতালিয়াকে। কেড়ে নিয়েছে আমাদের যথাসর্বস্ব। ওরা তাকে বাধ্য করেছে এমন কথা লিখতে যা সম্পূর্ণ ওর স্বভাববিরুদ্ধ। আমি আর ওকে জীবনে দেখব না। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ কখনও ওকে বাইরে আসতে দেবে না। আমার ছেলেকেও আর পাব না।

তিন বছর আগে আমার আলেকজাণ্ডার কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেজিবি'র নির্দেশে অধ্যক্ষ তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। এখন সে আছে সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে। সাইবেরিয়ার কোথাও মোতায়েন এক ইউনিটে। তাকে বের করে আনার কোন পথই নেই। এটা মেনে নিতেই হবে আমাকে।

হ্যাঁ, আমার কারণেই আজ আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ দু'টির এ অবস্থা। তবে ওই জারজদের জানিয়ে দিতে চাই যে, যত হুমকিই ওরা দিক, আমি টলব না। আমি সত্য প্রকাশ করে যাব। এছাড়া আর কোন পথ নেই আমার সামনে।

ওয়াশিংটন ডিসি
আশির দশক

মৃত্যুদণ্ড এখনও ঝুলে আছে মাথার ওপর। ব্যক্তিগত জীবনের সব কথা খুলে

বলতে পারি না। যাদেরকে ভালবাসি তাদেরকে রক্ষা করতেই হবে। তারা আমাকে ভালবাসে বলেই রক্ষা করতে হবে। আমার নতুন দেশ এবং দেশবাসীদের সম্পর্কে যা জেনেছি তা বলতে পারি, বলব, আরও বলব আমার প্রকাশ্য জীবনের কথা।

আমেরিকানরা আচার-ব্যবহার আর পোশাক-আশাকের ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা নিয়মরীতি মানে না। ভিড়ের মধ্যে চেনা মুশকিল কে কোটিপতি, আর কে সোস্যাল সিকিউরিটির ভাতায় চলে। কারণ, উভয়ের পোশাক একই ধরনের। আমেরিকা যেন এক বিশাল দ্রবণ পাত্র। দুনিয়ার নানা দেশ থেকে তাদের পরিবার এখানে এসে দ্রবীভূত হয়ে মিশে গেছে পরস্পরের সাথে। এজন্য গর্ববোধ করে তারা। তারা খোলামেলা, আমুদে, স্পষ্টভাষী এবং অতিথিবৎসল। কবি ফিলিপ বেইলীর ভাষায় আমেরিকা হচ্ছে দুনিয়ার সত্যিকারের সৎ-ভাই। দুনিয়ার সকল দেশের ভাল-মন্দের কিছুটা মিশে আছে আমেরিকার মধ্যে। আমেরিকায় পদার্পণের প্রথম মুহূর্তেই আমাকে বলে দেয়া হয় যে আমেরিকার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবার , ইচ্ছামত কাজ বেছে নেয়ার অধিকার আমার আছে। সকল আমেরিকান যে সব অধিকার ভোগ করে আমিও তা ভোগ করতে পারব। একজন আমেরিকান হিসাবে গৃহীত হওয়াতে আনন্দে অভিভূত হলাম।

সরকারকে তথ্যাদি প্রদানের পরে প্রথম দু'বছর কাজ করি রিডার্স ডাইজেস্টের জন্য। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভাবতে লাগলাম যে, বৃহত্তর আমেরিকান জনজীবনের সাথে মিশে যাবার সময় হয়েছে। আরেকটা কাজ এবং বাসস্থান খুঁজতে লাগলাম। আমার জন্য এ অভিজ্ঞতাটা নতুন এবং কিছুটা ভীতিজনক। জীবনে এই প্রথমবার এমন একটা কাজ খোঁজার সুযোগ পেলাম যা করে আনন্দ পাব। হঠাৎ বড় অসহায় মনে হলো নিজেকে। গোটা জীবন আমাকে বলে দেয়া হয়েছে 'এটা করো, ওখানে কাজ করো, ওখানে কোরো না।' কাজ কেমন করে খুঁজতে হয় তাও আমি জানতাম না। এমন সময় একদিন মিসেস ফেলিসিয়া ডো নামের এক মহিলা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ডিনারের আমন্ত্রণ পেয়ে নেচে উঠলাম আনন্দে।

একজন খ্যাতনামা সাংবাদিকের নাম করে তিনি টেলিফোনে আমাকে বললেন, 'মি. লেভচেঙ্কো, আমি অমুকের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। তাঁর ধারণা আমি যে রকম লোক খুঁজছি সে লোক আপনি হতে পারেন। আপনাকে দেখতে এবং জানতে চাই। আশা করছি আমাদের উভয়ের জন্য লাভজনক হবে এরকম একটা বন্দোবস্ত আমরা স্থির করতে পারব। আজ সন্ধ্যায় ডিনারে যোগ দিতে

পারেন আমার সঙ্গে?' ওয়াশিংটনের একটা নামজাদা ক্লাবে যেতে বললেন তিনি। কৌতূহল আর আগ্রহ দুইই জাগল মনে। বলে দিলাম, যাব।

'বেশ,' বলে তিনি নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। সেই সন্ধ্যাটা ছিল মনোরম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাব। উৎকৃষ্ট খাবার। মিসেস ডো একজন চমৎকার হোস্টেস, পরিমার্জিত, রুচিশীল, শান্ত। কফি শেষ করে মদের গ্লাস হাতে নিয়ে শুরু হলো কাজের কথা।

তিনি বললেন, 'আমি···কোম্পানির প্রাচ্য গবেষণা গ্রুপের প্রেসিডেন্ট। আপনাকে এখানে ডাকার কারণ হচ্ছে আমি চাই যে আপনি আমার সংগঠনে রিসার্চ কনসালট্যান্ট হিসাবে কাজ করুন।'

'খুশি হলাম শুনে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি আমিই যে এ কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি এটা আপনি কেন ভাবছেন? আমার কাজ আসলে কি হবে?'

'মি. লেভচেঙ্কো, নিজের গরজে আপনার সম্পর্কে যতটা জানা সম্ভব তা আমি জেনে নিয়েছি। আপনার যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে তা আমাদের খুব কাজে লাগবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে, তার সিদ্ধান্তকারী সংস্থা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে, সোভিয়েতের অভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে নিজের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আপনি আমাদের তথ্যাদি জানাবেন। আপনাকে যা যা দেয়া হবে বা করতে বলা হবে সেসব বিষয়ে আপনি রিসার্চ ও বিশ্লেষণ করবেন।'

'কি উদ্দেশ্যে এসব তৈরি করা হবে?'

'আমার কোম্পানি একটা রিসার্চ ও স্টাডি গ্রুপ। বিভিন্ন কর্পোরেশন ও কোম্পানি আমাদের কাছে যা যা জানতে চায় সেসব জানাবার জন্য আমরা তাদের সঙ্গে চুক্তি করি। আমাদের নানা ধরনের মক্কেল রয়েছে—ব্যাংক, বেসরকারী ফাউণ্ডেশন, কোন কোন থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক ইত্যাদি। আপনি যা দিতে পারেন সেসব জিনিসের জরুরী প্রয়োজন তাদের। তারা নির্ভরযোগ্য তথ্য ও পরিসংখ্যান চায়, মি. লেভচেঙ্কো।'

'আমি আগ্রহ বোধ করছি,' বললাম তাঁকে। 'কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ চাকরির মজুরি কত তা জিজ্ঞেস করা উচিত। তাই না, মিসেস ডো? আমার আমেরিকান বন্ধুরা বলে যে, ওটাই হচ্ছে রীতি। কি বলেন, আপনি?'

একটুখানি হেসে তিনি বললেন, 'শুরুতে ২৫ হাজার ডলার পাবেন বছরে। কাজের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠার পর বাড়বে আরও।'

ডলারের অঙ্কটা বেশ বড়ই মনে হলো। তখনও আমি আমেরিকায় জীবনযাত্রার ব্যয়ের ব্যাপারটা হিসাব করতে শিখিনি। তা যাই হোক, তাঁর

কথাবার্তা বেশ সরল-সোজাই মনে হলো। আমি গ্রহণ করলাম চাকরিটা। মাস কয়েক পরে ওয়াশিংটনের সব ঝুট-ঝামেলা সামলে যৎসামান্য পোঁটলা-পুটলি গুটিয়ে আরেক শহরে চলে গেলাম। সেখানে মিসেস ডো'র কোম্পানির হেডকোয়ার্টার। এক বেডরুমের একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে স্বাধীনভাবে শুরু করলাম নতুন জীবনযাত্রা। প্রথম দু'তিন সপ্তাহ দারুণ কাটল। পুরোদমে কাজ শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝে গেলাম যে, আমার তৈরি রিসার্চ রিপোর্টগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে না, ওগুলো কোথায় কোন গভীর অতলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং কেন হচ্ছে তা বলা হচ্ছে না আমাকে। খুব খারাপ লাগল। ঘা লাগল আত্মসম্মানে।

খোঁজ-খবর নিলাম। কিছু কৌতূহলজনক তথ্য বের হলো। জানলাম যে, যে সব ক্ষেত্রে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে সেসব ক্ষেত্র সম্পর্কে মিসেস ডো'র কোন জ্ঞান বা আগ্রহ নেই। ফলে আমার কাজের মূল্যায়নে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, আমি আবিষ্কার করলাম যে, তাঁর সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলো, বাম, অতিবাম এবং অতি উদারনৈতিক গ্রুপ সম্পর্কে তদন্ত করা। ওটা জানার পরে প্রশ্ন করতে লাগলাম তাঁর কোম্পানিতে তাহলে আমার কাজটা কি? আমি তো ওসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। কখনও বিশেষজ্ঞ বলে দাবিও করিনি।

তবু ভাবলাম যে, থেকে গেলে হয়তো কিছু মূল্যবান অবদান রাখতে পারব কোম্পানির জন্য। মিসেস ডো যদি সেসব সংস্থার কাজ নেন যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব ব্লকের দেশগুলো সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি চায়, তা হলে প্রচুর লাভবান হতে পারবেন তিনি। ওয়াশিংটনে ইতোমধ্যে যেসব যোগাযোগ আমার হয়েছে তাতে এরকম কাজ যোগাড় করে দেয়া সম্ভব হবে আমার পক্ষে। কিন্তু মিসেস ডো আমার কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট আদেশ দিলেন।

'স্টান, আপনি সত্যি বিব্রতকর হয়ে দাঁড়াচ্ছেন আমার জন্য। আমাকে এসব বাজে পার্টিগুলোর নাম পাঠাবেন না। ওদের সংগঠনগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব ব্লকের দেশগুলোর তথ্য চাইলে আমার অনুমতি না নিয়ে ওদের সাথে কখনও যোগাযোগ করবেন না।'

'কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম পুঁজিবাদী দেশে একটা প্রাইভেট কোম্পানির উদ্দেশ্যই হলো মুনাফা করা। ওরা যা চায় তা আমরা দিতে পারি। আপনি আমাকে তা করতে দিচ্ছেন না কেন বুঝতে পারলাম না।'

'বেশ বলেছেন!' বললেন তিনি। 'আপনি এ কোম্পানির ব্যাপারে প্রথম কথাটিই

জানেন না।'

বুঝলাম আমার হাত-পা বাঁধা। আরও বুঝলাম, মিসেস ডো'র চাকরি করা আমার দ্বারা হবে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়েছি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য। এখানে মিসেস ডো'র ক্রীড়নক হবার জন্য নয়। এদিকে কোম্পানির আর্থিক অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। মাসের পর মাস বেতন নেই।

শেষ পর্যন্ত চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। কিছুদিন খুব উদ্বেগের মধ্যে কাটল। পাগলের মত কেবল চাকরিই নয়, আমেরিকান সমাজে একটা স্থানও খুঁজলাম নিজের জন্য। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল গা-ঢাকা দিয়ে থাকা নিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দেয়া মৃত্যুদণ্ডকে তুচ্ছ করা যায় না। তবু ঠিক করলাম যে, পুরোপুরি গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে আমি পারব না।

শেষ পর্যন্ত আমার স্থান খুঁজে পেলাম আমেরিকায়, কাজ পেলাম, চাকরি পেলাম নিজের পছন্দ মত। সাময়িক পত্রিকা পর্যন্ত বের করলাম 'কাউন্টারপয়েন্ট' নামে। অতীতকে অতীত, বর্তমানকে বর্তমান হিসাবে নিতে শিখলাম। নিজের কাছেই স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, নাতালিয়া আর আলেকজাণ্ডারকে বের করে আনতে পারব না সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। কেজিবি-র উপদ্রব থেকে নাতালিয়াকে রেহাই দিতে পারব আশা করে ডাইভোর্স করলাম ওকে।

এ বইটি লেখার কাজও শেষ করে ফেললাম। ধীরে ধীরে মিশে গেলাম আমেরিকান জনগণের মধ্যে।

যেসব লোক দেশান্তরী হয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নেয় তাদের হুঁশিয়ার থাকতে হয় যাতে বিবেকবর্জিত নিয়োগকারীরা শোষণ করতে না পারে। কিন্তু শোষণ কিভাবে এড়ানো সম্ভব তা ঠিক জানি না।

সে যাই হোক, পরিস্থিতি দেখে ক্রমেই হতাশ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলাম। আমি আমেরিকায় এসেছি গুরুতর রাজনৈতিক কারণে। লোকের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ আর মেলামেশার স্বাধীনতা আমার থাকতেই হবে। অনেক কিছুর সাথেই মিলিয়ে নিতে হবে নিজেকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সাধারণ নাগরিকদের কোন সিদ্ধান্তই নিতে হয় না। কারণ কে কোথায় কাজ করবে, কি করবে এবং কোথায় থাকবে সবই নিয়ন্ত্রিত। বেকারত্ব বলে কিছু নেই। সবারই চাকরি বা কাজ আছে। বেতন বা মজুরি যতই কম হোক। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক সমাজে রয়েছে এক স্বাভাবিক ও গতিময় প্রতিযোগিতা। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রত্যেককেই স্বাবলম্বী হতে হয়, নিজের ভবিষ্যৎ নিজেকেই স্থির

করতে হয়, নিজের চাকরি বা কাজ নিজেকেই জোগাড় করে নিতে হয়। এটাই হলো স্বাধীনতা। আমেরিকায় ব্যক্তির এসব বিষয় নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই।

এখানে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক তাও সোভিয়েত ইউনিয়নের চাইতে আলাদা। আমেরিকায় বেশিরভাগ লোককেই মনে হয় স্পষ্টভাষী এবং আত্মবিশ্বাসী। সেটা খেলার মাঠেই হোক, কি কর্মস্থলে। হীনমন্যতায় ভুগছে কিংবা মনের আবেগ চেপে রাখছে এমন আমেরিকানের দেখা পাওয়া ভার। টের পেলাম যে, আমার মধ্যে ঠিক ওই জিনিসগুলোই রয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়ে ওঠার ফল। বুঝলাম যে, এ সব ঝেড়ে ফেলতে হবে। কারও বলে দেয়ার জন্য অপেক্ষা না করে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেব। স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মবিশ্বাসী হব। স্বভাবতই, ব্যাপারটা সহজসাধ্য ছিল না আমার জন্য।

দেশান্তরী হওয়া সহজ নয়। আমার তো শব্দটি উচ্চারণ করতেই কষ্ট হয়। দেশান্তরীরা আমেরিকায় যে সব সমস্যার মুখোমুখি হয় তার অন্যতম হচ্ছে নবাগতরা, বিশেষভাবে সোভিয়েত দেশান্তরীরা যে আমেরিকান সমাজের সাথে সফলভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে এ কথাটা কোন কোন আমেরিকান বিশ্বাসই করে না। এদের কেউ কেউ এটাও বিশ্বাস করে যে, এ সব নবাগতের ভরণপোষণ চালাতে হবে তাদের বাকি জীবন, কিংবা অন্তত সাহায্য দিয়ে যেতে হবে। একটা ঘটনা আমার জানা আছে যেখানে এক সোভিয়েত দেশান্তরীর পিছনে ফেলে আসা স্ত্রী মার্কিন সরকারের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে। তার যুক্তি ছিল এ রকম ঃ

আমাকে খোরপোষ বাবদ অর্থ প্রদান করা ন্যায়সঙ্গত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের জন্য, কারণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমার স্বামীর কাছে অনেক ঋণী। তাছাড়া, বাকি জীবনের জন্য তারাই তো ওকে পুষবে।

দেশান্তরীদের সাথে কেমন আচরণ করবে তা স্থির করতে অসুবিধা হয় আমেরিকানদের। এ জন্য খুব স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও অনেক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে ওঠে এ জন্য যে, এ দেশে আসার পরে প্রথম কয়েকটি বছর আমরা নিজেরাই জানি না নিজেদের প্রতি আমাদের আচরণ কি হওয়া উচিত। প্রত্যেক দেশান্তরীর কোন না কোন সময় নিজেকে মনে হয় চিড়িয়াখানার জীব। মনে হয় আমরা যেন আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবাস থেকে তুলে আনা বিরল প্রজাতির জন্তু-জানোয়ার। কৌতূহল ভরে আমাদের দেখতে দেখতে আমেরিকানরা ভাবে, 'ওরা কেবলি বিদেশী? ওরা কি আমেরিকান? এ নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবে তো ওরা? নাকি বুনোই

থেকে যাবে? ওরা কি সত্যি আমাদের পৃথিবীর কেউ? নাকি মহাশূন্য থেকে আসা কোন রহস্যময় প্রাণী?' আমার নিজের বেলায় এমন হয়েছে যে, আমার অতীত জানার পর পরিচিতরা সঙ্গে সঙ্গে আলাপ বন্ধ করে দিয়েছে। আবার এমনও হয়েছে যে, আমার অতীতের জন্য বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে লোকের সঙ্গে।

আমার কাজকর্ম ওয়াশিংটনভিত্তিক। কিন্তু কর্মসূত্রে আমাকে অন্যান্য শহরেও যেতে হয় এবং কিছু কিছু উত্তেজনাকর ও উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। ১৯৮৫ সালের শুরুর দিকে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের জন মার্টিনের একটা টেলিফোন কল পাই। 'আমাদের এখানে সামান্য কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয়, এগুলোর ব্যাপারে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন,' বললেন তিনি প্রাথমিক সম্ভাষণ বিনিময়ের পরে। 'আমি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান। জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে যেসব গুপ্তচরবৃত্তির মামলা আসে সেগুলো আমিই তত্ত্বাবধান করি।' এখন আমি জানি যে, এই মৃদুভাষী মানুষটি জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের একজন জাঁদরেল অফিসার।

বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার পর বলি, 'কি করতে পারি আপনার জন্য?' সতর্কভাবে তিনি বললেন, 'দেখুন, আমাদের হাতে কয়েকটি মামলা আছে সেগুলোর ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। আমরা যেসব অনুবাদ ও ভাষান্তর করেছি সেসব ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করে দেখার ব্যাপারে সামান্য সাহায্য চাই। আপনি কি পারবেন?'

যে মামলাই হোক, সাহায্যের আহবান পেয়ে খুশি হলাম, গর্ববোধ করলাম। সেদিনই দেখা করব বলে একটা সময় ঠিক করে নিলাম।

জন মার্টিন এক অতি সজ্জন। আইনজীবী তো বটেই; তদুপরি অকপট ও ভদ্র। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সে সময় তিনি কঠোরচিত্ত এবং অবিচল। মঙ্গলবার, ৫ মার্চ, তাঁর অফিসে যাই। আলাপ শুরু হতেই বুঝলাম, যে সামান্য সমস্যার কথা তিনি বলছিলেন তা রীতিমত জটিল ও চমকপ্রদ।

'এক আকর্ষণীয় দম্পতির সাথে আপনার দেখা করাতে চাই,' বললেন তিনি। 'সশরীরে নয়, অবশ্য ছবিতে।' আমাকে বসিয়ে কফি দিলেন। একটি ছবি ভেসে উঠল পর্দায়। এক মহিলা। সুন্দরী না হলেও আকর্ষণীয়া।

'সোয়েতলানা ওগোরোদনিকভ,' বললেন জন।

আরেকটি ছবি ভেসে উঠল পর্দায়। পুরুষের ছবি। বেঁটে, কোমর থেকে ওপরের দিকটা নগ্ন। বেঢপ, স্থূল। বুকে উল্কি, প্রকাণ্ড এক ঈগলের মূর্তি ঢেকে আছে লোকটার সারা বুক।

'মি. ওগোরোদনিকভ, মহিলার স্বামী। শুনেছেন কখনও ওদের নাম?'

'না। শোনা কি উচিত ছিল?' জবাব দিলাম।

'শুনলে ভালই হত,' বললেন তিনি মুচকি হেসে। 'আপনার সম্পর্কে ওরা প্রবল কৌতূহলই দেখিয়েছে। ছোট গল্প বলছি একটা, শুনুন।'

মোহিত হলাম গল্পটা শুনে। ওগোরোদনিকভরা আমেরিকায় আছেন প্রায় বছর দশেক ধরে। থাকেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। মিসেস ওগোরোদনিকভ সেখানে রুশ ভাষার ফিল্মের ডিস্ট্রিবিউটর। সন্দেহজনক আচরণের জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁদের ওপর আমেরিকান প্রতিগোয়েন্দা অফিসারদের নজর পড়ে।

মিসেস ওগোরোদনিকভ প্রায়ই যান সোভিয়েত ইউনিয়নে। স্পষ্টতই তিনি লস এঞ্জেলেস-এর রুশ দেশান্তরী সম্প্রদায় সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করেন। শেষ পর্যন্ত এফবিআই সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে যে, তার লস এঞ্জেলেস ফিল্ড অফিসের নিজস্ব একজন লোক, রিচার্ড মিলার, মিসেস ওগোরোদনিকভ-এর বশীভূত হয়ে পড়েছে। মিসেস ওগোরোদনকিভ তাকে কেজিবি'র হয়ে কাজ করার জন্য রিক্রুট করে। কয়েক মাস ধরে নজর রাখার পরে এফবিআই দু'জনকে গ্রেফতার করে, কারণ মিসেস ওগোরোদনিকভ মিলারকে বিমানের টিকিট দিয়ে ভিয়েনা পাঠাচ্ছিল কেজিবি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাতের জন্য।

ওগোরোদনিকভদের ও মিলারের কেস তদন্তকালে বহু অজানা তথ্য প্রকাশ পায়। ওসব তথ্যের মধ্যে আমার নামও ছিল। ১৯৮৫ সালে ওগোরোনদিকভরা একজন আমেরিকান অ্যাটর্নির শরণাপন্ন হয় এক অদ্ভুত অনুরোধ নিয়ে। 'একটা মানুষ লুকিয়ে আছে এদেশে। ওকে খুঁজে দেয়ার জন্য আমরা আপনাকে ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত দিতে পারি,' অ্যাটর্নিকে বলে মিসেস ওগোরোদনিকভ। 'সব কিছু নির্ভর করছে আপনার অনুসন্ধানের ওপর।' অনুরোধের ভাষা শুনে বোধগম্য কারণে বিভ্রান্ত হন অ্যাটর্নি।

'আপনি কি চাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারছি বলে মনে হয় না,' জবাব দেন অ্যাটর্নি।

'আমার এক বান্ধবী স্তানিস্লাভ লেভচেঙ্কো নামের একটি লোককে পাগলের মত খুঁজছেন,' বলেন মিসেস ওগোরোদনিকভ। 'ওকে খুঁজে বের করার জন্য ১০ হাজার ডলার তিনিই দেবেন। তবে সন্ধান না পেলেও উপযুক্ত ফি তিনি আপনাকে দেবেন বৈকি। ভদ্রমহিলার দরকার লোকটার সন্ধান পাওয়া। কারণ ওর বিরুদ্ধে তিনি একটা পিতৃত্বের মামলা করতে চান।' বুঝলাম কেজিবি'র বানানো গল্প।

ওই একজন অ্যাটর্নির কাছে গিয়েই ওগোরোদনিকভরা ক্ষান্ত হননি। মিসেস্ ওগোরোদনিকভ রিচার্ড মিলারকে রিক্রুট করার পরে তাকে বলেন লস এঞ্জেলেস-এর এফবিআই নেটওয়ার্কের সাহায্যে আমাকে খুঁজে বের করতে। আমার ভাগ্য ভাল যে, মিলার সে কাজটি করার আগেই সে এবং ওগোরোদনিকভরা গ্রেফতার হয়ে যায়। আমি আর জন মার্টিন যে সময় টেপটা বাজিয়ে শুনছিলাম তার আগে থেকেই কেসটা নিয়ে তদন্ত চলছিল। সরকার প্রমাণাদি তৈরি করছিল আদালতের জন্য।

জন মার্টিন আমাকে সোয়েতলানা ওগোরোদনিকভ আর তাঁর সোভিয়েত পরিচালক গ্রিশিন নামের এক কেজিবি অফিসারের টেপও বাজিয়ে শোনান। গ্রিশিন ছিল সানফ্রান্সিসকোর সোভিয়েত কনস্যুলেটের সাথে যুক্ত। এফবিআই তাদের কথাবার্তা রেকর্ড করে। কথাগুলো স্পষ্ট, সহজে শোনা যায়। কিন্তু কথাবার্তাটি হয় এক ধরনের রুশ চলিত ভাষায় যার অনুবাদ করা একটুখানি কঠিন।

ওগোরোদনিকভদের এবং মিলারের বিচার হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃত বহুসংখ্যক অপরাধের জন্য। ওদের বিরুদ্ধে সরকারের মামলাটি সাজা হয়ে যাবার মত শক্ত। এতে আমার ভূমিকা ছিল সামান্য। তবু এ মামলা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কেজিবি আমার পিছু ছাড়েনি। এবার ওরা ব্যর্থ হয়েছে বটে। কিন্তু নিঃসন্দেহে আবার চেষ্টা করবেই।

জন মার্টিন ধৈর্য সহকারে আমাকে ওগোরোদনিকভ দম্পতি এবং সোয়েতলানা আর মিলারের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে অবহিত করে। যে টেপটি আমাকে শুনিয়েছেন সেটা সম্পর্কে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সিদ্ধান্ত কি তা-ও বলেন। টেপ-এর যে অংশটির অর্থোদ্ধার করা যাচ্ছিল না সে সম্পর্কে ডিপার্টমেন্ট কি ভাবে সেটাও বলেন আমাকে। আমি তাদের অনুবাদের এবং ব্যাখ্যার ভুলগুলো সহজেই শুধরে দেই। পরে এ ধরনের কাজের জন্য আমাকে আরও বহুবার ডাকা হয়। ১৯৮৬ সালে ছিল গুপ্তচরবৃত্তির কাহিনীর ছড়াছড়ি। একের পর এক চাঞ্চল্যকর কাহিনী প্রকাশিত হয় ঐ বছর। জেরী হুইটওয়ার্থের কাহিনীর, রিচার্ড মিলারের সাজা, নিক ড্যানিলফ কেস, ইত্যাদি ইত্যাদি। জেরী হুইটওয়ার্থ গ্রেফতার হবার কিছুদিন পরেই জন মার্টিন আবার আমাকে কল করেন।

'স্তান, আমার হাতে আরেকটি গুরুতর কেস এসেছে। তোমাকে আমি এ সম্পর্কে জানাতে চাই। ওয়াকারের মামলা থেকেও চাঞ্চল্যকর। আরও শুনতে চাও?'

'অবশ্যই,' জবাব দিলাম সঙ্গে সঙ্গে।

'ঠিক আছে। কখন আসতে পারো এখানে?' এখানে মানে ডিপার্টমেন্টে। কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম।

জেরী হুইটওয়ার্থের বিরুদ্ধে অভিযোগনামাটি জন মার্টিন আবারও সযত্নে ব্যাখ্যা করল আমার কাছে। ব্যাখ্যা শেষ করে মিনিট কয়েক অপেক্ষা করে রইল আমি কিছু প্রশ্ন করি কিনা দেখার জন্য। তারপর বলল আমাকে ডাকার কারণটা কি।

'জেরী হুইটওয়ার্থ নৌবাহিনীর লোক। মার্কিন নৌবাহিনীর গোপনতম তথ্যাদির কোড জানার সুযোগ তার রয়েছে। জন ওয়াকার তাকে রিক্রুট করেছিল সেসব কোড এবং অন্যান্য তথ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে বিক্রি করার জন্য। সে ছিল জন ওয়াকারের সেরা বন্ধু। এখনও বোধহয় তাই আছে। এটা সত্যি এক গুরুত্বপূর্ণ কেস এবং সেভাবেই এর নিষ্পত্তি করতে হবে। আচ্ছা, তুমি উইলিয়াম ফারমারকে জানো?'

বললাম যে জানি না।

'ইউলিয়াম ফারমার ওরফে বাক হচ্ছে সানফ্রান্সিসকোর জনৈক মার্কিন সহকারী অ্যাটর্নি। জেরী হুইটওয়ার্থের মামলায় সেই হলো সরকারী উকিল। তাকে একটু সাহায্য করবে? কাজ করবে কনসালট্যান্ট হিসাবে?' এভাবে বললেও বুঝলাম যে জন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই কথাটা বলেছে।

'অবশ্যই, জন। তুমি জানো যে, তোমাকে সাধ্যমত সহায়তা দিতে আমি সব সময় তৈরি।'

হুইটওয়ার্থ মামলাটা ছিল সত্যিই মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত। জন ওয়াকার মামলারই অংশ। আর জন ওয়াকার মামলার কথা কে না জানে? গুপ্তচর মামলার ইতিহাসে ওটা ছিল অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর। জন অ্যান্টনি ওয়াকার জুনিয়র ছিল নৌবাহিনীর লোক। বাইশ বছর চাকরির পর ১৯৭৬ সালে অবসর নেয়। বহু বছর ধরে সে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের গুপ্তচর।

অবসর গ্রহণের পরেও গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে একটা গোয়েন্দাচক্র গড়ে তুলেছিল। গ্রেফতার হবার পরেও নিজের কার্যকলাপের জন্য কোন অনুশোচনা দেখা যায়নি তার মধ্যে। একটা মুক্ত দেশের বাসিন্দা হয়েও পয়সা ও উত্তেজনার জন্য সে নিজের দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

তার নীতিবিগর্হিত কার্যকলাপের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য কাজ হচ্ছে এই যে, নিজের ছেলে মাইকেল ল্যান্স ওয়াকার, ভাই আর্থার জেমস ওয়াকার এবং সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু জেরী হুইটওয়ার্থকে সে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য

গোয়েন্দাবৃত্তির কাজে টেনে নেয়। জন ওয়াকারের মেয়ে বলেছে যে, তাকেও গোয়েন্দা বানাতে চেষ্টা করেছিল সে। মাইকেল ওয়াকার নিয়োজিত ছিল বিমানবাহী জাহাজ নিমিৎস্-এ। বাপের নির্দেশে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করত। পরে জানা যায়, তার সাহস এত বেড়ে গিয়েছিল যে, সংগৃহীত দলিলপত্র সে নিজের বাঙ্কের নিচে একটা বাক্সে রেখে দিত। জন ওয়াকারকে চালাত আলেক্সি গাব্রিলোভিচ তকাচেঙ্কো। লোকটি ছিল ওয়াশিংটনস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের একজন ভাইস-কনসাল। ওয়াকারের গ্রেফতারের পরেই তাকে মস্কোতে ফিরিয়ে নেয়া হয়।

জন ওয়াকারের গ্রেফতারের আগের দিন এফবিআই তাকে অনুসরণ করতে করতে মেরিল্যাণ্ডের পুলস্‌ভিলে যায়। ওয়াকার সেখানে নৌবাহিনীর ১২৯টি গোপন দলিল ফেলে দেয় এক জায়গায়। ভোরের আগে এক নাটকীয় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয় মেরিল্যাণ্ডের রকভিলের এক মোটেল থেকে। আনীত অভিযোগের জবাবে পিতা-পুত্র নিজেদের নির্দোষ দাবি করে। বিচারের দিন ধার্য হয় ১৯৮৫সালের ২৮ অক্টোবর। জনের বিচার স্থগিত হয় সম্ভবত এ কারণে যে, একটা চুক্তিটুক্তি হচ্ছিল দু'পক্ষের মধ্যে। ১৯৮৬ সালের আগস্ট নাগাদ চুক্তির শর্ত মোটামুটি জানা হয়ে যায়। জন আর মাইকেল রাজি হয় যে, তারা তাদের বহু বছরের কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ দেবে এবং জন সাক্ষী দেবে জেরি হুইটওয়ার্থের বিরুদ্ধে। প্রতিদানে মাইকেলের সাজা হবে মাত্র পঁচিশ বছরের।

আমাকে বলা হয়, হুইটওয়ার্থের মামলায় সরকারি উকিলের সাথে কাজ করতে। জেরি হুইটওয়ার্থ ছিল একজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র চীফ রেডিওম্যান, পেটি অফিসার। ওয়াকার পরিবারের বাইরে অভিযুক্তদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি। তার বিষয়ে তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে, জেরি আলফ্রেড হুইটওয়ার্থের কোড নাম ছিল 'ডি' ; সে জামিন পায়নি। বারোটি অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। মামলাটা সত্যি মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত।

জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে জন মার্টিনের সাথে আলাপের কয়েকদিন পরে আমাকে বলা হলো উইলিয়াম ফারমারের সঙ্গে দেখা করার জন্য। 'আমার মনে হয় ওকে তোমার ভাল লাগবে,' বলল জন। 'লোকটা জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা সত্যিকারের রত্ন। একদিন উল্কার মত জ্বলে উঠবে।'

চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের লোক বাক ফারমার। উদ্যমী মানুষ। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, মুখে সহজ হাসি। বয়স কম হলেও মাথায় প্রকাণ্ড টাক। জন মার্টিনের কাছে লোকটা সম্পর্কে যেসব গল্প শুনেছি তাতে জেনেছি ওর সাহস আর

দৃঢ়চিত্ততার কথা। কলাম্বীয় মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলায় সে সরকারী উকিল ছিল। এসব মামলা চলাকালে তার বাচ্চাদের ওপর হুমকি আসে। বেনামী চিঠি আসে তার কাছে। তাকে বলা হয়, যদি সে নিরস্ত না হয়, মামলা তুলে না নেয়, তাহলে তার বাচ্চাদের অপহরণ ও হত্যা করা হবে। সর্বক্ষণ বিপদের খড়্গ মাথার ওপর ঝুলছিল। এ মানসিক চাপে তার সংসার ভেঙে যায়। স্ত্রী ছেড়ে যায় তাকে। কিন্তু বাক পিছু হটেনি। ছেড়ে দেয়নি ওই লোকগুলোকে। বিরাট মূল্য দিতে হয় তাকে এ দৃঢ়চিত্ততার জন্য। প্রচণ্ড মানসিক চাপের দরুন কয়েক সপ্তাহর মধ্যে তার মাথার চুলগুলো সব ঝরে পড়ে যায়।

হুইটওয়ার্থ মামলা চলার সময় এ সাহসী লোকটাকে কার্যক্ষেত্রে দেখা সুযোগ পেয়েছি আমি।

গোটা মামলাটায় আমি বাক-এর সাথে কনসালট্যান্ট হিসাবে কাজ করেছি। সানফ্রান্সিসকোতে গিয়েছি। হাজার হাজার পৃষ্ঠা নকল পড়েছি। তার সহযোগী অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, প্রখর বুদ্ধিমতী লিডা শোগেন-এর সাথেও আমার পরিচয় হয়। বিচারের প্রস্তুতিকালে এবং বিচার চলার সময় তাদের দু'জনের সাথেই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি। আমি সানফ্রান্সিসকোর বাইরে থাকলে টেলিফোনে আলোচনা হয়েছে।

আদালতে জন ওয়াকার হুইটওয়ার্থের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়। বাক ফারমার আমাকে ওয়াকারের ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে, 'লোকটা একজন ভাঁড়। ভাঁড়ের মতই কথা বলে। গুরুগম্ভীর বিষয়ে কথা বলতে গেলেও এমন ভাবে জবাব দেয় যে-না হেসে পারা যায় না। জানে মামলাটা তার পক্ষে কত খারাপ, তবু মজা না করে সে পারে না।'

ওয়াকারকে প্রশ্ন করা হয়, সে হুইটওয়ার্থকে রিক্রুট করেছিল কেন। জবাব থেকে জানা যায়, লোকচরিত্র সম্পর্কে তার কতটা জ্ঞান ছিল। সে বলে, 'আমি জানতাম ওকে। আমরা দু'জন বন্ধু ছিলাম। আলাপ হত আমাদের মধ্যে। ওর হৃদয়ের মধ্যে যে চোরের প্রবৃত্তি লুকিয়েছিল তা টের পেতে দেরি হয়নি আমার।'

আশ্চর্য ব্যাপার বটে। ওয়াকার তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলেছিল যে, উপযুক্ত মূল্য পেলে হুইটওয়ার্থ যে কোন অসৎ কর্ম করতে গর রাজি হবে না।

জন ওয়াকারের বিরুদ্ধে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ তথ্য প্রমাণের মধ্যে একটি তথ্য ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সতেরো বছর বয়সে সে চারবার চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। সুতরাং তার নিজের হৃদয়ের মধ্যেও চোরের অধিষ্ঠান ছিল। নৌবাহিনী এ তথ্য জানত। তবুও তাকে গোপন তথ্য জানতে দেয়।

হুইটওয়ার্থকে নিজ দেশের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাবৃত্তির দায়ে ৩৬৫ বছরের

কারাদণ্ড দেয়া হয়। জরিমানা করা হয় ৪ লক্ষ ১০ হাজার ডলার। তবে সোভিয়েতদের কাছে সে এতই মূল্যবান ছিল যে, তারা ওকে মাসে ১ থেকে ৪ হাজার ডলার দিত। বিনিময়ে হুইটওয়ার্থের কাছ থেকে তারা পেত অনেক বেশি। অনেক অনেক মূল্যবান তথ্য যা মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য ডেকে আনছিল মারাত্মক বিপদ।

১৯৮৬ সালের আরেকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছিল ফ্যানিলা কেস। এফবিআই-এর কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টায় নিউ ইয়র্ক সিটিতে আরেকজন সোভিয়েত গোয়েন্দা ধরা পড়ে। এজেন্টটির নাম গেন্নাদি শাখারফ। দু'বছর ধরে এফবিআই পিছু নিয়েছিল তার। 'ক্লাসিফাইড' দলিল কুড়িয়ে নেয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে লোকটি। শাখারফের গ্রেফতারের বদলা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রখ্যাত মার্কিন সাময়িকী ইউএস নিউজ অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট-এর মস্কোস্থ প্রতিনিধি নিক ড্যানিলফকে এক সাজানো গোয়েন্দা কেস-এ ফাঁসিয়ে দেয়। ড্যানিলফ কার্যকালের মেয়াদ শেষে ফিরে আসছিল যুক্তরাষ্ট্রে। বিদায় নিচ্ছিল বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনদের কাছ থেকে। সেসময় তার এক রুশ বন্ধু তাকে একটা মুখ বন্ধ করা খাম দেয়। বলে যে, ওতে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত কিছু আকর্ষণীয় খবরের ক্লিপিং আছে।

খামটা হাতে দেয়া মাত্রই ড্যানিলফকে ঘিরে ফেলে কেজিবি'র লোকরা। 'গোপন দলিলপত্র সহ হাতেনাতে' গ্রেফতার করে। দুনিয়ার মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, ব্যাপারটা আসলে কি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একজন সোভিয়েত গুপ্তচর ধরেছে। বদলা হিসাবে সোভিয়েতরা ড্যানিলফকে জিম্মি করেছে। ড্যানিলফকে সোভিয়েতরা কয়েক সপ্তাহ বন্দী করে রাখে লেফোর্তোভো কারাগারে। ওই সময় কয়েকটি টেলিভিশন প্রোগ্রামে অংশ নিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওয়াশিংটন ডিসি'র চ্যানেল ৫-এর দৈনিক নিউজ ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম, চার্লস বিয়ারবাওয়ারের সঙ্গে ক্যাবল নিউজ নেটওয়ার্কের নিউজ মেকারে, রবিবারের প্রোগ্রামে, টেপ কোপ্পেল-এর সঙ্গে দু'বার এবিসি'র নাইটলাইন প্রোগ্রামে, এনবিসি'র জন ম্যাকলিনের সঙ্গে চ্যানেল ৫-এর ওয়ান-অন-ওয়ান প্রোগ্রামে এবং ল্যারি কিং শোতে আমি অংশগ্রহণ করি।

যেসব প্রশ্ন আমাকে করা হয় তাতে বোঝা যায় যে, অনেক আমেরিকান মুক্ত বিশ্বের প্রতি কেজিবি'র হুমকির বিশালত্ব ও গভীরতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নয়। এটা আমি সব সময় অনুমান করতে পারতাম। এ জন্যই এ বইটা লেখার জন্য আমি এতটা প্রয়োজন বোধ করেছি।

* * *

স্তানিস্লাভ লেভচেঙ্কোর আত্মজীবনী

আমি ছিলাম কেজিবির লোক

রূপান্তর ঃ এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র মত
অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েতের কেজিবি-ও ছিল এক দুর্ধর্ষ
গোয়েন্দা সংস্থা। তার রোমহর্ষক গুপ্ত তৎপরতার
ব্যাপ্তি ছিল দুনিয়াময়। লেভচেঙ্কোর বর্ণনায় জানা যায়
কি বিশাল আর শক্তিধর ছিল কেজিবি,
কিভাবে তা পরিচালিত হত এবং
কি ছিল তার কাজের পদ্ধতি।

লেভচেঙ্কো ছিলেন এ সংস্থাটির এক গুরুত্বপূর্ণ অফিসার।
দুঃসাহসিক গোয়েন্দা কার্যে লিপ্ত থাকা অবস্থায়
হঠাৎ একদিন পক্ষত্যাগ করে চলে যান আমেরিকায়।
হুলস্থুল সৃষ্টি হয় মস্কো-টোকিও-ওয়াশিংটনে।
প্রথম শ্রেণীর থ্রিলারের মতই উপভোগ্য এ কাহিনী।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০